প্রথম প্রকাশ : ১৫ জুন, ১৯৫৮

নক্‌শা ও অলংকরণ : সমর সিংহ

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : বর্ধমান জেলার কালনা সহরের
প্রতাপেশ্বর মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা

মুদ্রক : মৃদুলকান্তি সেন, সহ-অধীক্ষক
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত
পাব্লিকেশন্‌স অফিসার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

জীবন যন্ত্রণার ধুসর দিনগুলিতে
যার আবির্ভাব ও তিরোধান,
দিয়ে গেল বেঁচে থাকার মানসিক শক্তি,
আত্মমগ্ন করল আমাকে 'রামায়ণ' রহস্যে,
সেই তাঁকে যার নাম ছিল
টুম্পা।

ভূমিকা

কত শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ কত নতুন নতুন ভাবে রামায়ণের রসাস্বাদন করে চলেছেন। রামায়ণের কথা বলতে গেলে আমাদের সময়কার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য এস. ওয়াজেদ আলির সেই লেখাটা মনে পড়ে যায়। বৃদ্ধ গ্রাম্যমুদি সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোতে তার ভাংগা চশমা লাগিয়ে রামায়ণ পড়ে যায় ; তার ছোট নাতি মুগ্ধ হয়ে শোনে। কতদিন কেটে গেল তারপর। লেখক সেই গ্রামে ঘটনাচক্রে এসে সন্ধ্যায় সেই একই দৃশ্য দেখলেন ; তবে এখন নায়ক পরিবর্তিত হয়েছে। বৃদ্ধের পুত্র আজ পাঠক. আর তার নাতি শ্রোতা।

সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে, কোথাও তার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি।

যে মহাকাব্য ট্র্যাডিশানের অংশীভূত তার সম্বন্ধে নতুন আলোকে বিচার করায় কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। যে কোনও রচনা বা সৃষ্টি কোনও এক কালে, কোনও এক সমাজে সৃষ্ট হয়েছিল—সে যে ইতিহাসের বাইরে নয়, কালাতীত নয় এ সহজ সত্যটা গতানুগতিকায় আবদ্ধ মন সহজে মেনে নিতে পারে না। না পারলেও কিন্তু ঘটনাটা সত্য। মানুষের ইতিহাসের বাইরে, সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজের গণ্ডীমুক্ত অবস্থায় মানুষের কোনও সৃষ্টিই হতে পারে না। তাই রামায়ণ বা মহাভারত আমাদের ঐতিহ্যের একান্ত এবং আত্মস্থ হলেও, তাদের কালিক এবং সামাজিক পটভূমিকা আছে। এ সব মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে, তাদের রূপকগুলোর অন্তরালে তৎকালীন সমাজের সমাজবদ্ধ মানুষের সম্বন্ধে যে সব তথ্য লুকিয়ে আছে তাদের ধরতে পারা যায় বিশ্লেষণী মননশীল দৃষ্টি দিয়ে। তাতে মিথ্যা সংস্কারে আঘাত লাগলেও সত্যের হানি হয় না। তবে ট্র্যাডিশান যে গ্রন্থকে এক বিশেষ কালাতীত আসনে বসিয়ে পুস্তকের অন্তস্থ চরিত্রগুলিকে কালের বাইরে নিয়ে গেছে—তাতে কালিক সত্য নির্ধারণ করতে গেলে দরকার সাহসের, দরকার সুস্থ মুক্ত মনের।

জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের 'রামায়ণের উৎস কৃষি' বইটি পড়ে তাঁর সাহসিকতা এবং সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে ধরার বা

বোঝার প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়েছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে দেখে অনাবিল আনন্দ পাচ্ছি। আমার আশা পুস্তকটি সুধীজনের মাঝে সমাদৃত হবে। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হবে, রসপিপাসু, সত্যসন্ধানী পাঠক সমাজে কিছু আলোড়ন জাগবে।

রূপক আশ্রিত রামায়ণের মধ্যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক যে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান এবং পরিবেশন করেছেন তা আমাদের ঐতিহাসিক ভাবনা চিন্তাকে নতুন ধারায় বাহিত করবে। পুস্তকটি অনূদিত হয়ে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি সেই সুদিনের দিকে তাকিয়ে থাকব। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী তর্জমাটিও প্রকাশ করে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে অনাগ্রহী হবে না। আমি পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য

প্রস্তাবনা

মহাভারত একাধারে কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। সামগ্রিক-ভাবে এ কাব্য ইতিহাসও। মহাভারতের ঋষি স্বয়ং বলেছেন ঃ

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং অর্থশাস্ত্রমিদং মহৎ।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥

মহাভারত সম্বন্ধে এ কথা বলা হলেও রামায়ণকে কিন্তু একক কাব্য বলেই গণনা করা হয়। বহু শতাব্দী ধরে মহাভারত তিলে তিলে তা'র উপাখ্যান এবং কাহিনী সংগ্রহ করলেও আদি এবং সপ্তমকাণ্ড বাদ দিয়ে মূল রামায়ণ একই শিল্পীর রচনা। সে শিল্পী কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকী। যাঁর মধ্যে সত্যদর্শন এবং পরিদৃষ্ট সত্যের চিত্রকল্প নির্ম্মাণ,—এই দু'টি শক্তিরই সমন্বয় ঘটেছিল। সত্যদর্শনের সামর্থ্য থাকলেই মানুষ কবি আখ্যা লাভ করে না। যখন ঐ সত্যের বাক্‌প্রতিমানির্ম্মাণের দক্ষতা তিনি প্রদর্শন করেন, তখন তাঁকে কবির মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মিকীকে উত্তরকাল আদিকবির মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করেছে এই জন্যে যে, বাল্মিকীর মধ্যেই প্রথম তত্ত্বদর্শন ও বাক্‌প্রতিমানির্ম্মাণের সামর্থ্যের সমন্বয় নিজেকে প্রকাশ করেছিল।

রামায়ণ একক কবিসৃষ্টি বলে পরিগণিত হলেও মাঝে মাঝেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এর কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। জার্ম্মান পণ্ডিত ওয়েবার বলেছেন,—রামায়ণের প্রধান উপজীব্য রাম-সীতার কাহিনী, কৃষি-সভ্যতার বিকাশেরই কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—নবদূর্বাদলশ্যাম রামকে মেঘের প্রতীক বলে গ্রহণ করলে এবং সীতার জন্ম-বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে তাকে হলকর্ষণজনিত রেখারূপে ব্যাখ্যা করলে রামায়ণের কাহিনীকে কৃষি-সভ্যতা বিকাশের রূপক কাহিনী বলে মানতেই হয়। পণ্ডিতেরা আরও বলেছেন, মহাভারতের সভ্যতা প্রধানতঃ আরণ্য-সভ্যতা যেখানে পশুপালন, বনজসম্পদ্ আহরণ এবং মৃগয়া সভ্যতার একটা অঙ্গ ছিল। এই কারণে মহাভারতের উদ্ভবস্থানকে দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারত বলে উল্লেখ করলে ভুল হয় না। রামায়ণের উদ্ভবস্থান হয়ত পূর্ব বা দক্ষিণ ভারত। সেখানকার অধিবাসীদের কাছে বর্ষা আশীর্বাদ এবং

মেঘের সঞ্চার ধরিত্রীর শস্যশ্যামলরূপের ইঙ্গিত বহন করে আনে। আর্যেরা যখন বিভিন্ন সভ্যতার উপকরণ সংগ্রহ করে বেদ এবং মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখনই হয়ত আর্যেতর জাতিরা লৌকিক মেঘবন্দনার সূত্র ধরে এবং বর্ষার আবাহনকে অবলম্বন করে এক বিরাট মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম-ভারতের রুক্ষতা তাই মহাভারতে স্বাভাবিকভাবেই সংক্রামিত হয়েছে, আর রামায়ণে সংক্রামিত হয়েছে পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের কোমল হৃদয়বত্তা ও মাধুর্য্যমণ্ডিত মানসিকতা। মহা-ভারতের মত রামায়ণও তাই একাধারে ধর্ম্মশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি শান্তরস প্রধান কাব্য। রামায়ণকে একক মহাকাব্য বললে তার মর্য্যাদাহানি ঘটানো হয়। পণ্ডিতেরা যখন বলেন কুমারসম্ভব, রঘুবংশ যে অর্থে মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত সে অর্থে মহাকাব্য নয় এবং রামায়ণ-মহাভারতকে একই মর্য্যাদার আসনে সমাসীন করেন, তখন এটাই বোঝাতে চান যে কাব্যের উপকরণ ছাড়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজদর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং নৃতত্ত্ববিদ্যার উপকরণের সমাবেশে এ দু'টি মহাকাব্যের কলেবর পুষ্ট।

পণ্ডিতেরা রামায়ণ কাহিনীকে কৃষিসভ্যতা বিকাশের রূপক কাহিনী বলে উল্লেখ করলেও তাদের আলোচনা বিচ্ছিন্ন এবং অসংলগ্ন। রামায়ণের কাহিনীকে বিশ্লেষণ করে কৃষিসভ্যতার নিগূঢ় অর্থটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা এতদিন পর্য্যন্ত করা হয় নি। ভারতীয় সাহিত্য বিশ্লেষণের এই অপরিপূর্ণতার বৃত্তাংশকে পূর্ণরূপ দেবার দুরূহ কাজে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। রামায়ণের প্রসিদ্ধ শ্লোকগুলিকে বিশ্লেষণ করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে এই কাব্যের শব্দগুলি দ্ব্যর্থ্যক শব্দের ভূমিকা গ্রহণ করে কখনও মেঘবন্দনায় পর্য্যবসিত হয়েছে,—কখনও বা পর্য্যবসিত হয়েছে অভ্রশ্যাম দিবসের সৌন্দর্য্যবর্ণনায়,—কখনও বা আত্মপ্রকাশ করেছে বর্ষার আগমনে দ্যাবাপৃথিবীর আনন্দোচ্ছ্বাসের চিত্রাঙ্কণরূপে,—কখনও বা বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থানের ইঙ্গিতে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রে প্রবিষ্ট গ্রন্থকার প্রকৃতি-প্রত্যয়-নির্ধারণে এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিশ্লেষণে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে রামায়ণে প্রযুক্ত শব্দগুলির নতুন ভাবানুসঙ্গ প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন ব্যঞ্জনার মূর্চ্ছনা এ কাব্যে কতটা সাফল্যলাভ করে কত বিচিত্র অর্থের প্রকাশ ঘটাতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বে তাঁর গভীর প্রবেশ তাঁকে এই রূপক কাহিনীর একটি সুসংলগ্ন এবং পরিপূর্ণ চিত্র-অঙ্কণে সাহায্য

করেছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং কৃষিবিজ্ঞান, এই সমস্ত শাস্ত্রে গভীর অনুপ্রবেশের ফলেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে রামায়ণ কাহিনীর কৃষিসভ্যতাবিষয়ক পরিপূর্ণ আলেখ্য নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার মৌলিকতা স্বীকৃতির দাবী রাখে। গভীর মননশীলতা, প্রগাঢ় বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, অসংলগ্ন চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের দক্ষতা, শব্দের বিভিন্ন ভাবানুসঙ্গ এবং দ্যোতন-সামর্থ্যসম্বন্ধে সচেতনতা,—এ সবের সমন্বয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচক-মন একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

"রামায়ণের উৎস কৃষি" গ্রন্থে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা চিরপরিচিত এবং পুরাতন নয় বলে কারো কারো কাছে নিছক কল্পনাবিলাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হয় যে, রামায়ণের স্বরূপ বিষয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একটি নতুন চিন্তাধারা সংযোজিত করে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। সত্যের উপ-লব্ধিতে যিনি পদক্ষেপ করেন তাঁকেই অভিনন্দন জানাতে হয়। কারণ সত্যের প্রকাশ তো সহসা ঘটে না। বিভিন্ন চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই তো তাকে বরণ করে নিতে হয়। সত্যের জ্যোতির প্রকাশ ঘটানোর জন্যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যে মহতী প্রচেষ্টা করেছেন তাঁকে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্যই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলা সাহিত্যের আসরে আমি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের "রামায়ণের উৎস কৃষি" গ্রন্থটিকে স্বাগত জানাই এবং এর বহুল প্রচার কামনা করি। এই গ্রন্থ যে সত্যানুসন্ধিৎসু গবেষক এবং কৌতুহলী পাঠক উভয়কেই পরিতৃপ্ত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ সম্পর্কে নতুন চিন্তা প্রসারে সাহায্য করবে,—তাতে সন্দেহ নেই।

আমি সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিতের নেতৃত্বে বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের সমস্ত কর্ম্মীবন্ধুকে এবং শ্রীমৃদুলকান্তি সেনের নেতৃত্বে মুদ্রণ বিভাগের সমস্ত কর্ম্মীবন্ধুকে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অভিনন্দন জানাই।

প্রারম্ভ-কথা

সকল কাজের পিছনে কার্যকারণ থাকে। সুদীর্ঘ আট বছরের নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থেরও একটি পটভূমিকা আছে। জীবনের একটি অধ্যায়ে যখন বিপর্যস্ত, সকল কিছুর উপর বীতশ্রদ্ধ, সহায় সম্বলহীন, আত্মীয়বন্ধু পরিত্যক্ত; সেই অন্ধকার দিনগুলিতে অবলম্বন খুঁজেছিলাম দোহালিয়া কালীবাড়ীর মাতৃমূর্তির মধ্যে। নিরাবয়ব সেই মূর্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে হঠাৎ যেন মনের জোর পেলাম। আর তখনই চিন্তা এলো মাতৃস্বরূপার এই অপরূপা মূর্তির কারণ কি? উত্তর খুঁজেছি নানা গ্রন্থে, নানা জনের কাছে; কিন্তু তুষ্টি আসেনি।

সেই চরম অস্থিরতার মাঝে আঘাতের পর আঘাত এসেছে। কখনও মাতৃসম্মুখে, কখনও গ্রন্থের অন্তরে প্রবেশ করে ভুলতে চেয়েছি সেই যন্ত্রণাকে। একদিন কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ছিলাম। পড়ার চেয়ে পাতা ওলটানোর পালা ছিল বেশী। হঠাৎ চোখে পড়ল রামসীতার বিবাহ আসরে বসিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু বংশের পরিচয় জ্ঞাপন করছেন। ব্রহ্ম হতে সৃষ্ট সূর্য। এই সূর্য-বংশর ইক্ষ্বাকু, কুক্ষি, বিকুক্ষি, বাণ প্রভৃতি নামগুলি মনকে আকর্ষণ করল। এই সব নাম ত কেউ ব্যবহার করে না; নামগুলির অর্থই বা কি? খুললাম অভিধান। সেই যে ডুব দিলাম, মনে হয় এ জীবনে এই অবগাহন হয়ত সাঙ্গ করতে পারব না। নানা নামের অর্থভেদের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে ইক্ষ্বাকু বংশের সূত্রে চোখের সামনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ফুটে উঠল। আজকের বিজ্ঞানীরা গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি এবং পৃথিবী নামক গ্রহে প্রাণের বিকাশের একাধিক মতবাদ পোষণ করেন। ইক্ষ্বাকু বংশেও সেই ধ্যানধারণার প্রাচীন ইংগিত পেলাম।

মনে পড়ল বাল্যকালের পড়া স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর লেখা,—গঙ্গা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? উত্তর হইল,—শিবের জটা হইতে।

স্যর জগদীশ ত পুরাণ কাহিনী লিখতে বসেননি, লিখছেন বিজ্ঞান-প্রবন্ধ।

সেই আমার চিন্তার শুরু; রামায়ণের বিভিন্ন উপাখ্যানে, সর্গে, শ্লোকে, শব্দের ভিতরে অনুসন্ধান।

মাসমাইনের বাধ্যবাধকতা কড়ায় গণ্ডায় আদায় দিয়ে পড়াশুনার

জন্য সময় করে নিয়েছি রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে, শরীরের বিশ্রামকে বঞ্চিত করে। সংসার হতে দূরে সরে থেকেছি, সেখানে সকল দায়-দায়িত্ব সহধর্মিণী কল্যাণীয়া অণিমা বহন করেছে একা। পুরো একটি বছর পরে রামায়ণ কাহিনীর অস্পষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক স্বরূপ ফুটে উঠল। মফস্বল সহরে বাস। চাহিদামত বই অমিল, পরামর্শ করার মত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দায়। এরই মধ্যে পরম সুহৃদের ভূমিকা নিয়েছিলেন পাঁচথুপী টি. এন. ইন্সটিট্যুশনের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীবলরাম ঘোষ রায় এবং কান্দি রাজ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শুচিব্রত সেন। মূলত শ্রীমান শুচিব্রত একাধিকবার আমাকে হতাশার অন্ধকার হতে উদ্ধার করেছে, শিক্ষাজগতের বৃহত্তর গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সময় বাল্যবন্ধু শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাগ্রহে তার সাপ্তাহিক 'কান্দী বান্ধব' পত্রিকায় তৎকালিন রচিত পাণ্ডুলিপি "রামায়ণ—পুরাণে ও বিজ্ঞানে" প্রকাশ করে বিষয়টির প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ রচনাটি সম্পর্কে প্রথম উৎসাহ প্রদর্শন করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আরও কিছুকাল পরে মূল বক্তব্যের একটি সারাংশ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মনীষীজনের নিকট পাঠাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগানোর মত কোন সাড়া কেউ দেননি। তবে সাংবাদিক শ্রীকনকেন্দু মজুমদার এবং সুসাহিত্যিক শ্রীবিমল করের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করে উৎসাহিত হয়েছিলাম। ঐ সংক্ষিপ্তসারটি 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার ২৯.৮.৪৩ তারিখের রবিবাসরীয়তে ছাপা হয় এবং 'দেশ' পত্রিকার ৯.১০.৫০ তারিখের ৪৩ বর্ষ ৫০ সংখ্যায় 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে 'রামায়ণ বিতর্ক' নিবন্ধে 'অভিনন্দ' মন্তব্য করেন,—'প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, কিছুদিন আগে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কোনো গবেষকের একটি রচনা কোনো পত্রিকায় যেন পড়েছিলাম—তাতে তিনি পুরো রামায়ণটিকে কৃষি সভ্যতার প্রতীকী বলেই যেন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং রামকে মৌসুমী বায়ু অর্থে, সীতাকে হলকর্ষণ দরুণ সৃষ্ট গর্তকে এবং অন্যান্য সব কিছুরই এই ধরণের ব্যাখ্যা করেছেন। রামায়ণের সঙ্গে কৃষি সভ্যতার যোগাযোগ পূর্ব পণ্ডিতদের অনেকেও অনুমান করেছিল বলে জানি। উৎসাহী মাত্রে এসব লেখা পড়তে পারেন। উপকৃত হবেন। কিন্তু তার আগে আবার বলি রামায়ণ মহাভারত পাঠ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।'

যেহেতু আমার গবেষণার বস্তু রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীর রহস্য ভেদ করে মহাকাব্যের কৃষিসত্তার উন্মোচন, সেকারণে কল্যাণী বিধানচন্দ্র

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ শুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি ২২.৭.৪৩ তারিখের পত্রাঙ্ক ভি সি/বি সি কে ভি ভি/৩৩।৩৮০ পত্রে লিখেছিলেন,—I have gone with interest through your article in which you have tried to draw analogy with agricultural science and Ramayana. I have been very much impressed by the way in which you have been able to show the agricultural base of Ramayana and I have tried to corroborate your view point with suitable annotations. Your attempt is really creditable and I congratulate you for your effort. I hope your effort will receive appreciation at appropriate quarters.

তাঁর এই অকুণ্ঠ সমর্থন আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক-লগ্নে তাঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বছরের পর বছর ঘুরেছে। বারংবার নিবন্ধগুলি সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন করেছি। নিত্য নতুন চিন্তার সংযোজন ঘটেছে। একদিন 'আদিশ্লোক—মা নিষাদ' নিবন্ধটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য এবং বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠিয়ে তাঁর অভিমত চেয়েছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে স্বল্পকালের মধ্যে পত্রোত্তর শুধু নয়, সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করার আগ্রহ তিনি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনিই পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার রবিবাসরীয়তে এবং মুর্শিদাবাদ হতে প্রকাশিত শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চেতনিক' পত্রিকায় এ বিষয়ে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ঐ সূত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। বিষয়বস্তুটির প্রতি তাঁর আগ্রহ আমাকে প্রেরণা জোগায়।

রামায়ণের কাহিনীর কৃষিসত্তা সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হওয়ার পরই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এবিষয়ে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুরাণ কাহিনী ব্যাখ্যার চিন্তাধারার নিকট আমি চিরঋণী। তাঁর প্রদর্শিত পথের সন্ধান না পেলে আমার গবেষণা হয়ত সম্পূর্ণ হত না।

আমার এই গবেষণা কাজে খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থের উপর নির্ভর

করেছি। ফলে গবেষণা গ্রন্থের চাহিদামত টিকাটিপ্পনীর বাহুল্যে গ্রন্থটি কণ্টকিত করার সুযোগ ছিল না। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে, সেগুলি প্রতি প্রকরণের শেষে পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। এই গ্রন্থে সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবাসী প্রেস হতে প্রকাশিত পণ্ডিতপ্রবর ভট্টপল্লী নিবাসী ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের 'বাল্মীকি রামায়ণ' এর অনুবাদ অনুসরণ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে বহু সাধারণ মানুষের নিকট এই গবেষণার বহু সূত্র পেয়েছি, তাঁদের সঙ্গে অনেক আলোচনাও করেছি। উদ্দেশ্য রামায়ণ সম্পর্কে এই চিন্তাধারা যেন কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞজনের মধ্যে সীমায়িত না থেকে সাধারণের পাঠোপযোগী করে তুলতে পারি।

শ্রীযুক্ত রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে গ্রন্থটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশনের জন্য অনুমোদন লাভ করায় নিজেকে পরম সম্মানিত বোধ করছি। তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রস্তাবনাটি লিখে দিয়ে আমাকে অপরিশোধ্য ঋণের দায়ে আবদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে এবং ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে প্রণাম জানাই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীশংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাগ্রহে ভূমিকা লিখে দিতে সম্মতিদান করে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন; তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রীমান শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅসিত বরণ মণ্ডল একাধিকবার পাণ্ডুলিপিটি টাইপ করে দিয়েছে। শ্রীশ্যামল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞান তথ্য সংকলণের ক্ষেত্রে নানাভাবে সহায়তা করেছে। শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতীপ কুমার মিত্র, শ্রীসমর সিংহ ও শ্রীপ্রশান্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতাও স্মরণ করি। বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন রকমের সাহায্য পাওয়ায় এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এ'দের সকলের নামোল্লেখ করতে ভয় পাচ্ছি, কারণ অনবধাবনবশতঃ কারও নাম বাদ পড়লে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। এজন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী এবং এই গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্য য'ারা আমাকে সাহায্য করেছেন ত'াদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়সূচি

প্রথম প্রকরণ

প্রাক-কথা

একাধিক হাজার বছরের অধিককাল ধরে ভারতবর্ষ ও তার পূর্বাঞ্চলের এক বিরাট এলাকায় জনচিত্তে রামকথা তথা রামায়ণ একটি বিশেষ আসন অধিকার করে রয়েছে। ভারতীয় হিন্দু-সমাজে রামায়ণের রাম-সীতা দেবত্বে অধিষ্ঠিত হলেও রামকথার আসল জনপ্রিয়তা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

ধর্মমত নির্বিশেষে একারণেই রামকথা শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং সাধারণ মানুষের সমাজচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। স্থান ও কাল ভেদে রামকথার বিন্যাস ও চরিত্র বদল হয়েছে সত্য, কিন্তু কাহিনীর মূল কাঠামোটি প্রায় ঠিক আছে।

রামকথার জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে সুধী-মহলে বাদ-প্রতিবাদের আজও শেষ হয়নি। বিশেষ করে বর্তমানের প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণ ধর্মগ্রন্থের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় মহাকাব্যের চরিত্রগুলির উপর কোন মন্তব্য করতে গেলেই ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করার আশংকা দেখা দেয়। ফলে রামায়ণ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ কেবলমাত্র বিদগ্ধজনের মধ্যেই সীমিত আছে।

পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে রামকাহিনীর বিচার করেছেন নিজ নিজ শিক্ষা ও চিন্তাধারা দিয়ে।

এই মহাকাব্যের রচনাকাল নিয়ে যেমন নানা মত, তেমনি কাহিনীর ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

মোটামুটি দেখা যায় সাহিত্য ও সংগীত বিশারদগণের বিচারে রামায়ণের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতক ধার্য হয়েছে। রামায়ণে উল্লেখিত গ্রহ-নক্ষত্রের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিদগণেরও এই একই ধারণা।[১] কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতে মহাভারত-বর্ণিত ভারত যুদ্ধের আগের ঘটনা

রাম-রাবণের যুদ্ধ। ভারত যুদ্ধের ঘটনাকাল খৃষ্টপূর্ব চোদ্দশত অব্দ বলে অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত।

রচনাকাল যাই হোক, মহাকাব্য রামায়ণে রাম-চরিত্রটির দৈব ও মানবিক দুটি রূপই স্পষ্ট।

রামায়ণে নানা ঐতিহাসিক-ধর্মীয় ঘটনা এবং ভৌগলিক স্থানের প্রতি এত সুস্পষ্ট ইংগিত আছে যে রামকথাকে নিছক কল্প-কাহিনী হিসাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী-সমৃদ্ধ রামায়ণ একারণেই বহু আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রকৃত স্বরূপ আজও সুস্পষ্ট নয়।

রামকাহিনীর বিভিন্ন সংস্করণ থাকলেও বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ যে প্রাচীনতম এ বিষয়ে দ্বিমত নাই।

বাল্মীকি-রামায়ণেই বলা আছে বাল্মীকি যে গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন তার আদি নাম ছিল 'পৌলস্ত্য বধ' সীতা-চরিত্র-সম্বলিত এই কাব্যকে অবশ্য বারংবার রামায়ণ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণে লংকাকাণ্ডের পর যেভাবে পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়েছে তা'তে পরিষ্কার বুঝা যায় যে উত্তরকাণ্ডটি পরবর্তী সংযোজন। মূল কাহিনীর সঙ্গে উত্তরকাণ্ড প্রায় সম্পর্কহীন। ক্ষেত্রবিশেষে প্রথম ছয়টি কাণ্ডের কোন কোন উপাখ্যানের পরিপূরক মাত্র।

অনুরূপভাবে বালকাণ্ডের অধিকাংশ উপাখ্যানগুলির সঙ্গে মূল-কাহিনীর সম্পর্ক বিশেষ নাই। ঐ কাহিনীগুলির জন্যই রাম-চরিত্রটির দেবত্ব মানতে হয়।

বালকাণ্ডের অংশবিশেষ এবং উত্তরকাণ্ড বাদ দিয়ে মহাকাব্যর যে কাহিনী, সেখানে রাম-চরিত্রটির মানবিক সত্ত্বা সুপ্রতিষ্ঠিত।

রামায়ণে প্রথমেই বলা হয়েছে বাল্মীকি রামকাহিনী প্রথম শুনেছিলেন নারদের মুখে। সুতরাং বাল্মীকি রামকাহিনীর স্রষ্টা নন। প্রচলিত একটি কাহিনী আদিকবি নতুন ছন্দে ও সুরে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন মাত্র।

বাল্মীকি-নারদ কথোপকথনের পরই ক্রৌঞ্চবধ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। মূল-কাহিনীর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে ক্রৌঞ্চবধের কোন সম্পর্ক নাই। অথচ শুরুতে এই ক্রৌঞ্চ-কাহিনীর অবতারণা কি তাৎপর্যপূর্ণ নয়? মূল-কাহিনীবর্জিত একটি উপাখ্যান দিয়ে মহাকাব্য রচনার আরম্ভ চিন্তা করা

যায় না। হয়ত মনে করা যেতে পারে চিরদুঃখী সীতার দুঃখ-বেদনার প্রতীক হিসাবে ক্রৌঞ্চ প্রসঙ্গ। কিন্তু এটি কষ্টকল্পনা মাত্র। কেননা নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌঞ্চীর শোক আর রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার স্বামী-বিরহে শোক, এক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না।

রামায়ণে এমন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অনেক আছে।

রাম সর্বশাস্ত্রবিশারদ হওয়ার পরে দশরথ যখন পুত্রের বিবাহের কথা চিন্তা করছেন ঠিক তখনই কাহিনীর মধ্যে বিশ্বামিত্রর আকস্মিক প্রবেশ। বিশ্বামিত্রর যোগাযোগে রাম ধনুর্ভঙ্গ করে জনক-কন্যা সীতাকে লাভ করেন। অথচ রামসীতার বিবাহের পরই বিশ্বামিত্র যবনিকার অন্তরালে চলে গেলেন। আর কোন প্রসঙ্গেই রাম বিশ্বামিত্রর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না।

সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ সমাপণ করার কারণে মাত্র দশ রাত্রর জন্য বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট হতে রামকে চেয়ে নিয়েছিলেন। তা হলে যজ্ঞ সমাপনের পর অঙ্গীকার-বাক্যের অপলাপ করে বিশ্বামিত্র কেন রাম লক্ষ্মণকে জনকের যজ্ঞ-ভূমিতে ধনু দেখাতে নিয়ে গেলেন?

রামসীতার বিবাহের মুখ্য যোগাযোগকারী বিশ্বামিত্র পরিশেষে মহা-কাব্যে উপেক্ষিত হলেন কেন?

একই বিবাহ-আসরে রাম-প্রমুখ চার ভায়ের সঙ্গে সীতা-প্রমুখা চার বোনের বিবাহ হয়। সীতা-ভগিনী ঊর্মিলার প্রতি আদিকবিই শুধু নিষ্করুণ নয়, লক্ষ্মণ স্বয়ং রামের বনগমনকালে পত্নীকে একবার স্মরণ পর্যন্ত করেননি। ভরত আর শত্রুঘ্নর স্ত্রীদ্বয় মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি বিবাহ অনুষ্ঠানের পর হতেই উপেক্ষিতা। সুতরাং ঊর্মিলা-প্রমুখার মানবিক সত্ত্বা কি স্বীকার করা যায়?

রামের সঙ্গে একই আসরে লক্ষ্মণেরও বিবাহ হয়েছিল। তবু সত্যবাদী রাম পঞ্চবটী বনে শূর্পণখাকে মিথ্যা ভাষণ করেছিলেন। সবটুকুই কি পরিহাস?

রামের যে চরিত্র তা'তে এমন পরিহাস তাঁর চরিত্র বহির্ভূত।

তাছাড়া তাড়কাকে নাসাকর্ণ ছেদন করে পরে হত্যা করার পিছনে বিশ্বামিত্রর সমর্থন ছিল। কিন্তু শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন রামের আকস্মিক ক্রোধের কারণেই হয়েছিল। রামের চরিত্রের সঙ্গে এই আচরণের সংগতি কোথায়?

লক্ষ্মণ বিবাহিত অথবা অবিবাহিত কোন্‌টা সত্য ? নাসাকর্ণ ছেদন হিন্দু সমাজে প্রাচীন কাল হতে বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি রীতি। সেই রীতি শূর্পণখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল কেন ? শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করার ফলেই সীতাহরণ এবং পরিশেষে লংকা-যুদ্ধে রাবণ বধ। কিন্তু পরবর্তীকালে রামায়ণে শূর্পণখার আর কোন ভূমিকা নাই।

রাম বনগমন করলে ভরতের উপস্থিতিতে শত্রুঘ্নর হাতে লাঞ্ছনার পর মন্থরার আর কোন উল্লেখ নাই। অথচ মন্থরার জন্যই রামকাহিনীর বিস্তার।

শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে যে কাহিনী সেই শান্তা কার কন্যা ? কোশলপতি দশরথের, না অঙ্গরাজ রোমপাদর ? শান্তার মাতা কে ?

ঋষ্যশৃঙ্গর কৃপায় দশরথের পুত্রলাভ। তবু এই ঋষির ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। রাম-জন্মের পর কোন ঘটনাতেই এই ঋষির উল্লেখ করা হয়নি।

বালকাণ্ডে (৪.২৯) বলা হয়েছে রাম অযোধ্যার রাজপথে লবকুশকে গান গাইতে দেখে তাদের রাজপ্রাসাদে ডেকে এনেছিলেন। অথচ উত্তরকাণ্ডে (১০৬ সর্গ) আছে রামচন্দ্রর অশ্বমেধ-যজ্ঞে লবকুশকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাল্মীকি। সেখানে লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র তাঁর পুত্রদের চিনতে পেরেছিলেন।

কোন্‌টা সত্যি ?

রামায়ণে এমন অনেক কিছু লক্ষ্য করার আছে, যা অসংলগ্ন মনে হয়।

এই সব অসংলগ্নতার মধ্যেই কিন্তু রামকাহিনীর রূপকভেদের ইংগিত রয়েছে।

মহাকাব্যর আদিশ্লোক মূলতঃ মেঘবন্দনা। লক্ষ্মীপতি যেহেতু তুমি কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ-ক্রৌঞ্চকে বধ করে এসেছ, অতএব তুমি শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

মা নিষাদ অর্থে লক্ষ্মীপতি অর্থাৎ মেঘ।

কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুন শব্দে গ্রীষ্মকালীন সূর্য ও কর্ষিত-জমিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

আদি শ্লোকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কৃষি কথার। কৃষিকথার নির্দেশ

পাওয়া যায় রামায়ণের কেন্দ্রচরিত্র সীতা নামকরণের মধ্যে। সীতা বসুন্ধরা-কন্যা ; হলরেখ। মহাকাব্যর একমাত্র সীতা নামটির উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। সীতা সেখানেও হলরেখ ; মূর্তিমতী কৃষিশ্রী, লক্ষ্মী।

অথর্ববেদের কৌশিক সূত্রে (১৪.৭) সীতাকে 'পর্জন্য পত্নী' বলা হয়েছে। পারস্কর গুহ্যসূত্রে সীতাকে 'ইন্দ্রপত্নী' বলা হয়েছে। সীতার এই স্বরূপ অর্থাৎ কৃষিশ্রী রামায়ণের মূল অবলম্বন। এখানে রাম সীতার পতি।

বেদের নৈসর্গিক দেবতা পর্জন্য, মূলতঃ মেঘ। এই পর্জন্যদেবকে রামায়ণে রাম নামে উল্লেখ করা হয়েছে মনে করা অসংগত হয় না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে গঙ্গাকে শ্রেষ্ঠানদী বলায় ধারণা হয় যে প্রাচীন সরস্বতী নদীর তটদেশ ত্যাগ করে আর্যগণ ভারতের মধ্যদেশে গঙ্গানদী তীরে বসবাস কালে এই মণ্ডলটি রচিত হয়। গঙ্গা-যমুনা-উপত্যকায় কালক্রমে আর্য ও আর্যেতর জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। এই দশম মণ্ডলে 'রামাসুর'এর উল্লেখ আছে। পারসিকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার 'রামাহুর' একজন শান্তির দেবতা।

আবেস্তার অহুর বেদে অসুর হিসাবে স্থান পেয়েছে। আরবি ভাষায় একটি শব্দ আছে 'রামা' ; যার অর্থ নিক্ষেপকারী। মেঘের মানবিক সত্ত্বা কল্পনা করলে মনে হয় সে যেন বৃষ্টির শর নিক্ষেপ করছে।

নানা কারণে মনে করা হয় ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেদ-গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করে বলা যায় তখন মানুষের জীবিকা হিসাবে কৃষিকাজ গৌণ ছিল। মুখ্য জীবিকা পশুপালন, বনজসম্পদ আহরণ ও শিকার বর্ষাকালে অবশ্যই ব্যাহত হত।

এই বৈদিক সভ্যতার কালে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে সমকালীন অথবা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কালে আর একটি সভ্য উন্নত অঞ্চল ছিল, যার বর্তমান পরিচয় 'সিন্ধু সভ্যতা'। এই অঞ্চলটিতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক পর্যন্ত পারসিক ও এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলির প্রভাব অনেক বেশী ছিল। 'সিন্ধু সভ্যতা' চিহ্নিত অঞ্চলে একদা 'আবেস্তা' নির্দেশিত দেব-দেবীর প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক। 'সিন্ধু সভ্যতা' প্রভাবিত এই পাললিক ভূখণ্ডে কৃষি ও বাণিজ্য ছিল প্রধান উপজীবিকা। বর্ষা এদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলের চাহিদা মিটত সুষম বর্ষণে।

এদের বর্ষণ-দেবতা কে ?

মনে হয় 'আবেস্তা' গ্রন্থে উল্লেখিত 'রামাহুর' অর্থাৎ আরবি 'রামা'। এই 'রামাহুর' বা 'রামা'র, অবশ্যই একটি বন্দনা-গান তৎকালীন কৃষক সমাজে প্রচলিত ছিল, এমন চিন্তা অসংগত নয়।

আর্যেতর এই জাতির মেঘবন্দনা-গান লৌকিক-সংগীতের সূত্র ধরে কালক্রমে মধ্য ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল মনে হয়। লৌকিক মেঘবন্দনা-গানের দেবতা 'রামা' যখন আর্য সমাজে তথা সংস্কৃত ভাষার স্বীকৃতি পেল, তখন শব্দটি হল 'রাম'। সংস্কৃত ভাষায় 'রামা' শব্দের অর্থ রমণীয়া, শুভ্রা, সুন্দরী স্ত্রী, প্রিয়া। লক্ষ্মীর এক নাম রামা। সীতা লক্ষ্মীর অংশজাতা।

রামা শব্দের পুংলিঙ্গে রাম হতে পারে। যেমন মূলশব্দ 'বামা'র পুংলিঙ্গে 'বাম'। রামা শব্দের পুংলিঙ্গে রাম ধরে অর্থের কোন পার্থক্য ঘটানো হয় না। লক্ষ্মীর অর্থাৎ কৃষিশ্রীর পতি মেঘকেই বুঝানো যায়। রাম শব্দের অর্থ অসিত, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ। অসিতের বিপরীত শব্দ সিত অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ। সিত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে সীতা, গৌরবর্ণা। রামায়ণের সীতার গাত্রবর্ণও ছিল গৌর ; আর রামের অসিত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ।

রামায়ণে রাম এবং সীতা শব্দ দ্বারা আদিম মানবজাতির গাত্রবর্ণ ভেদে দুই গোত্রের সংমিশ্রণকে ইংগিত করে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

আদি শ্লোক মেঘবন্দনা, রাম মেঘদেবতা এবং সীতা কৃষিশ্রী। সুতরাং রামায়ণের মূল স্বরূপ কৃষিভিত্তিক।

রামায়ণ—রামের (মেঘের অর্থাৎ বর্তমানকালের মৌসুমী বায়ুর) অয়ন অর্থাৎ চক্র বা আবর্তন।

অথবা, রামার (লক্ষ্মীর অর্থাৎ কৃষিশ্রীর) অয়ন (আশ্রয়)।

রামায়ণ শব্দটি যদি বহুব্রীহি সমাস ধরা হয় তাহলে রাম (মেঘ) অথবা রামা (কৃষিশ্রী) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার।

রামায়ণের এই কৃষিচরিত্র সম্পর্কে জার্মাণ পণ্ডিত ওয়েবার প্রথম ইংগিত দিয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সীতাকে হলরেখ এবং রামকে নবদুর্বাদলশ্যাম হিসাবে উল্লেখ করে রামকথাকে কৃষিসভ্যতা বিকাশের রূপক কাহিনী বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রামায়ণের কৃষি-চরিত্র বিষয়ে যে মতামতই পাওয়া যাক না কেন তা অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন।

রামকাহিনীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে অভিমতগুলি ইংগিত পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে।

রামায়ণের উৎস সন্ধানের জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন বাল্মীকি কেন 'পৌলস্ত্য বধ'—পরবর্তী নামকরণ 'রামায়ণ'—রচনা করেছিলেন।

রাম কথার প্রথম বক্তা নারদ। বাল্মীকি উদ্‌গীত শ্লোকের সমর্থন দাতা ব্রহ্মা। রামকথার পরিমার্জিত রূপকার বাল্মীকি। গায়ক লবকুশ। শ্রোতা প্রথমে ঋষিকুল, পরে অযোধ্যার জনগণ এবং পরিশেষে রাজা রামচন্দ্র।

রামায়ণ গীতিকাব্যর সূত্র ধরে রাজা রামচন্দ্রর পরিত্যক্তা স্ত্রী সীতার গর্ভজাত সন্তান লবকুশ পিতার রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করে। অতএব বলা যায় লবকুশকে উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বাল্মীকি 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর ঐতিহাসিকতা অনস্বীকার্য।

সামাজিক তথা রাজনৈতিক কারণে গর্ভাবস্থায় সীতাকে বনবাসে পাঠান হয়। লবকুশের জন্মের আগেই রাজা রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে লবণকে বধের নিমিত্ত মথুরা পাঠান।

সুতরাং স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশায় আশ্রমবাসী কিশোর লবকুশকে চারণের ছদ্মবেশে রামায়ণ গীতিকাব্য অবলম্বন করে রাজা রামচন্দ্রর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। লবকুশের এই ছদ্মবেশ আপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক কারণে পরিত্যক্তা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রদের ঐ একই কারণে রাজা রামচন্দ্র কিভাবে গ্রহণ করবেন সংশয় ছিল।

স্বীকৃতি না পেলে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে প্রাণনাশের বা বন্দীদশার আশংকা থাকে। অপরদিকে শত্রুঘ্ন যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। এমত অবস্থায় শত্রুঘ্ন সিংহাসনের জন্য কোন দাবিদারকে শত্রুজ্ঞানে অবশ্যই দমন করার চেষ্টা করবেন। সুতরাং লবকুশের আত্মপরিচয় গোপন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই একই কারণে তাদের অবলম্বন গীতিকাব্যর মূল বক্তব্যও অবশ্যই প্রচ্ছন্ন রাখা অনিবার্য ছিল। আদিকবি সার্থক-ভাবে যে এই প্রচ্ছন্নতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণ চারণবেশী লবকুশ কর্তৃক গীত রামায়ণের মূল অর্থ রাজদরবারে একমাত্র রামচন্দ্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, অন্য কোন শ্রোতা নয়।

বাল্মীকি-রামায়ণের বৈশিষ্ট্য এই রূপক সৃষ্টিতে।

সুতরাং রামকাহিনীর দুটি স্বরূপ। একটি বাহ্যঃ, অপরটি অন্তর্নিহিত। এজন্য বারংবার রামায়ণে বলা হয়েছে এই গীতিকাব্য বিবিধার্থবহ। লবকুশ কর্তৃক গীত মহাকাব্যর অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তথ্য বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র রামচন্দ্র। অপর সকলের নিকট যে বাহ্যঃ স্বরূপ প্রকাশিত ছিল তার মূলসত্ত্বা মেঘবন্দনা অর্থাৎ মেঘ-আশ্রিত কৃষিভিত্তিক লোকগাথা।

এই মেঘদেবতা রাম এবং কৃষিশ্রী সীতা আজ হিন্দুধর্মের দেবদেবী। বৈদিককাল হতে নৈসর্গিক বিভিন্ন ঘটনা দেবত্ব লাভ করে এসেছে এটা তর্কাতীত সত্য।

আজও ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কয়েক দশক আগেও এদেশের কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত মেঘের আগমন ও প্রত্যাগমনের উপর। এ নিয়ে অতি প্রাচীনকালেই লোকগাথা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই লোকগাথার স্থান ও কালভেদে পরিবর্তন ঘটাও বিচিত্র নয়। মহাকাব্য হিসাবে রামায়ণ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও দেখা যায় রামকাহিনী জনজীবনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে কৃষি-প্রধান মৌসুমী-বায়ু সেবিত অঞ্চলে।

রামসীতার এই দৈব-সত্ত্বাকে নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবেন না। অস্বীকার করার উপায়ও নাই। সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণের বিচার বিশ্লেষণ করে তার রচনাকাল বা ঐতিহাসিকতার তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টাকে ধর্ম-বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা ভেবে নেওয়াটা মোটেই সংগত নয়। কারণ এই বিশ্লেষণের ফলে রামের দেবত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না।

একাদশ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে পালবংশর রাজত্বকালে রাজা রামপালের গুনগান গাইতে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করেছিলেন। ঐ রচনা বহুকাল রামায়ণের একটি সংস্করণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার পরে জানা যায় আসলে দ্বৈত অর্থবোধক রচনাটি রাজা রামপালের স্তুতিবাদ। এই সত্য উদ্‌ঘাটনে রামায়ণের রামসীতার দেবত্ব কি এতটুকু নিস্প্রভ হয়েছে ?

বলা যায় মেঘ-দেবতা রাম ও কৃষিশ্রী সীতাকে কেন্দ্র করে একদা যে লোকগাথা মৌসুমীবায়ু-সেবিত কৃষিভিত্তিক অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল, বাল্মীকি সেই কাহিনী অবলম্বন করে বিবিধার্থবোধক শ্লোকে তাঁর আমলের কোনও এক রাজার হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধারের ঐতিহাসিক বর্ণনা রেখে গিয়েছেন।

সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণের বর্ণিত রামচন্দ্রর মানবিক সত্তা যদি আজ উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলেও স্মরণ রাখতে হবে রামের দৈবসত্তা বিন্দুমাত্র ম্লান হবে না। মহাবীর জৈন ও গৌতম বুদ্ধদেব হতে শুরু করে আজকের দিনের পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের বহু ধর্মবেত্তা আজ দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেও তাঁদের নরদেহসত্তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এরজন্য তাঁদের মূল্যায়ণ কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি। চাঁদের মাটিতে পা দেওয়ায় হিন্দু বা মুসলমান কারও ধর্মবিশ্বাস আহত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। কেন হবে? নিজের বিশ্বাস নিজের কাছে। সম্প্রতি আচার্য সুনীতিকুমারের রামায়ণ বিষয়ক দু-চারটি মন্তব্য প্রচণ্ড আলোড়ন ও উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি তাঁর মন্তব্যর সমর্থনে প্রতিশ্রুত গ্রন্থটি রচনা করে যেতে পারেননি। এই গ্রন্থ রচনা যদি সম্পূর্ণ হত এবং রামায়ণের রাজা রামচন্দ্রর কোন মানবিক সত্তা স্থিরীকৃত হত, তাহলে রামকথার প্রাচীনত্ব ও রামের দেবত্ব এতটুকু ক্ষুন্ন হত বলে মনে করি না। কারণ মেঘদেবতা রাম এবং ঐতিহাসিক রামচন্দ্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা।

কোনদিন রামায়ণের রামচন্দ্রর মানব-সত্তা উদ্‌ঘাটিত হলে সোচ্চার হওয়ার কারণ নাই। কেন না বৈষ্ণব মতবাদের রূপকার পঞ্চদশ শতাব্দীর চৈতন্যদেব মহাপ্রভু, একাধারে নরদেহী এবং ঈশ্বর অবতার। যদি দেখা যায় কোন এক কালে কোন এক রাজা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় ও বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়ায় বিষ্ণুর অবতার হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন; তাহলে আপত্তির কি কারণ ঘটতে পারে?

আজকের মানুষের মন বিশ্লেষণ-ধর্মী। কোন কিছু বিচার না করে সে গ্রহণ করতে চায় না। এজন্য দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত যোগী সাধুসন্তর অলৌকিক ক্ষমতাকে বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াস।

এতকথা বলার উদ্দেশ্য এই যে রামকাহিনীর উৎস ও ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটন-প্রচেষ্টা কোন প্রকারেই কারও ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা নয়।

আগেই বলেছি বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্য রচনায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে পুরোপুরি রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন; বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে। সুতরাং ব্যক্তি ও স্থান নামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক মানতে হবে, নতুবা রামায়ণের বিবিধার্থবোধক বিশেষণটি ব্যাহত হয়। নামের বুৎপত্তিগত অর্থ,

ব বি/রামায়ণের উৎস/৬০০-২

সংশ্লিষ্ট কাহিনী এবং প্রয়োজনীয় ইংগিত অনুধাবন করে মূল বক্তব্যর সন্ধান করতে হবে।

দশরথের কোশলরাজ্যে অযোধ্যা নামে এক নগরী ছিল। কোশল রাজ্যটির ঐতিহাসিক সত্তা আছে বলে অযোধ্যা নামেও একটি নগরী ছিল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালে নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হবে। অযোধ্যা শব্দের অর্থ, যেখানে যোদ্ধা নাই অথবা যোদ্ধাদেরও অগম্য স্থান ; উভয়ই হতে পারে। সুতরাং অযোধ্যা শব্দ দ্বারা প্রাচীন এমন একটি নগরীকে ইংগিত করা হয়েছে যাহা কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমানের কোন স্থানের নামের সাদৃশ্য হেতু সেই স্থানটিকে রামায়ণের অযোধ্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে গেলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

রামায়ণের কৃষিভিত্তিক সত্তাকে যত সহজে চেনা যায়, তার ঐতিহাসিক সত্তা ততই দুরূহ। শব্দ চয়নে প্রচণ্ড কুশলতা বিভ্রম ঘটায় পদে পদে। তাছাড়া বৈদিক সাহিত্যরীতি অনুসরণে প্রচ্ছন্নতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতা শব্দে কৃষিশ্রী, রাজ্যশ্রী, ভাগ্যশ্রী, শুভ্রাঙ্গী ইত্যাদি অনেক কিছু ইংগিত করা যায়। অতএব বিবিধার্থবোধক সীতা শব্দটির সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এক এবং একটিমাত্র ব্যক্তি-সত্তার কিনা চিন্তা করতে হবে।

রামায়ণে কৃষিভিত্তিক লোকগাথার মেঘ যেমন রাম ও হলরেখ সীতা, তেমনি ঋতুচক্রের বিভিন্ন নৈসর্গিক ঘটনাগুলি এবং বিভিন্ন পদার্থ ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও মানবিক স্ত্রী-পুরুষের আকার ধারণ করে সাধারণ মানুষের মতই ভাবভঙ্গি প্রকাশ করেছে। এছাড়া বিশ্বজগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং জীবজগতের সকল কিছুই মানুষের মত আচরণ করায় রামায়ণের কাহিনীগুলিতে এত জটিলতা।

রামায়ণে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার যেমন আছে, তেমনি ভাবার্থেও অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

রামায়ণ নিয়ে আলোচনায় বসতে হলে সংস্কারমুক্ত মনে স্মরণ রাখতে হবে বাল্মীকি ছদ্মনামে একজন সর্বশাস্ত্র-বিশারদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে 'পৌলস্ত্য বধ' তথা 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন তৎকালীন একটি জনপ্রিয় কৃষিলোকগাথা অবলম্বন করে।

এমত ধারণার হেতু এই যে বাল্মীকি বিভিন্ন ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এই কাব্য বিবিধার্থবোধক। উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি লবকুশকে অশ্বমেধ যজ্ঞ-

প্রাঙ্গণে রামচন্দ্রর সম্মুখে রামায়ণ গান গাওয়ার প্রাক্‌কালে যে উপদেশ দিয়েছেন তা অনুসরণ করলে স্পষ্ট হয় যে এই কাব্যর সূত্র ধরে লবকুশকে সন্তানের স্বীকৃতি পাইয়ে দেওয়া। কার্যক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই। যাই হোক, রামায়ণের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য।

বর্তমানে ঐ প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে রামায়ণের কৃষিভিত্তিক সত্তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।



পাদটীকা

১। "দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণ গ্রহণ করা যাক। পতঞ্জলি মগধ দেশে পুষ্পমিত্র রাজার রাজত্ব সময়ে পাণিনির উপর মহাভাষ্য লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার ঐতিহাসিক প্রমাণে মহাভাষ্য রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০ বর্ষ স্থির করিয়াছেন। মহাভাষ্যের পূর্বে বাল্মীকির রামায়ণ ছিল। এজন্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তেলাঙ্গ বর্তমান রামায়ণ রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বর্ষ অনুমান করিয়াছেন। উহাতে মেষাদি সংজ্ঞা ও গ্রহ-নক্ষত্রের সম্বন্ধ আছে। মেষাদি সংজ্ঞা আছে বলিয়া জানিতেছি যে, খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর পরে রামায়ণের বর্তমান আকার হইয়াছে, তৎপূর্বে হয় নাই। ঐ সময়ের পূর্বে যে রামায়ণ ছিল না, তাহা অবশ্য আমাদের উক্তিতে নিবারিত হইতেছে না।" শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ", পৃষ্ঠা ১৬৪।

দ্বিতীয় প্রকরণ

আদিশ্লোক—মা নিষাদ

বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম শ্লোক,

তপঃ সাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্ ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১

(১.১.১)

অর্থাৎ, মহর্ষি বাল্মীকি তপোনিরত স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদবিদদিগের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধন করলেন।

নারদের নিকট বাল্মীকির জিজ্ঞাস্য ছিল সম্প্রতিকালে লোকে সর্বগুণে বিভূষিত শ্রেষ্ঠ কে ?

উত্তরে নারদ রামের পরিচয় তথা জীবন বৃত্তান্ত শোনালেন।

কথোপকথন শেষে নারদ বিদায় নিলে বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে নিয়ে অবগাহনের উদ্দেশ্যে জাহ্নবীর অদূরে তমসায় উপনীত হয়ে ভরদ্বাজকে কলস রেখে বল্কল দিতে বললেন। বল্কল নিয়ে তমসার বনে বিচরণকালে বাল্মীকি সুরতাসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুন দেখলেন। হেনকালে অদৃশ্য ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ নিহত হলে শোকাভিভূত বাল্মীকির কণ্ঠ হতে উদ্‌গীত হল,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ ১৫

(১.২.১৫)

এই শ্লোকটি আদিশ্লোক হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। যদিও এটি রামায়ণের প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গের পঞ্চদশতম শ্লোক। এই শ্লোকের প্রচলিত আক্ষরিক অর্থ, 'রে নিষাদ! যেহেতু তুই, এই ক্রৌঞ্চমিথুনমধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবি না।'

শ্লোক উদ্‌গীত হওয়ার পর বাল্মীকি শিষ্যকে বললেন,—'এই চতুষ্পাদ-বদ্ধ, প্রতিপদে সমানাক্ষর ও বীণালয়-সমন্বিত বাক্য, শোক সময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকই হোক।'

অতঃপর অবগাহনান্তে এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বাল্মীকি আশ্রমে ফিরলে ব্রহ্মা উপস্থিত হন।

ব্রহ্মার উপস্থিতিতে আত্মমগ্ন বাল্মীকি ঐ শ্লোক উচ্চারণ করলে ব্রহ্মা এটি শ্লোক হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে বাল্মীকিকে এইভাবে রামকথা রচনা করার নির্দেশ দিয়ে বর দিলেন বাল্মীকি রামের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল প্রকাশ্য ও রহস্য তথ্য অবগত হবে।

এখানে লক্ষণীয় যে বাল্মীকি প্রথম নারদের নিকট রামকথা অবগত হয়েছিলেন। নারদের বিবৃত কাহিনীই উত্তরকাণ্ড বাদে বাকি ছয়টি কাণ্ডে বাল্মীকি বিস্তারিত করেছেন।

সুতরাং বাল্মীকি রামকথার স্রষ্টা নন। একটি তৎকালীন প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

আদিশ্লোকটির আক্ষরিক অর্থ এবং পটভূমিকা অনুসারে মানতে হয় ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ-ক্রৌঞ্চ বধের দৃশ্যে মুহ্যমান বাল্মীকির কণ্ঠ হতে শ্লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল।

কিন্তু এই শ্লোকটির অন্য অর্থও আছে।

মা অর্থ লক্ষ্মী।

নিষাদ, নিষদ এবং নিষাধ সমার্থক, যার অর্থ ধরা হয় পতি।

সুতরাং, মা নিষাদ শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপতি অর্থাৎ নারায়ণ।

নার (জল)এ যার অয়ন (শয়ন, আশ্রয়)। সহজ কথায় মেঘ।

বসুন্ধরার কন্যা সীতা লক্ষ্মীর অংশজাতা। সীতা অর্থ হলরেখ।

কৃষিকাজের সার্থকতা মেঘের বারিবর্ষণে, বিনা জলে কর্ষিত জমি বন্ধ্যা,—অ-লক্ষ্মী।

ক্রৌঞ্চ অর্থ রাক্ষস বিশেষ।

রক্ষ্ (রক্ষা করা) ধাতু নিষ্পন্ন রাক্ষস শব্দের অর্থ, যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয়।

প্রাণ-জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের মূলে দ্যাবাপৃথিবী। স্থূলভাবে, দ্যোঃ অর্থে অন্তরীক্ষের সূর্য এবং পৃথিবী অর্থে কর্ষণযোগ্য ভূখণ্ড; এই দুয়ের সংযোগ মূলতঃ মানব সমাজের অগ্রগতির উৎস। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড দাবদাহ

জীব জগতের ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। এই অবস্থার নিরসন হয় বর্ষা মেঘের আবির্ভাব ঘটলে। আদিশ্লোকে গ্রীষ্মকালীন দ্যাবাপৃথ্বীকে রহস্যে ক্রৌঞ্চ-মিথুন আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দ্যোঃ এবং পৃথ্বীকে আদিশ্লোকে রাক্ষস অর্থে ধরে ক্রৌঞ্চমিথুন বলা হয়েছে। সূর্য এবং পৃথিবী সকল সময়েই মিথুনাবদ্ধ থাকলেও দক্ষিণায়নাদির প্রাক্কালে গ্রীষ্মঋতুতে সূর্যতেজে ধরিত্রী উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই তপ্ত অবস্থাকে মহাকাব্যে কামমোহিত বলা হয়েছে।

অতএব, আদিশ্লোকটির অর্থ দাঁড়ায়,—দ্যাবাপৃথ্বীর দ্যোঃকে আচ্ছাদিত করে লক্ষ্মীপতি তুমি আবির্ভূত হয়ে শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভ কর।

এই অর্থে আদিশ্লোকটি মেঘবন্দনা।

বলা যায় রামায়ণ মহাকাব্যর এইটি মঙ্গলাচরণ এবং আদিশ্লোকটি সমগ্র রামায়ণের বীজস্বরূপ।

রামকাহিনীর প্রথম বক্তা নারদ, সম্মতিদাতা ব্রহ্মা, রচনাকর্তা বাল্মীকি এবং প্রয়োগকর্তা লবকুশ।

নারদ,—নার (জল) + দা (দেওয়া)—ড কর্তৃ। যিনি জল দান করেন।

অথবা, না (সৃষ্টিকর্তা) র (সংহারকর্তা) দ (পালনকর্তা)।

উভয় ক্ষেত্রেই ভাবার্থে অন্তরীক্ষ।

বল্মীক (উইঢিবি) শব্দ হতে উদ্ভূত বাল্মীকি অর্থে কাঁকরহীন ভূখণ্ড অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমি এই ইংগিত করা যায়।

সুতরাং বলা যায় বাল্মীকি (আবাদযোগ্য ভূখণ্ড) একদা নারদের (অন্তরীক্ষের) নিকট জানতে চেয়েছিলেন এই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তরে রামকথার অবতারণা, অর্থাৎ মেঘের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করা। যদি মেঘের বারিবর্ষণ না হত তাহলে পৃথিবীও চন্দ্রের মত প্রাণহীন থাকত। জলের আবির্ভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণের বিকাশ।

প্রাণ-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতির ক্রমবিকাশে আবাদীজমিতে কৃষিকাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

কৃষিকাজ ঋতুচক্র তথা মেঘচক্রের উপর নির্ভরশীল। বর্ষায় আশানুরূপ বর্ষণ না হলে কৃষিকাজ ব্যাহত হয়। অপরদিকে সীতা অর্থাৎ হলকর্ষিত জমি লক্ষ্মীস্বরূপা হিসাবে গণ্যা হবে তখনই, যখন রাম অর্থাৎ মেঘদেবতা

আশীর্বাদস্বরূপ বারিবর্ষণে সীতাকে সিঞ্চিত করবে।

দ্যৌঃ এবং পৃথ্বী আদি পিতা ও মাতা। দ্যৌঃ মেঘকে ধারণ করে, সুতরাং রাম দ্যৌঃ-এর পুত্র।

পৃথ্বীর বুকে হলকর্ষণ করলে সীতার আবির্ভাব ঘটে, একারণে সীতা বসুন্ধরা-কন্যা।

আদি পিতামাতার সূত্রে রাম ও সীতা ভাইবোন। কিন্তু বর্ষাঋতুতে বারিবর্ষণের সূত্র ধরে উভয়ের মধ্যে সংযোগসাধন না ঘটলে সৃষ্টি স্থিতিলাভ করতে পারে না। এক্ষেত্রে এদের সম্পর্ক দাঁড়ায় স্বামী-স্ত্রী। যেহেতু রামায়ণে সকল বস্তু এবং তথ্যকে মানবিক স্বরূপে প্রকাশ করা হয়েছে, সেকারণে রাম (মেঘদেবতা) এবং সীতার (কৃষিশ্রী) মধ্যে দুই ধরণের সম্পর্ক আপাতঃদৃষ্টিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই দুই সম্পর্ক বিজ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করলে প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না।

আদিশ্লোকের সমর্থক ব্রহ্মা।

নিরাকার ব্রহ্ম সাকার অবস্থায় ব্রহ্মা।

সুতরাং বাল্মীকির মেঘবন্দনার মধ্যেই পরবর্তী কার্যকারণ অর্থাৎ ফসল উৎপাদন নিহিত রয়েছে। এই কার্যকারণের প্রতি ইংগিত দেওয়ার জন্যই ব্রহ্মার সম্মতি।

রামায়ণের প্রয়োগকর্তা লবকুশ।

লব ও কুশ শব্দ দুটির মধ্যেই কৃষিসত্তা অর্থাৎ উদ্ভিদের বীজ হতে আবির্ভাবের তথ্য লুকিয়ে রয়েছে।

নারদের নিকট রামকথা শোনার পর বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে নিয়ে জাহ্নবীর অদূরে তমসায় গমন করেন। সেখানে বাল্মীকি শিষ্যকে কলস রেখে বল্কল দিতে বলেন। তারপর তমসার বনে বিচরণকালে সুরতাসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ-ক্রৌঞ্চের নিধন-দর্শনে শ্লোকের আবির্ভাব।

এই বিবরণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ইংগিত দেয়।

রামায়ণের কালে সূর্য কর্কটরাশিতে এলে শ্রাবণ মাস বর্ষা ঋতুর প্রথম মাস। ক্রৌঞ্চমিথুন শব্দটি সূর্যর মিথুনরাশির পুনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থান ইংগিত করছে। যুগ্ম-তারকা পুনর্বসু নক্ষত্র মিথুনের দ্যোতক। পুনর্বসু নক্ষত্রর তারাগুলির সমন্বয়ে ক্রৌঞ্চমিথুন কল্পনা করা যায়।

সূর্যর এই অবস্থানকাল গ্রীষ্মঋতুর শেষ মাস আষাঢ়। ধরে নেওয়া

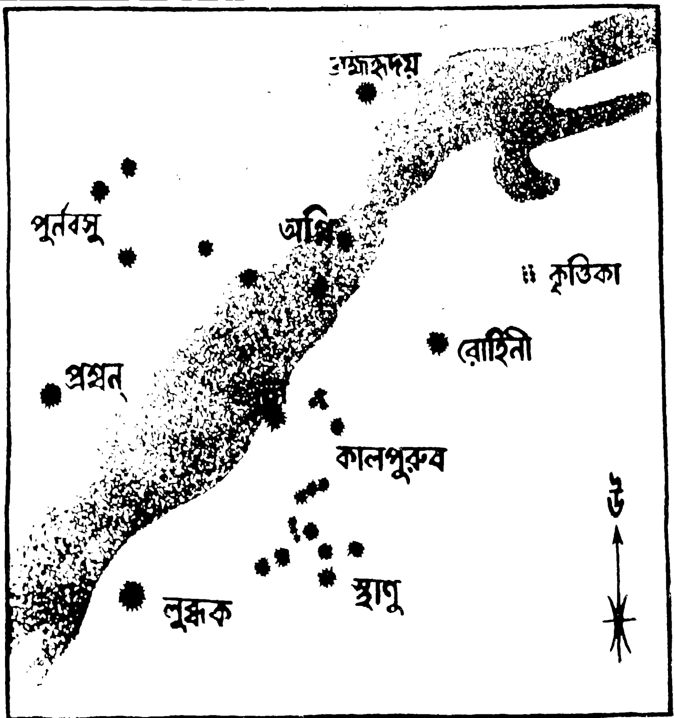
যেতে পারে তিথি অমাবস্যা, এক্ষেত্রেও মিথুন শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। যেহেতু অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র সমসূত্রে থাকে।

জাহ্নবী অর্থে ছায়াপথ। জাহ্নবীর অদূরে অর্থে ছায়াপথের পূর্বদিকস্থ পুনর্বসু নক্ষত্র।

তমসা শব্দে বৃষ্টিহীন প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ধ্বংসোন্মুখ পরিবেশকে বুঝানো হয়েছে। গ্রীষ্মঋতুর শেষে জলাশয় শুকিয়ে যায়, নদীর বুকে বালির চর জেগে ওঠে, বায়ুপ্রবাহ ও ভূ-পৃষ্ঠ রুক্ষ ও তপ্ত, জলাভাবে উদ্ভিদাদি শ্রীভ্রষ্ট ও মৃতপ্রায়, জীবজগৎ তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত, আকাশের রং তাম্রবর্ণ।

এই ধ্বংসোন্মুখ পরিস্থিতিতে বাল্মীকি বিচরণ করার কালে পুরুষ ক্রৌঞ্চ নিহত হয়।

নিহারিকাপ্রবহ হতে সূর্যর সৃষ্টি, একারণে দ্বিজ। সূর্যরশ্মি বিশাল



বিশ্বে প্রসারিত, সুতরাং বিস্তৃতপক্ষ। গ্রীষ্মের আকাশের রং তাম্রবর্ণ, অতএব তাম্রশীর্ষ।

ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ কোঁচবকের মিথুনকাল গ্রীষ্মঋতুর শেষে ও বর্ষার প্রথমে।

সুতরাং ক্রৌঞ্চবধ অর্থে গ্রীষ্মের শেষে প্রথম আবির্ভূত মেঘ দ্বারা সূর্যর আচ্ছাদন।

সূর্য আড়াল হলেও ভূপৃষ্ঠ হতে তখনও তাপ বিকিরণ হয়। একারণে ক্রৌঞ্চের শোকে ক্রৌঞ্চীর অস্থিরতা প্রকাশ করা।

তাম্রশীর্ষ বিস্তৃতপক্ষ দ্বিজ পুরুষ ক্রৌঞ্চ গ্রীষ্মকালীন সূর্যর প্রতীক।

জ্যোতির্বিজ্ঞান দৃষ্টিতে বাল্মীকিকে ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্র ধরা যায়।[১]

অদৃশ্য ব্যাধ শব্দ সেক্ষেত্রে লুব্ধক তারাকে ইংগিত করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিশ্লোকের আবির্ভাবের পটভূমিকাটি চিন্তা করলে গ্রীষ্মকালীন পরিবেশে বৃষ্টির কামনায় মেঘবন্দনার স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়।

যেহেতু রামায়ণে মেঘদৈবত রাম ও কৃষিশ্রী সীতার সকল চরিত্র আলোচিত হবে, সেকারণে বর্ষাঋতুর প্রাক্‌কালে মেঘবন্দনা করে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে।

আদিশ্লোকের মধ্যে সংগীত বিজ্ঞানের ইংগিত রয়েছে।

বাল্মীকি বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিবিধ-অর্থবহ এই কাব্য বীণাতন্ত্রীলয়ে সংগীত শাস্ত্রানুসারে পঠিত ও গীত হবে।

> পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
> জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥ ৮
> রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
> বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥ ৯

(১. ৪. ৮-৯)

অর্থাৎ, এই কাব্য পাঠ ও গানে মধুর, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতরূপে ত্রিবিধ-প্রমাণ-সংযুক্ত ষড়্‌জ ও মধ্যম প্রভৃতি সপ্তস্বর-সংযুক্ত, বীণালয়বিশুদ্ধ এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর প্রভৃতি সমুদয় রসসংযুক্ত।

উপরোক্ত শ্লোক হতে সুস্পষ্ট যে রামায়ণের কালে সংগীতের ক্ষেত্রে স্থান, লয়, মূর্ছনা, জাতি, স্বর প্রভৃতির বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু দেখা যায় রামায়ণে বাল্মীকি কোথাও 'রাগ' শব্দটি ব্যবহার করেননি। সুতরাং বলা যায় তখন 'রাগ' শব্দটির প্রচলন হয়নি, কিন্তু যে কার্যকারণ হতে 'রাগ'

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০-৩

শব্দটির উদ্ভব, সেই কার্যকারণ অবশ্যই বর্তমান ছিল।

পণ্ডিতগণের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০-৫০০ অব্দে সংগীতের ক্ষেত্রে চারটি ধারা বা সম্প্রদায় ছিল।

(১) ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত সম্প্রদায়,

(২) গন্ধর্ব নারদ সম্প্রদায়,

(৩) মুনি ভরত সম্প্রদায়,

(৪) নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায়।

কেউ কেউ ব্রহ্মাভরত ও মুনি ভরত সম্প্রদায়কে একই মনে করেন এবং তাঁদের মতে সম্প্রদায় চারটি নয়, তিনটি।

একথা স্বীকৃত যে নারদ, ভরত প্রভৃতি নামগুলি গোত্রনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তীকালে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত।

ভরত বাল্মীকির সহসময়ী।[২]

আদিশ্লোকের পশ্চাদ্‌পটে দেখা যায় নারদ প্রথম রামকথা ব্যক্ত করেন। তারপর বাল্মীকির ক্রৌঞ্চবধ দর্শন ও শ্লোকের আবির্ভাব। পরে অবচেতন ভাবে ব্রহ্মার সম্মুখে ঐ শ্লোক উদ্‌গীত হলে ব্রহ্মা এটি সমর্থন করে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দেন।

এখানে নারদ, ব্রহ্মা ও বাল্মীকি-শিষ্য ভরদ্বাজ নামগুলি প্রাচীন ভারতের সংগীতশাস্ত্র প্রবর্তকগণের প্রতি ইংগিত রাখছে।

ব্রহ্মা বৈদিক সংগীতরীতির এবং নারদ লৌকিক বা গান্ধর্বরীতির প্রবর্তক। নারদের রামকথাকে ধরে নেওয়া যায় তৎকালীন কৃষিভিত্তিক কোন প্রাচীন লোকসংগীতের মার্জিত রূপ।

নারদ লোকসংগীতের সুর ইত্যাদি মার্জিত করে মার্গসংগীত পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। নারদ বীণাযন্ত্রেরও উদ্ভাবক।

বাল্মীকির শিষ্যর নাম ভরদ্বাজ।

ভরত + জন্—ড কর্তৃ ; ভরদ্বাজ অর্থে ভরতের পুত্র। শিষ্য সকল সময়েই পুত্রস্থানীয়। সুতরাং শিষ্য ভরদ্বাজের গুরু অবশ্যই ভরত। বাল্মীকি ও ভরত সমার্থক ; ক্ষেত্র। কুশলব গান্ধর্ব সংগীত তত্ত্বে পারদর্শী ছিল।

তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্চ্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ ॥ ১০

(১ ৪. ১০)

কুশলব বাল্মীকি আশ্রমে লালিত পালিত হয়েছে। তাদের রামায়ণ শিক্ষাও বাল্মীকির নিকট। সুতরাং বাল্মীকি অবশ্যই সংগীতে বিশেষতঃ গান্ধর্বরীতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মনে হয়, বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ গানে নারদীয় ও বৈদিক উভয় সংগীত ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংগীত বিজ্ঞানের সংস্কার সাধন করেছিলেন। এরই ইংগিত দেওয়া হয়েছে নারদের রামকথা কথনে, বাল্মীকির সুরারোপিত কাব্যছন্দের উদ্ভাবনে এবং ব্রহ্মার স্বীকৃতিদান ঘটনায়।

ব্রহ্মা জানতেন না শ্লোকের আবির্ভাবের পূর্বঘটনা। অথচ শ্লোকটির স্বীকৃতিদান করে ঐভাবে রামের চরিত্র বর্ণনের জন্য বাল্মীকিকে নির্দেশ দিলেন। অতএব শ্লোকটির শব্দার্থ এবং স্বর সংস্থান মেঘবন্দনার স্বরূপ সুস্পষ্ট করে তুলেছিল, এই কারণেই ব্রহ্মা রামকথা অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক লোকসংগীতের পরিমার্জিত গ্রন্থনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রামকথা শোনার পর বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে সংগে নিয়ে জাহ্নবীর অদূরে তমসায় গিয়েছিলেন অবগাহন কারণে। ভরদ্বাজের সংগে ছিল কলস। বাল্মীকি শিষ্যকে কলস রেখে বল্কল দিতে বললেন। বল্কল হাতে নিয়ে বিচরণের কালে ক্রৌঞ্চবধ দর্শন।

অবগাহন অর্থে স্নান। কিন্তু কোন কিছুর গভীরে প্রবেশ করা অথবা কোন চিন্তায় আত্মমগ্ন হওয়া অবগাহন শব্দে প্রকাশ করা যায়।

কলস—কল (মধুরাস্ফুট ধ্বনি)—শো + ড কর্তৃ।

কলস শব্দ দ্বারা মৃদংগ, খোল প্রভৃতি মৃত্তিকাধার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে বুঝানো যায়।

বল্কল—বল্ (আস্তরণ করা) + কল ; বৃক্ষত্বক।

বীণার প্রতিশব্দ বল্লকী।

বল্লকী—বল্ (আস্তরণ করা) + ণক্ কতৃ + ঈপ্।

উভয় শব্দ 'আস্তরণ করা' শব্দজাত বিধায় রহস্য সৃষ্টির কারণে অবগাহন ও কলস শব্দের সংগে সামঞ্জস্য রেখে 'বল্কল' শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তারযন্ত্র মূলতঃ বৃক্ষত্বক দিয়ে তৈরী হয়।

জাহ্নবী, তমসা, ক্রৌঞ্চ-মিথুন, অকর্দমতীর্থ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কাহিনীতে গ্রীষ্মকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে মেঘবন্দনার সময়কালকে যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, তেমনি কলস, বল্কল, অবগাহন শব্দ দ্বারা সংগীত তথ্য সূচিহ্নিত।

দেখা যায় বাল্মীকির রামায়ণ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বহু অর্থবহ এই গীতিকাব্য অবলম্বন করে চারণের ছদ্মবেশে সীতার গর্ভজাত কুশ ও লবকে তাদের পিতা রাজা রামচন্দ্রর সম্মুখে উপস্থাপিত করা। এই উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু হিসাবে লোকসংগীতের রামকথাটির নব-রূপায়ন সম্পর্কে বাল্মীকি চিন্তা করেছিলেন।

গান্ধর্ব-সংগীত বিশেষজ্ঞ বাল্মীকি প্রথমে মৃদংগ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মেঘবন্দনার নতুন সুর সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনঃপুত না হওয়ায় তারযন্ত্রের শরণাপন্ন হন।

মেঘবন্দনার উপযুক্ত কাল গ্রীষ্মঋতুর শেষ পর্যায়ে ; যখন মানুষ তথা জীবজগৎ মেঘ সমাগম ও বারিবর্ষণ ব্যাকুলভাবে কামনা করে। সংগীতের ভাব ও সুর (পরবর্তী কালে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যাকে 'রাগ' বলা হয়) ঋতু তথা সময়কাল আশ্রিত। সুতরাং বাল্মীকি তৎকালীন প্রচলিত মেঘবন্দনা তথা মেঘগীতির সুরে বিবর্তন সাধনের চিন্তা ভাবনার কালে কলসজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বর্জন করে তারযন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন।

এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল শ্লোকের আবির্ভাব।

ক্রৌঞ্চবধ প্রসংগে শৃঙ্গার, বীভৎস, করুণ ও রৌদ্র রসের অবতারণা করা হয়েছে। এই রসগুলির আশ্রিত স্বর যথাক্রমে মধ্যম, নিষধ, ষড়্‌জ এবং ধৈবত। এই চারটি স্বরের আদ্যাক্ষর নিয়ে আদিশ্লোকের প্রথম শব্দ —মা নিষাদ। মা শব্দটি স্বতন্ত্র রাখার হেতু মধ্যম বাদী বা গ্রহস্বর। নিষাদ শব্দের 'দ' অক্ষর ইংগিত করছে ধৈবত বর্জিত।

এই চারটি স্বরের উপর ভিত্তি করে প্রাচীনকালে 'মেঘরাগ' জাতীয় মেঘবন্দনা গাওয়া বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে বাদী মা (মধ্যম), সম্বাদী ষ (ষড়্‌জ), *ঔড়বষাড়ব জাতি, ধ (ধৈবত) বর্জিত। ধ্রুবপদ।*[৩] পণ্ডিতগণের মতে চার স্বরের রাগ অনার্য সংগীতের পর্যায়ে পড়ে।[৪]

বর্তমান কালের মেঘ তথা বর্ষা আশ্রিত মেঘরাগের প্রাচীন উল্লেখ একাদশ-দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের আগে পাওয়া যায় না। কিন্তু মল্লার বা মল্লহার বা মলহার রাগের অস্তিত্ব পঞ্চম-সপ্তম খৃষ্টাব্দে ছিল।

দেশজ রাগগুলি কোন বিশেষ স্থান বা গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। সেক্ষেত্রে মল্লার দৈশজ রাগ মল্লজাতি অথবা প্রাচীন মলদ দেশের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। গঙ্গার দক্ষিণে মলদরাজ্য এবং সেই অঞ্চলে মল্লগণের বসবাস উভয়ই ইতিহাস-সিদ্ধ।

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে রচিত জাতক কাহিনীর মৎস্য জাতকে (নং ৭৫) মেঘবর্ষণের উদ্দেশ্যে গীত মেঘগীতির উল্লেখ আছে। জাতকে 'রাগ' শব্দের উল্লেখ নাই ; কিন্তু মেঘবর্ষণের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ ধরণের সংগীত ছিল তার সুস্পষ্ট ইংগিত পাই। রামায়ণে সংগীত-তত্ত্বের উল্লেখ অনুসরণ করে পণ্ডিতগণ এই মহাকাব্য রচনার সময়কাল নির্ধারণ করেছেন খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক।[৫] সুতরাং খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে রামায়ণের কালে মেঘবন্দনা সংশ্লিষ্ট চারটি স্বর আশ্রিত মেঘগীতির অস্তিত্ব অন্‌-আর্য কোন সম্প্রদায়, বিশেষ করে কৃষিনির্ভরশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান ছিল এই কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুতরাং আদিশ্লোকের মধ্যে অন্তর্নিহিত সংগীত-তত্ত্বের ইংগিত অনুসরণ করে শ্লোকটির কৃষিসত্তা স্বীকার করতে হয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মনে হয় না আদিকবি অবগাহনের উদ্দেশ্যে তমসা নামক নদীতীরে বল্কল হাতে বিচরণকালে কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ক্রৌঞ্চকে নিহত হতে দেখেছিলেন।

আদিশ্লোকটি বিবিধার্থবহ। এর মধ্যে নব উদ্ভাবিত ছন্দ, পরিমার্জিত স্বর-সংযোজন এবং মহাকাব্যের মূল বক্তব্য বিষয়ের ইংগিত রাখা হয়েছে। বর্তমান অর্থভেদ অনুসরণে ক্রৌঞ্চবধ ঘটনাটি মূল কাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন মনে হবে না।

বাল্মীকি রামকথার স্রষ্টা নন, মনে করি নারদও নন। প্রাচীনতম কালের কৃষিজীবি মানবগোষ্ঠীর মেঘদেবতার বন্দনায় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের মধ্য দিয়ে এই কাহিনী আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই রামকথা একান্তভাবে মেঘদৈবত রাম ও কৃষিশ্রী সীতাকে অবলম্বন করে। নারদ সেই কাহিনীর সুর মার্গ-সংগীতের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। বাল্মীকি তাঁর প্রয়োজনমত কাহিনী ও সুর উভয়ই সর্বজনগ্রাহ্য করে 'রামায়ণ' রচনা করেন।

তৃতীয় প্রকরণ

প্রথম নাম--পৌলস্ত্যবধ

বাল্মীকি মহাকাব্য রচনা করে প্রথমে নামকরণ করেছিলেন পৌলস্ত্যবধ।

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ ॥ ৭

(১.৪.৭)

অর্থাৎ, রাম ও সীতার সকল চরিত-সম্বলিত পৌলস্ত্যবধ নামক এই কাব্য (লবকুশকে) শিখাইলেন।

উপরোক্ত শ্লোকটিতে সীতার চরিত একথা স্পষ্টভাবে বলা আছে, কিন্তু রাম শব্দের সঙ্গে অয়ন শব্দটি যুক্ত করায় রহস্য সৃষ্টি হয়েছে।

অয়ন অর্থ গমন, আশ্রয়, পথ, মার্গ, (জ্যোতিষে) সূর্যর গতি।

সূর্যবংশীয় রামকে সূর্য ধরা হলে বলা যায় 'রামায়ণ' শব্দে সূর্যর অয়নকে এই শ্লোকে নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির আলোচনায় প্রমাণ দেওয়া হবে বৈদিক পর্জন্যদেবের মত রামও মেঘবর্ষণ দেবতা।

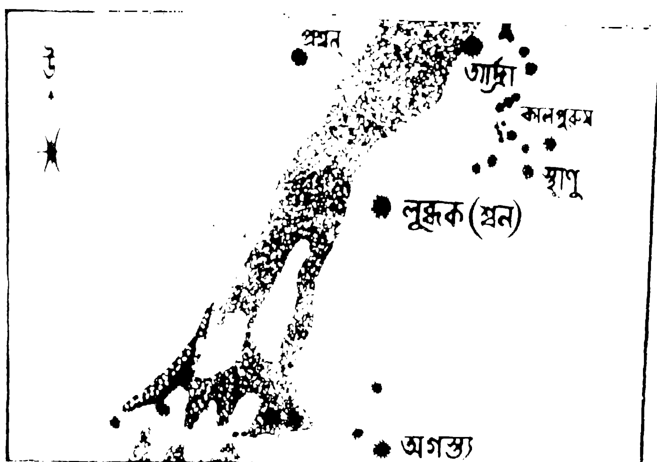
কয়েক শতাব্দীর ধ্যানধারণা অনুসরণে রামকাহিনী আমাদের চিন্তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে 'পৌলস্ত্য' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কেশ্বর রাবণের কথা স্মরণে আসে। কিন্তু অগস্ত্যরও একটি নাম পৌলস্ত্য। অগস্ত্যর পিতা পুলস্ত্য এবং মাতা কর্দমকন্যা হবির্ভূ।

রামায়ণে (৭.২) অবশ্য পুলস্ত্যর ঔরসে তৃণবিন্দুর কন্যার গর্ভে বিশ্রবার জন্মের উল্লেখ আছে। এ কাহিনীর বক্তা অগস্ত্য স্বয়ং।

অগস্ত্য একটি নক্ষত্র। কালপুরুষ নক্ষত্রের প্রায় ৪৫° (পঁয়তাল্লিশ) অংশ দক্ষিণে ও ১৫° (পনের) অংশ পূর্বদিকে এবং লুব্ধক নক্ষত্রর প্রায় ৩৬° (ছত্রিশ) অংশ দক্ষিণে ও অত্যল্প পশ্চিমে অগস্ত্য নক্ষত্রর অবস্থান। এই নক্ষত্রর পূর্বপার্শ্বে একটু দূরে ছায়াপথ তথা সুরগঙ্গা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছে।

"সিংহ রাশির ২৩° অংশে সূর্য্য থাকিলে যদি সূর্য্যের সহিত অগস্ত্যের

উদয় হয়, তাহা হইলে সিংহ হইতে বিলোমক্রমে সপ্তম রাশিতে (কুম্ভ রাশিতে) সূর্য্য অস্তগত হইবার সময় অগস্ত্যের উদয় হইবে। বস্তুতঃ সূর্য্য যদি শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অগস্ত্যের উদয় হইবে।"[১]



"অগস্ত্যের উদয়ে বর্ষাকালের আরম্ভ, বোধ করি, ইহা হইতেই অগস্ত্য কুম্ভসম্ভব হইয়াছেন। কৃত্তিকায় বিষুবন ধরিলেও অগস্ত্যের উদয়ের সহিত বর্ষারম্ভ বলিলে কোন দোষ হয় না।"[২]

খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে যখন বাসন্ত-বিষুব ছিল মৃগশিরা নক্ষত্রে, তখন দক্ষিণায়নাদি হত উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে। দক্ষিণায়নাদি হতে বর্ষাঋতু গণনা করা হয়।

সুতরাং অতি প্রাচীনকালে সূর্য ও অগস্ত্য নক্ষত্রর একত্রে উদয়কালের সঙ্গে বর্ষাগমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই ধারণা কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব অনুষ্ঠানের কালেও অটুট ছিল।

বর্ষা সমাগমের সঙ্গে অগস্ত্যর এই সম্পর্ক-সম্বন্ধীয়-ধারণা পরবর্তী আরও কিছুকাল মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করবে সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

রামায়ণের কালে দেখা গেল, বর্ষাঋতুর শেষ অধ্যায়ে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় হচ্ছে। সুতরাং এই নক্ষত্রর পূর্ব-ঐতিহ্য অবশ্যই নষ্ট হল।

বর্তমানকালে উত্তরায়ণে অর্থাৎ সূর্যর উত্তরদিকে পৃথিবীর অয়নের সময় গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অগস্ত্য নক্ষত্র দিনের আকাশে সূর্যালোকে অদৃশ্য থাকে। দক্ষিণায়নের নিশিথে শরতের দ্বিতীয়ার্ধে, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুতে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দক্ষিণ দিগন্তে দেখা যায়।

বাল্মীকি সূর্যর অয়ন তথা মেঘের গমনাগমনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিতব্য কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল একটি লোক-সংগীতকে উপজীব্য করে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। মহাকাব্য রচনাকালে বর্ষা সমাগমের সঙ্গে অগস্ত্য নক্ষত্রর সম্পর্কহীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার কারণে প্রথমে কাব্যটির নাম 'পৌলস্ত্যবধ' দিয়ে কাব্যের কৃষি-চরিত্রটি স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে কাব্যরচনা সমাপ্ত করে কাব্যর অন্তর্নিহিত মূল ঐতিহাসিক বক্তব্যর প্রতি রহস্যে ইংগিত দেওয়ার জন্য, মনে হয় বাল্মীকি মহাকাব্যর নূতন নামকরণ করেন—রামায়ণ।

রামায়ণ শব্দটিতে সূর্যর অয়ন তথা মেঘের গমনাগমন যেমন বুঝায়, তেমনি ব্যক্তি রামের কার্যাবলীকেও ইংগিত করে।

'পৌলস্ত্যবধ' শব্দে এই দ্বৈত ইংগিত সুস্পষ্ট ছিল না।

অগস্ত্য সম্পর্কিত পুরাণ কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে। অগস্ত্য বিন্ধ্য অতিক্রম করে দক্ষিণে গিয়ে আর ফেরেননি। কালক্রমে এই কাহিনীর বিন্ধ্য, ভারতবর্ষের মধ্যস্থলের পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত বিন্ধ্য পর্বতমালার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে। ফলে অনেকে মনে করেন অগস্ত্য নামক জনৈক আর্যঋষি দাক্ষিণাত্যে আর্যসংস্কৃতি প্রচারে গিয়ে আর ফেরেননি।

কিন্তু জ্যোতিষে বিন্ধ্য শব্দে বিষুব বুঝানো হয়।

বিন্ধ্য = বিধ্ (ভেদ করা) + য (কর্তৃ) নিপাতন সিদ্ধ। অর্থ, ব্যাধ। ভেদক বললেও ব্যকরণগত ভুল হয় না।

সুদূর অতীতে বাসন্ত-বিষুব হতে শারদ-বিষুব উত্তরায়ণ বা দেবযান এবং পরবর্তী অংশ দক্ষিণায়ন বা পিতৃযান হিসাবে গণ্য করা হত।

সুতরাং মৃগশিরা ও তৎ-পূর্ববর্তী নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব অনুষ্ঠান কালে সূর্যর উত্তরায়ণ তথা দেবযান কালে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় হত।

পরবর্তীকালে সূর্যর ক্রান্তিপথের দুই অয়নের গণনার পরিবর্তন ঘটে। তখন উত্তরকাষ্ঠা হতে দক্ষিণকাষ্ঠা পর্যন্ত সূর্যপথকে দক্ষিণায়ন এবং পরবর্তী অংশে উত্তরায়ণ ধরা হল।

ব বি./রামায়ণের উৎস/৬০-৪

দক্ষিণায়নাদি পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রর পূর্ববর্তী নক্ষত্রে এলে দক্ষিণায়নাদি অর্থাৎ বর্ষাঋতু গণনা শুরুর অনেক পরে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় হত।

নক্ষত্র স্থির, অয়ন ও বিষুব চলমান। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে চলে সেই দিকে অয়ন ও বিষুব এক নক্ষত্র হতে পরবর্তী নক্ষত্রে পশ্চাদ্‌গামী হয়।

সুতরাং সূর্যর দক্ষিণায়নাদির পরে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় হওয়ার কাহিনী তৈরী হল অগস্ত্যর দক্ষিণদিকে গমন। তখন বর্ষাঋতুর আগমন বার্তার ঘোষক হিসাবেও অগস্ত্যর প্রসিদ্ধি লুপ্ত হল। কিন্তু পূর্ব-সূত্র হারিয়েও অদ্যাবধি কুম্ভসম্ভব, ঘটোদ্‌ভব, কলশীভব ইত্যাদি নামে অগস্ত্য চিহ্নিত হয়ে আছে।

অনুরূপভাবেই দক্ষিণায়নাদির ইংগিত বহন করত বলে অগস্ত্যর আরেক নাম হয়েছিল মান।

মান অর্থ পরিমান। অয়ন নির্দেশক ছিল বলেই মান নামকরণ।

রাত্রির আকাশের অধিপতি বরুণ এবং দিবাভাগের অধিপতি মিত্র। দিবা ও রাত্রির সংযোগ অর্থাৎ সন্ধ্যা বা ঊষাকালে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয়, এই কারণে অগস্ত্যকে মিত্রাবরুণের সন্তান বলা হয়েছে। ছায়াপথের পশ্চিমে অগস্ত্য নক্ষত্রর অবস্থান। পুরাণে আছে ঊর্বশীকে দেখে মিত্র ও বরুণের রেতঃপাত হলে সেই রেতঃ কুম্ভে রক্ষা করা হলে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যর জন্ম। এই কাহিনীতে ঊর্বশী ছায়াপথ, বরুণ কুম্ভরাশিস্থ শতাভিষা নক্ষত্র। সূর্যর এক নাম মিত্র। সুতরাং সূর্য কুম্ভরাশিতে শতাভিষা নক্ষত্রে অস্তগত হলে বর্ষার পূর্বে ছায়া-



পথের পশ্চিম পার্শ্বে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় হত। এই নৈসর্গিক তথ্যের ভিত্তিতে অগস্ত্য নক্ষত্রর ঘটোদ্ভব ইত্যাদি নামকরণ ও জন্মকাহিনী।

অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় শতভিষা নক্ষত্র সংশ্লিষ্ট কারণে অগস্ত্যর এক নাম বারুণি হয়েছে।[৩]

বেদে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দিব্যনৌকা বলা হয়েছে।[৪] সমুদ্রচুলুক নামেও অগস্ত্যকে অভিহিত করা হয়েছে।[৫] চুলুক অর্থ গণ্ডুষ, কর্দম, গোত্র প্রবর্তক মুনি।

পুরাণে আছে অগস্ত্য দেবগণের অনুরোধে এক গণ্ডুষে সমুদ্র শোষণ করলে দেবগণ সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত কালকেয় নামক দৈত্যকুলকে বিনাশ করেন।

অগস্ত্য নক্ষত্রর পূর্বপার্শ্বে ছায়াপথ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। এই নৈসর্গিক অবস্থার রূপক কাহিনী অগস্ত্যর এক গণ্ডুষে সমুদ্র শোষণ। সমুদ্র শব্দে ছায়া-পথ বুঝায়। (পূর্বপৃষ্ঠার ছবি দ্রষ্টব্য)

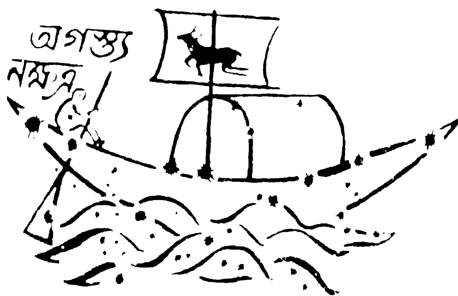
মনে হয় জহ্নুমুনির এক গণ্ডুষে গঙ্গা শোষণ কাহিনীটিও এই নৈসর্গিক ঘটনার আরেকটি রূপক।

সেক্ষেত্রে অগস্ত্য এবং জহ্নুমুনি একই।

অগস্ত্যর এই বিভিন্ন স্বরূপ সাধারণভাবে সূর্যক্রান্তি সংশ্লিষ্ট এই নক্ষত্রর উদয়ের সঙ্গে বর্ষাঋতুর বহুকালের সম্পর্কের তথ্য উদ্‌ঘাটিত করছে।

বাল্মীকির কালে বর্ষা তথা কৃষিকাজের সঙ্গে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

একারণে বাল্মীকি রচিত পৌলস্ত্যবধ তথা রামায়ণে কৃষিভিত্তিক তথ্যকে উপজীব্য করা হয়েছে একথা দাবী করা যায়।



চতুর্থ প্রকরণ

রাম জন্মকথা

রামজন্মর তিনটি স্তর আছে।

প্রথমতঃ ঋষ্যশৃংগ উপাখ্যান, দ্বিতীয়তঃ ঋষ্যশৃংগকে অঙ্গদেশে আনয়ন ও শান্তার সঙ্গে বিবাহ এবং তৃতীয়তঃ দশরথের পুত্রেষ্টী যজ্ঞে ঋষ্যশৃংগর পৌরোহিত্য এবং সেই যজ্ঞে দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণুর দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার। এই ত্রিস্তর কাহিনী পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করে মূল বক্তব্যে পৌঁছুতে হবে।

দশরথ অপুত্রক ছিলেন। পুত্র কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করার বাসনা করলে বশিষ্ঠ প্রমুখ এ বিষয়ে সম্মতি দিয়ে সরযু নদীর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর দশরথ সূত মুখে পুরাকাহিনী জানলেন। সত্যযুগে সনৎকুমার দশরথের পুত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে ঋষিগণের নিকট এই কথা বলেছিলেন।

কশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছে। তাঁর ঋষ্যশৃংগ নামে এক পুত্র হবে। সে বনে পিতার নিকট পালিত ও বর্ধিত হবে। ঋষ্যশৃংগ অনবরত পিতার সঙ্গে থেকে মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করবে, অন্য কিছু জানবে না। তার এই চরিত্র সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ হবে। এই ভাবে অগ্নি ও যশস্বী পিতাকে সেবা করে কাল অতিবাহিত করবে।

কশ্যপ অর্থে বিষ্ণু, অরুণ। অরুণ দ্বাদশাদিত্যের এক আদিত্য, মকর রাশির সূর্য। শ্রবণা নক্ষত্রর বৈদিক নাম বিষ্ণু। সুতরাং কশ্যপ শব্দে মকর রাশির শ্রবণা নক্ষত্র ধরতে হবে। এই নক্ষত্রর সামান্য দক্ষিণে ছায়াপথ ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং উত্তরদিকে ঐ ছায়াপথের পশ্চিমে কালপুরুষ নক্ষত্র।

বিভাণ্ডক—বিভা (দীপ্তি) সমন্বিত অণ্ডক (আশ্রয়, কোষ)। ছায়া-পথকে দীপ্তিময় অণ্ডক গণ্য করা হয়েছে।

• ঋষ্যশৃংগ—শৃংগে (শীর্ষে বা মাথায়) যে ঋষ্য (মৃগ অর্থে নক্ষত্র), অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্র।

বিভাণ্ডক শব্দে ছায়াপথ সংলগ্ন কালপুরুষ নক্ষত্র ধরে তার পুত্র ঋষ্যশৃংগকে মৃগশিরা নক্ষত্র বললেও ভুল হয় না।

খৃঃ পূঃ প্রায় চার হাজার বছর আগে মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব অনুষ্ঠিত হত।

"ঋগ্বেদের কালে শরৎ ঋতুর আরম্ভে সন্ধ্যার পর মৃগনক্ষত্রের উদয় হলে রুদ্রযজ্ঞ হত, সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ) পূর্ণিমায়। অথবা মৃগশিরা নক্ষত্রে চন্দ্র ও সূর্যর অবস্থান কালে বসন্ত ঋতুতে চান্দ্র-জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশীতে কলাচন্দ্র দর্শনের পরদিন যজ্ঞ হত।"

বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ দিয়েছেন বৈদিক কালে কালপুরুষ নক্ষত্রর দুই পদ ও কটি দেশের তারকাগুলি নিয়ে মৃগনক্ষত্র ধরা হত। পরবর্তীকালে শীর্ষদেশের তিনটি তারাকে মৃগশিরা নামে আখ্যাত করা হয়েছে। মৃগশিরা নক্ষত্র সম্পর্কে এই দ্বিবিধ চিন্তাধারা সুস্পষ্ট করার কারণে 'বিভাণ্ডক' শব্দে কালপুরুষ নক্ষত্র এবং 'ঋষ্যশৃংগ' শব্দে কালপুরুষ নক্ষত্রর শীর্ষদেশ ইংগিত করা হয়েছে।

ঋষ্যশৃংগ মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। অগ্নি ও পিতার সেবা করতেন।

পুরাকালে বৃষ রাশিতে মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থান কালে বসন্ত ঋতুতে এবং মৃগশিরা নক্ষত্রে চন্দ্রর অবস্থানে পূর্ণিমায় শরৎ ঋতুতে চান্দ্র-অগ্রহায়ণ মাসে মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। অগ্নি অর্থে যজ্ঞ। এই যজ্ঞের কারণে ঋষ্যশৃংগ অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্র বিশেষ লোকখ্যাত ছিল। কালপুরুষ নক্ষত্রর উত্তরে ছায়াপথে নিমজ্জিত একটি নক্ষত্রর নাম অগ্নি। মৃগশিরা নক্ষত্রর উদয় কালে ছায়াপথ ও অগ্নি নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। এজন্য বলা হয়েছে অগ্নি ও পিতার সেবা করতেন।

সুতরাং সনৎকুমার অতীত কালে মৃগশিরা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত বাসন্তবিষুব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

ঋষ্যশৃংগর এই খ্যাতির কালে অঙ্গদেশে রোমপাদ নামে একজন প্রতাপশালী মহাবল রাজা হবেন। সেই রাজার অধর্মবশতঃ সর্বলোক-ভয়াবহ সুদারুণ অতিঘোর অনাবৃষ্টি হবে। রাজা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কারণে ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ চাইলে তারা রাজাকে যে কোন উপায়ে বিভাণ্ডক-

পুত্র ঋষ্যশৃংগকে এনে সুসংকার করে শান্তা নাম্নী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। রাজা সেই মত ব্যবস্থা করার জন্য পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে নির্দেশ দিলে তারা বিভাণ্ডকের ভয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। সকলের পরামর্শমত শেষ পর্যন্ত স্থির হয় গণিকাগণের সাহায্যে ঋষ্যশৃংগকে অঙ্গদেশে আনা হবে। যথারীতি গণিকা নিয়োগ করা হল। বারমুখ্যা বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের নিকট অবস্থান করে ঋষ্যশৃংগের সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করবে। ঋষ্যশৃংগ আশ্রমের বেশী দূরে যেতেন না। সে কখনও স্ত্রী, পুরুষ কি নগর বা রাষ্ট্রজাত অন্যান্য কোন বস্তু দেখে নাই। পরে কোন এক সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে গিয়ে বরাঙ্গনাকে দেখতে পাবে। পরস্পরের পরিচয় বিনিময় হওয়ার পর সে ঋষ্যশৃংগকে উত্তম ফল প্রদান ও আলিঙ্গন করে বিভাণ্ডকের ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার অভিলাষ করবে। বিদায়কালে ব্রতানুষ্ঠানের সময় ঋষ্যশৃংগকে আমন্ত্রণ জানাবে। পরদিন ঋষ্যশৃংগ পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে যেখানে বারমুখ্যার সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেখানে গেলে তারা তাকে নিয়ে অঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হবে। ঋষ্যশৃংগর আগমনে সুবৃষ্টি হবে। রাজা তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে শান্তা নামে কন্যার সংগে বিবাহ দেবেন।

এই কাহিনীতে বিশেষ লক্ষণীয় ঋষ্যশৃংগকে অঙ্গদেশে আনয়নের জন্য গণিকা নিয়োগ। এই প্রসঙ্গে গণিকা, বরাঙ্গনা ও বারমুখ্যা তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলি অনুবাদের ক্ষেত্রে বেশ্যা হিসাবে ধরা হয়।

গণিকা—গণক + আপ্, গণনাকারিনী। গণক অর্থে যারা জ্যোতিষিক ব্যাপার নিরূপন করে।

বরাঙ্গনা—বরা (শ্রেষ্ঠা) + অঙ্গনা। অঙ্গনা অর্থ উত্তরদিগ্ হস্তিনী, কন্যা রাশি, অঙ্গনাসংজ্ঞক বৃষ কর্কট বৃশ্চিক মীন ও মকর রাশি। অঙ্গনা শব্দে প্রশস্তদেহী বুঝায়। সুতরাং বরাঙ্গনা শব্দে উত্তরদিকের প্রশস্তদেহী কর্কট রাশির অশ্লেষা নক্ষত্র ইংগিত গ্রহণ করা যায়। অশ্লেষা নক্ষত্র বৈদিক নাম সর্পবুদ্র। এই নক্ষত্র পুচ্ছ দক্ষিণে অনুরাধা নক্ষত্র পর্যন্ত প্রসারিত।

বৃষ রাশির শেষপাদে মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব হলে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শারদবিষুব হয়। অনুরূপভাবে কর্কট রাশির শেষ পাদে অশ্লেষা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হলে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব এবং বিশাখা নক্ষত্রে শারদবিষুব হয়।

বারমুখ্যা অর্থে বারের (জলের) মুখ্যা (প্রথমা, আদ্যা)। অর্থাৎ যে

নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদি তথা বর্ষার প্রথম মাসের শুরু। গণিকা, বরাঙ্গনা এবং বারমুখ্যা শব্দ তিনটি প্রয়োগ করে সাধারণ অর্থে বেশ্যার ইংগিত দেওয়া হলেও শব্দগুলির গূঢ় অর্থ প্রযুক্ত হয়েছে।

শব্দত্রয়ের অর্থভেদ করলে একথাই পরিষ্কার হয় যে অয়নচলন হেতু বাসন্তবিষুব পশ্চাদ্‌গামী হওয়ার দরুণ দক্ষিণায়ন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হতে অশ্লেষা নক্ষত্রে এসেছে। পণ্ডিতগণের মতে মৃগশিরা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব যথাক্রমে ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদের কালে অনুষ্ঠিত হত।

রোমপাদ এবং অঙ্গদেশ শব্দদুটিও রহস্যপূর্ণ।

অঙ্গ অর্থ অংশ। সূর্যর ক্রান্তিবৃত্ত বারোটি সমান অংশ বা রাশিতে বিভক্ত। সুতরাং অঙ্গদেশ শব্দে একটি বিশেষ রাশিকে বুঝানো হয়েছে যে রাশির অধিপতি রোমপাদ। রোমপাদ অর্থে পাদদেশে (পায়ে, লেজে) যার রোম (লোম) আছে। রাশিগুলির অন্তর্গত নক্ষত্রগুলির অবস্থান সাদৃশ্যে মেষ, বৃষ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রাশি নামগুলির একটি বৃশ্চিক। বৃশ্চিক বা বিছার পাদদেশে অর্থাৎ লেজে লোম আছে। সুতরাং অঙ্গদেশ অধিপতি রোমপাদ মূলতঃ বৃশ্চিক রাশি। এই রাশির অনুরাধা নক্ষত্রটি সাতটি তারায় বৃশ্চিক আকৃতি সদৃশ।

ঋষ্যশৃংগ অঙ্গদেশে আনীত হলে রোমপাদ তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে শান্তমনে শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন। অন্তঃপুর অর্থে পুরের মধ্যস্থ পুর, শুদ্ধান্ত। শান্ত অর্থ নিবৃত্ত, বিরত। শান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে শান্তা। অতএব ঋষ্যশৃংগ ও শান্তার বিবাহ বলতে জ্যোতির্বিদগণের গণনা অনুসারে নির্দিষ্ট নক্ষত্রে বিষুব স্থিরীকৃত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শান্তাকে দশরথ-কন্যাও বলা হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শান্তার মাতার উল্লেখ নাই। শান্তার সঙ্গে রোমপাদ এবং দশরথ উভয়ের পিতৃত্ব জড়িয়ে থাকায় মনে হয় বাসন্তবিষুব কৃত্তিকা নক্ষত্রে এবং শারদবিষুব বিশাখা নক্ষত্রে ছিল এই ইংগিত করা হয়েছে। কৃত্তিকা ও বিশাখা উভয় নক্ষত্রই যথাক্রমে মেষ ও বৃষ এবং বৃশ্চিক ও তুলা রাশিতে বিভক্ত।

অতএব ঋষ্যশৃংগর দ্বিতীয় কাহিনীর বিশ্লেষণ অনুসরণে বলা যায় যজুর্বেদ কালের কোনও এক সময়ে অয়নচলনের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনার সংশোধন করা হয়েছিল।

এবার তৃতীয় কাহিনী।

সূত সুমন্ত্র দশরথকে আরও জানালো যে সত্যযুগে সনৎকুমার বলেছিলেন যে ইক্ষাকুবংশে দশরথ নামে রাজা হবে। তার মহাভাগ্যবতী শান্তা নামে কন্যা হবে। অঙ্গরাজের সঙ্গে তার সখ্যতা থাকবে। অঙ্গরাজপুত্র রোমপাদ নামে বিখ্যাত হবে। দশরথ তার বংশবৃদ্ধির কারণে যজ্ঞর জন্য রোমপাদর নিকট শান্তা সহ ঋষ্যশৃংগকে প্রার্থনা করবে। রোমপাদ শান্তা ও ঋষ্যশৃংগকে প্রদান করবে। দশরথ ঋষ্যশৃংগর পৌরোহিত্যে যজ্ঞ করে চারটি পুত্র সন্তান লাভ করবে। সেইমত দশরথ শান্তা ও ঋষ্যশৃংগকে নিজ দেশে এনে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে যথাবিহিত পূজা করলেন। শান্তারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে সেখানে পরম সুখে থাকল।[২] অতঃপর বহুকাল অতীত হওয়ার পর একদা বসন্তকালে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অভিলাষ হল। ঋষ্যশৃংগকে বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ করতে নিয়োগ করলে ঋষি সরযু নদীর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণের আদেশ দিলেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে সূত মুখে সনৎকুমার বিবৃত পুরাকাহিনী শোনার আগেই দশরথ বসিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞর জন্য সরযুর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩] তখন দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠিয়ে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বসিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সমবেত করে তার অভিলাষ ব্যক্ত করলে সকলেই সম্মতিদান করলেন। পুনরায় বসন্তকালের আগমনে সংবৎসর পূর্ণ হল।

এবার দশরথ বসিষ্ঠর উপর যজ্ঞভার ন্যস্ত করলেন। বসিষ্ঠও সেই মত ব্যবস্থাদির নির্দেশ দিলেন। সকল আয়োজন সমাপ্ত হলে ঋষ্যশৃংগর সম্মতি নিয়ে দশরথ যজ্ঞস্থলের জন্য নির্গত হলেন। অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ ও অশ্ব প্রত্যাগত হলে সরযুনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞ আরম্ভ হল। যজ্ঞ সমাধা হলে দশরথ তার কুলবৃদ্ধির জন্য ঋষ্যশৃংগকে অনুরোধ করলেন। ঋষ্যশৃংগ কল্পসূত্রোক্ত বিধানানুসারে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ শুরু করলেন। সেই যজ্ঞে সমবেত দেবতাগণ লোককর্তা ব্রহ্মাকে রাবণের অত্যাচার হতে ত্রিলোককে রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। ব্রহ্মার বরে রাবণ দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য। বর প্রার্থনা কালে রাবণ মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মানুষ কেবল তাকে বধ করতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে বিষ্ণু সেখানে উপস্থিত হলে দেবতারা তাকে রাবণ বধের জন্য নিজের আত্মাকে চতুর্ধা করে রাজা দশরথের

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০০-৫

হ্রী, শ্রী ও কীর্তিসদৃশী তিন ভার্যাতে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। বিষ্ণু নারায়ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করে রাবণ বধে কৃতসংকল্প হলেন।

অনন্তর দশরথের পুত্রেষ্টী-যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড হতে মহান এক প্রাণী আবির্ভূত হয়ে দশরথকে যজ্ঞফল প্রদান করে বললেন,—এই দেবনির্মিত পায়স 'ভক্ষণ কর' বলে ভার্যাগণকে দিলে তারা গর্ভ ধারণ করবে। দশরথ সেই পায়সের অর্ধাংশ কৌসল্যাকে, বাকি অর্ধাংশর চার ভাগের এক ভাগ সুমিত্রাকে ও দুই ভাগ কৈকেয়ীকে দিয়ে অবশিষ্ট একভাগ পুনরায় সুমিত্রাকে দিলেন। দশরথের ভার্যাগণ সেই পায়স খেয়ে গর্ভধারণ করলেন।

ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতুনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥ ৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ ॥ ৯

*　　*　　*　　*　　*　　*

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ ॥ ১৫

১. ১৯. ৮-৯, ১৮

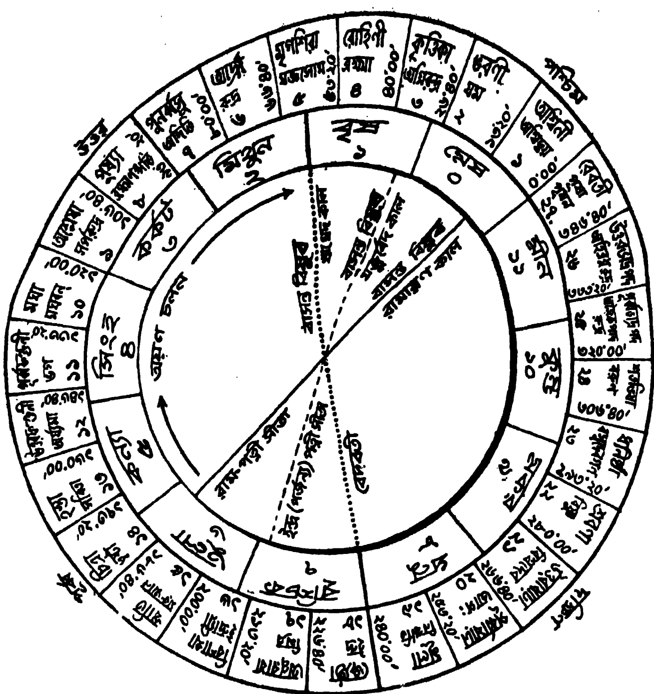
যজ্ঞ সমাপনের পর ষষ্ঠ ঋতুতে চৈত্রমাসে নবমী তিথিতে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, কর্কট লগ্নে কৌসল্যার পুত্র রাম জন্মগ্রহণ করল। রামের জন্মকালে পঞ্চগ্রহ স্বোচ্চস্থানে অর্থাৎ রবি মেঘ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে. বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিল। রাম বিষ্ণুর অর্ধাংশ। কৈকেয়ী ভরতকে প্রসব করলেন। ভরত বিষ্ণুর এক চতুর্থাংশ। সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্ম নিল। এরা উভয়ে বিষ্ণুর এক অষ্টমাংশ। ভরত মীন লগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রবি মেঘ রাশিতে কর্কট লগ্নে ও অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে।

এই কাহিনীতে অশ্বমেধ প্রসংগটি খুবই জটিল। কারণ দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করা মনস্থ করে প্রথমে বসিষ্ঠের অনুমতিক্রমে সরযুর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণের নির্দেশ দেন। তারপর সূতমুখে সনৎকুমার কথিত পুরাকাহিনী শুনে অঙ্গদেশ হতে শান্তা-ঋষ্যশৃংগকে আনার ব্যবস্থা করেন। ঋষ্যশৃংগর আসার পর অনেক কাল অতিবাহিত হওয়ার পরে পুনরায় ঋষ্যশৃংগর অনুমতি-

ক্রমে সরযুর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণের আয়োজন করা হয়। অপরদিকে বসন্তকালে সংবৎসর পূর্ণ হলে দশরথ বসিষ্ঠর উপর যজ্ঞভার অর্পন করলেন। এরপর একবছর পূর্ণ হলে ও অশ্ব প্রত্যাগত হলে যজ্ঞ আরম্ভ হল। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা হলে পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ হয়। পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ শেষ হওয়ার এক বৎসর পরে রাম প্রমুখর জন্ম। কালের ব্যবধানের এই জটিলতাকে আপাততঃ বাদ দিয়ে বলা যায় দশরথের ঋষ্যশৃংগকে নিজ দেশে আনয়ন অর্থে তুলা রাশিতে শারদবিষুব এবং মেঘ-রাশিতে বাসন্ত বিষুবর নির্দেশ। দশরথ অঙ্গদেশে রোমপাদর সংগে সাত-আট দিন বাস করার পর ঋষ্যশৃংগকে পায়। একথায় মনে হয় তুলা রাশিতে বিশাখা নক্ষত্রে ২১০° দুই শত দশ অংশে সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি গতে শারদ-বিষুব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সুদুর অতীতে। মনে হয় এই স্মৃতিই বর্তমান সন্ধিপূজায় রূপায়িত হচ্ছে।

বিশাখা নক্ষত্র হতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র অবধি যে জ্যোতিস্কপ্রবহ (Globular cluster) বিরাজমান, তাকে সরযু নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং সরযুর উত্তরতীর শব্দে এই জ্যোতিষ্ক প্রবহের উত্তরদিগস্থ বা বামদিগস্থ নক্ষত্রকে ইংগিত করা হয়েছে। কাহিনীতে বার বার বলা হয়েছে 'সরযবশ্চোত্তরে তীরে'।[8] সরযু শব্দের অর্থ বায়ু। স্বাতি নক্ষত্রর বৈদিক নাম মরুত্বান অর্থাৎ বায়ু। সুতরাং 'সরযবশ্চোত্তরে তীরে' শব্দে স্বাতি নক্ষত্রের উত্তরে অর্থাৎ পূর্ববর্তী চিত্রা নক্ষত্র বুঝানো যায়। শারদ বিষুব চিত্রা নক্ষত্রে উপনীত হওয়ার প্রাক্-মুহুর্তে দশরথের অশ্বমেধের তথা পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞের প্রস্তাবনা। বাসন্তবিষুব অশ্বিনী নক্ষত্রর শেষাংশে ১৩°-২০′ তেরো অংশ কুড়ি কলায় অনুষ্ঠিত হলে শারদ বিষুব হবে ১৯৩°-২০′ একশত তিরানব্বই অংশ কুড়ি কলায় স্বাতি নক্ষত্রে। এই অংশ হতে চিত্রা নক্ষত্রের শেষাংশে শারদ বিষুব আসতে যে সময় অতিবাহিত হয়েছিল তার নির্দেশনার জন্য ঋষ্যশৃংগর আগমণের পরও বহুকাল অতীত হওয়ার পরে পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাবনা ও সূচনা। সুতরাং দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন অর্থে শারদ বিষুব চিত্রা নক্ষত্রের শেষ অংশে এবং বাসন্তবিষুব অশ্বিনী নক্ষত্রের মধ্যস্থলে ৬°-৪০′ ছয় অংশ চল্লিশ কলায়।

এবার পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ন্যূনপক্ষে এক বছর পরে বসন্ত-কালে রামের জন্ম। রামের জন্মকালে সূর্য মেষ রাশিতে এবং চন্দ্র কর্কট রাশিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে। চন্দ্র এক তিথিতে প্রায় ১২° বারো অংশ অতিক্রম করে। সুতরাং পূর্ববর্তী অমাবস্যা হয়েছিল রেবতী নক্ষত্রে। নয় তিথিতে



সূর্য আন্দাজ আট অংশ অগ্রবর্তী হয়। ফলে রামের জন্মকালে সূর্যর অবস্থান ৬°-৪০′ ছয় অংশ চল্লিশ কলায় হওয়া স্বাভাবিক।

সম্পাতি কাহিনী বিশ্লেষণ করেও ঐ অংশে বাসন্ত-বিষুব স্থির হয়। সুতরাং রামের জন্মকালের সংগে বাসন্ত-বিষুব জড়িয়ে আছে। এজন্য ভবিষ্যতে আর কোন প্রসংগে ঋষ্যশৃংগর কথা রামায়ণে ব্যক্ত করা হয়নি।

এই কাহিনীর দশরথ সংবৎসর। সূর্যবংশীয় দশরথ সূর্যরই প্রতীক। সংবৎসর প্রাচীনকালে তিন ঋতুতে বিভক্ত ছিল ; গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হিম (শীত)। এই তিন ঋতু দশরথের তিন স্ত্রী যথাক্রমে কৌসল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। চৈত্র হতে আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু কৌসল্যা, শ্রাবণ হতে কার্তিক বর্ষাঋতু কৈকেয়ী এবং অগ্রহায়ণ হতে ফাল্গুন হিমঋতু সুমিত্রা। যেহেতু প্রাণ-জগতে বর্ষা শ্রেষ্ঠ ঋতু, সেকারণে রামায়ণে কৈকেয়ী দশরথের অতি আদরণীয়া, কিন্তু বাসন্ত-বিষুবতে মূল যজ্ঞ অনুষ্ঠিতব্য বিধায় এবং সম্ভবতঃ নববর্ষ গণনার বিধান হেতু কৌসল্যা প্রধানা মহিষী। সুসম বর্ষার কল্যাণে ফসলপ্রাপ্তি স্থিরীকৃত

এবং হিমঋতু সাধারণের পক্ষে কষ্টদায়ক কারণে সুমিত্রা প্রায় উপেক্ষিতা।

বিষ্ণুর মানবদেহ ধারণ প্রসংগে কৌসল্যাকে হ্রী, কৈকেয়ীকে শ্রী এবং সুমিত্রাকে কীর্তি বলা হয়েছে।

হ্রী অর্থ লজ্জা, ব্রীড়া। হ্রী তথা হ্রীং দুর্গাবাচক অম্বিকার বীজমন্ত্র। প্রাচীনকালে বাসন্তবিষুবতে রুদ্রযজ্ঞ হত। রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী (দুর্গা, অম্বিকা)। সুতরাং যে ঋতুতে রুদ্রযজ্ঞের যজ্ঞাগ্নীকে আরাধনা করা হয় সেই ঋতুকে হ্রী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুদুরতম বৈদিককালে মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব হত। সেই কালকে নিয়ে ঋষ্যশৃংগ কাহিনীর নির্দেশনা। পরবর্তীকালে বাসন্তবিষুব পিছিয়ে গিয়েছে রোহিনী, তারপর কৃত্তিকা নক্ষত্রে। পরিশেষে রামের জন্মকালে অশ্বিনী নক্ষত্রে।

কৌসল্যা,—কোসল + ষ্ণ অপত্যার্থে + আপ্। কোসল,—কু (পৃথিবী) —সল্ (গমন করা) + অন্ কর্তৃ। পৃথিবীতে গমনকারী। অতএব কৌসল্যা শব্দে গ্রীষ্মঋতুর প্রচণ্ড তাপকে রূপকে নির্দ্দেশ করা যায়, কারণ সূর্যতাপ পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রচণ্ড তাপে বায়ুমণ্ডলে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়ার দরুণই আগামীতে বর্ষার আগমণ।

শ্রী অর্থ লক্ষ্মী।

কৈকেয়ী,—কেকয় + ষ্ণ অপত্যার্থে + ঈপ্। কেকয়,—কে (মস্তক) ক (জল) য় (যুক্ত), অর্থাৎ মস্তকে জল সমন্বিত; বর্ষাঋতুর দোতক। বর্ষাঋতুতে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে। বৃষ্টির দরুন ধরিত্রী শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে। একারণে লক্ষ্মী, সম্পদদাত্রী।

বর্ষার কল্যাণে প্রাণ-জগতের শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং ঋতুর মধ্যে বর্ষা শ্রেষ্ঠ; সংবৎসরের আদরণীয় অংশ।

কীর্তি অর্থও লক্ষ্মী। যশঃ, খ্যাতি।

সুমিত্রা,—সু (উত্তম) মিত্র (বন্ধু, সূর্য) + আপ্। অর্থাৎ কার্যকরী সূর্যতাপ।

বৃশ্চিক রাশিস্থ আদিত্যের নাম মিত্র, অনুরাধা নক্ষত্রের বৈদিক নাম মিত্র। সুতরাং সুমিত্রার সঙ্গে হিম ঋতুর সম্পর্ক পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বর্ষাঋতুর প্রথমার্ধে সুসম বর্ষণ এবং হিম ঋতুর প্রথমার্ধে কার্যকরী সূর্যতাপ প্রচুর ফসল প্রাপ্তির অনুকুল। লক্ষ্মীর রূপান্তর ফসল সম্পদ। সুতরাং দশরথ ও তার তিন ভার্যার কোন মানবিক সত্বা থাক বা নাই থাক, অন্ততঃ রামের জন্ম

সংক্রান্ত কাহিনীতে এরা সংবৎসর ও তিন ঋতুর রূপক সত্তা।

দেবতাগণের অনুরোধে বিষ্ণু আপন আত্মা চতুর্ধা করে দশরথের চারিপুত্ররূপে মানবদেহ ধারণ করেছিলেন। দশরথের পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞে বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ করে এসেছিলেন। এর তাৎপর্য হল গরুড় অর্থাৎ শ্রবণা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ। শ্রবণার বৈদিক নাম বিষ্ণু। কর্কট রাশিস্থ সূর্য তথা শ্রাবণ মাসের সূর্যর নাম বিষ্ণু।

ক্ষিরোদসমুদ্র ছায়াপথ ; স্বর্গঙ্গাও বলা হয়। উত্তরায়ণকালে সূর্য থাকে মকরক্রান্তিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিভাগে। এসময় সূর্যর তাপে সমুদ্রের জল বাস্পে পরিণত হয়ে পুঞ্জীভূত মেঘের সৃষ্টি করে। বাসন্তবিষুবতে সূর্য এলে দক্ষিণ দিক হতে বাতাস বইতে শুরু হয়। সূর্য যতই দক্ষিণায়নাদির দিকে এগোয় এই বাতাসের গতি তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে সমুদ্রজাত পুঞ্জীভূত মেঘ টেনে আনে, বর্ষাঋতু শুরু হয়। অনুরূপভাবে শারদবিষুবতে সূর্য এলে বাতাসের গতি দক্ষিণমুখী হয়। সূর্যর গতির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গতিও বৃদ্ধি পায় যার টানে জলশূন্য মেঘ আবার সমুদ্রগামী হয়।

এই কাহিনীর বিষ্ণু উত্তরায়ণের সূর্য শুধু নয়, এই মেঘচক্রের প্রভিভূ। বিষ্ণুর অর্ধাংশে রাম, অর্থাৎ উত্তরায়ণ হতে দক্ষিণায়ন। এই সময়কালের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের উর্ধগগনে মেঘ সঞ্জাত হয়। বিষ্ণুর এক অষ্টমাংশে লক্ষ্মণ, অর্থাৎ দক্ষিণায়নাদি হতে দেড়মাস কাল। এই সময়ে বর্ষাকালে প্রচুর বারি-বর্ষণ হয়। লক্ষ্মণ অর্থ চিহ্ন। মেঘের স্বরূপ প্রকাশ পায় বারিবর্ষণে। যেখানে মেঘ, সেখানে বর্ষণ। এজন্য লক্ষ্মণ রামের ছায়াসঙ্গী।

পরের তিনমাস বিষ্ণুর এক চতুর্থাংশে ভরত।

ভরত,—ভৃ (ভরণ করা, ধারণ করা) ধাতু নিস্পন্ন শব্দটির অর্থ ধারণ-কারী। ভরত অর্থ ক্ষেত্র। দক্ষিণায়নাদিতে বর্ষাসমাগমে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ু মণ্ডল উভয় ক্ষেত্রে জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃষি-জমির জলধারণ ক্ষমতা-হেতু ফসলের শ্রীবৃদ্ধি। এই অবস্থার রূপক নাম ভরত।

বাকি দেড় মাস বিষ্ণুর এক অষ্টমাংশে শত্রুঘ্ন। শত্রুকে যিনি হনন করেন তিনি শত্রুঘ্ন। এই সময় বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা কমে যায় এবং ভূ-পৃষ্ঠের জলস্তর নিম্নগামী হয়। শস্যবীজ সুপুষ্ট হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কৃষিকাজের ফলশ্রুতি পাকা ফসল ঘরে ওঠে। সূর্য তখন ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্রের উপরিভাগে মকরক্রান্তিতে। সূর্যতেজে জল বাস্পে পরিণত হয় তখন, আগামী বৎসরের বর্ষাকে স্থিরীকৃত করতে। সূর্যর দক্ষিণায়নে বায়ুর

গতি পরিবর্তন হেতু মেঘও দক্ষিণগামী হয়। এই নৈসর্গিক ঘটনাকে রামায়ণে রামের বনবাসগমন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের জলধারণ ক্ষমতাহেতু চারাগাছের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি। একারণে রামায়ণে রামকে বনবাসে পাঠিয়ে ভরতের রাজ্যলাভের বিবরণ।

রামজন্ম সংক্রান্ত সকল কাহিনীর বিশ্লেষণ করে রামের মেঘদৈবত স্বরূপটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এছাড়া রামায়ণ কালের বাসন্তবিষুব স্থানটিরও নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

সম্পাতি কাহিনীতে যেমন, এই প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃংগ কাহিনীতে তেমনি একাধিক কালের বিষুব স্থানের বিবরণ রাখা হয়েছে। শব্দচয়নে ও স্বভাবসিদ্ধ রহস্যসৃষ্টির কারণে বহুঅর্থবহ স্বরূপটির সুযোগ নেওয়া হয়েছে।



পঞ্চম প্রকরণ

রাম নামের উৎস

রাম শব্দটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন যে বক্তব্য রেখেছেন সেই উদ্ধৃতি তুলে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

"ভাববাচক 'রাম' শব্দটি—ক্লীবলিঙ্গ 'রামন্' রূপে—প্রাচীন ইরাণ ঐতিহ্যে—আবেস্তার—শান্তি ও প্রসন্নতার দেবভাব অর্থে পাওয়া যায়। মনে হয় 'রাম' এই ব্যক্তি নামটি ইরাণী (বা তন্নিকটস্থ দেশীয়) সূত্রেই আমরা পেয়েছি। ব্যক্তি নাম হিসাবে 'রাম' প্রথম আমরা পাচ্ছি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—'রাম মার্গবেয়'। মার্গবেয় কথাটির কেউ অর্থ বা ব্যুৎপত্তি দেন নি। মনে হয় শব্দটি এসেছে 'মর্গু' এই স্থান-নাম থেকে। ইরাণের আকামেনীয় রাজাদের অধিকারে এই নামে একটি প্রদেশ ছিল এবং সে প্রদেশের রাজধানীরও এই নাম ছিল। আবেস্তায় নামটি পাই মোউরু (Mouru) রূপে। পরে নামটি দাঁড়ায় মের্ব (Merv) এস্থানে আরবেরা খোরাসানের রাজধানী করেছিল। …………সুতরাং মনে হয় ইরাণ ও আশপাশ থেকেই শান্তি ও প্রসন্নতার ভাবটি রাম নামকে ঘিরে জমাট বে'ধে এখনে এসেছিল।"[১]

"রাম নামটি দুদিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ১। রাত্রির মতো, মেঘের মতো রং যার, এমন পুরুষ। ২। শান্তি, বিশ্রাম। ………প্রথম অর্থে 'রাম' উদ্ভূত প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় 'রে' ধাতু থেকে, যার থেকে সংস্কৃতে এসেছে রামী, রাত্রী। দ্বিতীয় অর্থে রাম (রামন্) শব্দ এসেছে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় 'রেম' (সংস্কৃত রম্) ধাতু থেকে, অর্থ আরাম করা।"[২]

"রাম শব্দের এক অর্থ হল, কালো বড় পাখি, কাক (কাঠক-গৃহ্যম্ এ)।"[৩]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'রাম মার্গবেয়' শব্দের "মাগবেয় এই বংশ নামটি এসেছে 'মৃগবা' 'মার্গবা' (স্ত্রীলিঙ্গ) অথবা 'মৃগব' 'মার্গব' (পুং লিংগ) থেকে।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দুটির ব্যবহার মেলেনি, তবে পুংলিঙ্গ, দুটি শব্দের ব্যবহার পাওয়া গেছে। 'মৃগব' হল লক্ষের মতো এক নির্দিষ্ট বৃহৎ সংখ্যা (বৌদ্ধ সংস্কৃতে প্রাপ্ত), আর 'মার্গব' হল এক মিশ্রজাতির নাম ('নিষাদ' ও 'অয়োগব' জাতির মিশ্রণে ; মনুসংহিতা)।"[৪] অয়োগব হল শূদ্র হতে বৈশ্যায় জাত সন্তান বা সংকীর্ণ জাতি বিশেষ। (মনুসংহিতা ১০. ১২)। নিষাদ হল ব্রাহ্মণ হতে শূদ্র কন্যার জাত সন্তান বা জাতি বিশেষ। (মনুসংহিতা ১০. ৮)। মার্গব শব্দে কৈবর্ত জাতি বুঝায়। (মনুসংহিতা ১০. ৩৪)। এরা নৌকর্মজীবী।

'রাম'—কৃষ্ণ (ঋগ্বেদ ১০ ৩৩, সায়ণ)। রাম অর্থ প্রিয়।

এবার প্রচলিত আভিধানিক অর্থগুলির সংকলন করা যেতে পারে। (ক) রা শব্দে বিশ্ব এবং ম শব্দে ঈশ্বর ; রা এর (বিশ্বের) ম (ঈশ্বর), ষষ্ঠী তৎপুরুষ। (খ) ণিজন্ত রম্ বা রমি (রমণ করা বা রত করান) + ণ কর্তৃ ; যিনি রমার সঙ্গে রমণ করেন, বা যিনি কার্যে রত করান। (গ) রমায় ইনি এই অর্থে রমা (লক্ষ্মী) + ষ্ণ। (ঘ) রম্ (রত হওয়া) + ঘঞ্ আধ ; যাহাতে সকলে রত হয়। (ঙ) বরুণ, মৃগ বিশেষ। বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই রাম শব্দটি পুংলিঙ্গ ; রামঃ।

রাম শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হলে রামম্, অর্থ হয় বাস্তুকম্, কুষ্ঠম্, তমালপত্রম্। আর রামঃ শব্দটি ত্রিলিঙ্গ অর্থে মনোজ্ঞ, সিতঃ, অসিতঃ। আরবী ভাষায় একটি শব্দ আছে রামা (পুংলিঙ্গ) যার অর্থ নিক্ষেপকারী। কিন্তু সংস্কৃতে 'রামা', শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ : অর্থ উৎকৃষ্ট স্ত্রী, হিঙ্গু, নদী, গোরোচনা, গৈরিক, অশোক।

আবেস্তার 'রামাহুর' শান্তির দেবতা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'রামাসুর'। প্রথম ক্ষেত্রে দেবতা, অপর ক্ষেত্রে অসুর। ঋগ্বেদের রামাসুর পর্জন্যপত্নী সীতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিহীন। সুতরাং রামায়ণের রামের সঙ্গে এই রামাসুরের কোন সম্পর্কই টানা যায় না। রাম শব্দটি বিশেষণ হলে অর্থ হয় মনোহর, রমণীয়, শুভ্র, 'রমণস্থান'।

রাম শব্দটির যত রকমের অর্থ ও ইংগিত পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায়,— (১) শব্দটি অবৈদিক, (২) মিশ্রজাতির প্রতি ইংগিতবহ এবং (৩) মেঘ নির্দেশক।

রমায় (কৃষিশ্রী সীতা, লক্ষ্মী) ইনি, অর্থাৎ ফসল লাভের মূল উৎস মেঘবর্ষণ দেবতা।

যিনি রমার সঙ্গে রমণ করেন, অর্থাৎ কর্ষিত জমির সঙ্গে মেঘবর্ষণের সংযোগ।

ব. বি /রামায়ণের উৎস/৬০০-৬

ষিনি কার্যে রত করান, এই অর্থে মেঘের আগমনে বর্ষাঋতু মানুষকে ফসল উৎপাদনের কাজে লিপ্ত করে। এই ঋতুতে উদ্ভিদ্‌জগতের পুষ্টি সাধন হয়।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর মেঘের আবির্ভাব শান্তি বা আরাম প্রদান করে। রাত্রির মতো কালো রং মেঘের, কালো বড় পাখির মত মহাকাশে মেঘ আর্বিভূত হয়।

রাম অর্থে বরুণ অর্থাৎ জলদেবতা, মেঘের রূপান্তর মাত্র। রাম অর্থ সিত, অসিত। মেঘের দুটিই স্বরূপ। বর্ষার মেঘ অসিত আর শরতের মেঘ সিত। সুতরাং সকল অর্থেই রাম শব্দে মেঘ-দেবতাকে নির্দেশ করা যায়।

রামায়ণের রামের দেবত্বের বিস্তার বেদের কৃষিশ্রী লক্ষ্মীর ভর্তা মেঘ-দেবতাকে অবলম্বন করে। এইটি রামকথার মূল উৎস। এই প্রাথমিক রামকথা তথা মেঘ-দেবতার করুণা বর্ষণকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপে রামকাহিনী গড়ে উঠেছে দাবী করা যায়। এগুলির মধ্যে বাল্মীকি রচিত 'পৌলস্ত্য বধ' তথা 'রামায়ণ' শুধু প্রাচীনতম নয়, সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থিত,—যদিও এই মহাকাব্য রহস্যধর্মী।

রাম প্রসঙ্গে একটি বিশেষণ পাওয়া যায় 'মার্গবেয়'। মৃগব শব্দটি মৃগ শব্দ হতে উদ্ভূত হতে পারে। তুলনীয়,—মালব, মাল + ব অস্ত্যর্থে। অতএব মৃগব শব্দে মৃগ (মৃগশিরা) নক্ষত্র সংশ্লিষ্ট অর্থ হয়। সুতরাং মার্গবেয় শব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞান নির্ভরশীল কৃষিতত্ত্বের ইংগিত গ্রহণ করা যায়। মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হলে ঐ নক্ষত্রে পূর্ণিমায় অগ্রহায়ণ মাসে শারদ-বিষুব। প্রাচীনকালের বৃষ্টিনির্ভরশীল কৃষিকাজের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় দুই বিষুবর মধ্যবর্তী ছয়মাসকাল। সুতরাং মেঘদেবতাকে মার্গবেয় সম্বোধন করা অথবা রূপকে ঐ শব্দ ব্যবহার করা অসংগত নয়। মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব কালে অগস্ত্য তারার উদয় হত। সুতরাং অগস্ত্য তারার সঙ্গে মৃগশিরা নক্ষত্রর সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনা থাকে। অগস্ত্য তারার উদয় অনুসরণ করে যে গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হত, অর্থাৎ কৃষিজীবী এবং নৌকর্মজীবী তারা মার্গবেয় নামে পরিচিত হতে পারে। অগস্ত্য তারাকে দিব্যনৌকা বলা হয়েছে।[৫]

মার্গবেয় শব্দে নৌকর্মজীবী কৈবর্ত জাতিকে বুঝান যায়।

সুতরাং মার্গবেয় বিশেষণ ব্যবহার করে বাসন্ত-বিষুব সংক্রান্ত অর্থ ইংগিত করা হয়েছে। অতএব রামের সঙ্গে বাসন্ত-বিষুবর সম্পর্ক ছিল নিশ্চয়ই।

রামের বিশেষণ মার্গবেয় বৈদিক কালের স্মৃতি বহন করে আনছে। সেইকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানের সঙ্গে বর্ষা ঋতুর আগমনবার্তা এবং ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থানে চান্দ্রমাস অগ্রহায়ণের সঙ্গে বর্ষার অবদান ফসলের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। আর এই দু'য়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হল মেঘদেবতা রাম বা পর্জন্য বা ইন্দ্র। বৈদিক যুগ হতে কৃষিশ্রী জড়িয়ে রয়েছে ঋতুচক্রের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান নির্ভর করে।

রাম শব্দ অ-বৈদিক, আবেস্তার রামাহুর হতে আগত মেনে নেওয়ার যুক্তি আছে। শব্দটির নানা অর্থের সঙ্গে বলা যায় মূল সংস্কৃত শব্দ 'রামা'র (লক্ষ্মীর) পুংলিঙ্গে 'রাম' শব্দটি গ্রহণ করা যেতে পারে। ফলে সংস্কৃতের রাম এবং আবেস্তার রামাহুরের চরিত্রগত কোন পার্থক্য ঘটে না। পণ্ডিত-গণের মতে প্রথমে বেদ-পন্থী এবং আবেস্তা-পন্থীগণ এক ছিল। কালক্রমে দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় পরিণত হয়। উভয় পন্থীর বাসস্থানের ভৌগলিক অবস্থানও বিশেষ লক্ষণীয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে একদা যে বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল সেই ধারা পরবর্তীকালে পূর্বমুখী হয়ে হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশ ও গঙ্গার উত্তরে প্রসার লাভ করে। অপর দিকে বর্তমান ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আবেস্তাপন্থীগণ ধীরে ধীরে সরে গেল আরও পশ্চিমে ইরাণ, পারস্য, মিশর অঞ্চলে। এই দুই পন্থীদের গতি-প্রকৃতি এবং ভৌগলিক অবস্থান অনুসরণে প্রাচীন ভারতের প্রথম কৃষিভিত্তিক 'সিন্ধু' সভ্যতার উপর বেদের তুলনায় আবেস্তার বেশী প্রভাব ছিল মানতে হয়। 'সিন্ধু' সভ্যতার একটি ধারা দক্ষিণ ও মধ্যভারত তথা বিন্ধ্যপর্বতের পথ ধরে পূর্বগামী হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'সিন্ধু' সভ্যতার সমুদ্র-বাণিজ্য-পথে এই ধারা পূর্বভারতীয় অঞ্চলে প্রসারিত হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রাচীন ব্রাত্য-সভ্যতার ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলি একথার প্রমাণ দেয়, যার সঙ্গে 'সিন্ধু' সভ্যতার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে।

যেকালে সাগরগামিনী সরস্বতী শ্রেষ্ঠা নদী ছিল, সে ঋগ্বেদের কাল। আর সেই কালে বর্তমান ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম-ভাগ অবশ্যই উর্বর পার্লালিক ভূখণ্ড ছিল। সেখানে গড়ে উঠেছিল কৃষিভিত্তিক 'সিন্ধু' সভ্যতা।

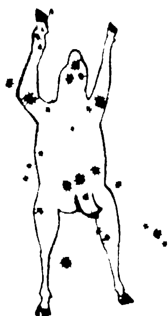
বৈদিক সভ্যতার উচ্চাবচ এলাকার আবহাওয়া, জীবনধারণ পদ্ধতি ও ধর্মচিন্তা সব কিছুই দক্ষিণের পার্লালিক ভূখণ্ড এলাকা হতে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমটিতে অরণ্য সম্পদ, পশুপালন ও শিকার ছিল মুখ্য। শীতের প্রকোপে অগ্নি প্রধান উপাস্য। ধর্ম ও জীবনধারা যজ্ঞ-কর্মে নিয়ন্ত্রিত। বর্ষাকাল অভিশাপ স্বরূপ। কিন্তু দক্ষিণে 'সিন্ধু' সভ্যতায় প্রধান উপজীব্য কৃষি, যা মেঘ-দেবতার করুণার উপর নির্ভরশীল। সুস্বাদু পানীয় জল এবং প্রচুর ফসলের আশা পূর্ণ হয় সুসম বর্ষণে। সুতরাং রাম তথা 'রামা' তাদের প্রধান উপাস্য হওয়া স্বাভাবিক। আরবী 'রামা' অর্থে নিক্ষেপকারী, মেঘ হতে করুণা স্বরূপ বারিধারা বর্ষণকারী। যেখানে নিম্নচাপ সেখানে মেঘ আর যেখানে মেঘ সেখানে বর্ষণ। তাই রাম ধনুর্ধারী : ধনু অর্থ চাপ।

রাম তথা রামার এই ভাবনা-চিন্তা সত্ত্বেও মাতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিতে ধরিত্রী প্রধানা। কারণ কর্ষণযোগ্য জমি বৃষ্টিকে ধারণ না করলে চাষ হয় না। কৃষি সম্পর্কে এই চিন্তাধারা বৈদিক চিন্তাধারার সমান্তরালে পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে একীভূত হয়েছে মনে হয়। তখন সরস্বতী নদী লুপ্তপ্রায়, গঙ্গা নদী প্রাধান্য পেয়েছে। উর্বরা জমিতে মানবসমাজ স্থিতিশীল হয়ে কৃষিনির্ভর জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। নতুন ধারায় সভ্যতার নবজন্ম ঘটেছে।

ঋগ্বেদের কালের মতো তখন মৃগশিরা বা রোহিণী নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব ছিল না, আরও পিছিয়ে কৃত্তিকার প্রথম পাদ বা ভরণীর শেষ পাদে পৌঁছেছে। তবু বেদ-পন্থীদের কর্মযজ্ঞে পুরাতন সূক্ত ধ্বনিত ; কিন্তু ব্রাত্যজনের কণ্ঠে মেঘ-বন্দনার লৌকিক গীতি ; রাম-বন্দনা। আরও পরে বাল্মীকি এই লোকগীতির সুর ও ছন্দের সংস্কার করে তাঁর 'পৌলস্ত্য বধ' গীতিকাব্যর বাহ্যিক কাঠামো রচনা করেন, যদিও রহস্যে মূল ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। ফলে বেদের সীতা অবৈদিক 'রামা' তথা রামের ভার্যা হল। মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হয় না, তাই মার্গব বিশেষণ বর্জিত হল। নতুন বিশেষণ রাঘব, দাশরথি, কাকুৎস্থ ইত্যাদি গৃহীত হল। এই শব্দগুলির অর্থও সূর্য সম্পর্কীয়।

বীণাতন্ত্রীলয়ে পাদবদ্ধ ছন্দে রাম এলেন, জয় করলেন, বন্দিত হলেন। সকল গুণের আধার রামের যতগুলি বিশেষণ নারদ-বাল্মীকি কথোপকথনে উল্লেখ করা হয়েছে, সবগুলিই মেঘদেবতার প্রতি প্রযোজ্য। সুতরাং রাম

নামের উৎস আদিম কৃষি-সভ্যতার মেঘদেবতা, যিনি আদিতে হয়ত রাম৷ নামে বন্দিত হতেন। কৃষি ভিত্তিক সভ্যতায় মেঘ শ্রেষ্ঠ দেবতা। অতএব কৃষিকাজের মধ্যে সুদূর অতীতের স্মৃতি বিজড়িত রাম নামের উদ্ভবের সন্ধান পাওয়া যায়।



মৃগশিরা

ষষ্ঠ প্রকরণ

সম্পাতি রহস্য

রামের সহায়তায় বালীকে বধ করে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হওয়ার পর বর্ষা নামে। শ্রাবণ হতে চার মাস অর্থাৎ কার্তিক মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। বর্ষা অন্তে সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের কোন উদ্যোগ না দেখে রাম দূত হিসাবে লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠায়। রামকে রুষ্ট জেনে সুগ্রীব অতঃপর বানর-সৈন্য সমাবেশ করে এক মাস মধ্যে সীতার অনুসন্ধান সেরে প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকারে চারটি দলকে চারিদিকে পাঠাল। অঙ্গদের নেতৃত্বে হনুমান প্রমুখ সীতা অন্বেষণে দক্ষিণদিকে গিয়েছিল। এরা নানা স্থান ঘুরে বিল মধ্যে পথ হারিয়ে পরিশেষে স্বয়ম্প্রভার অনুগ্রহে উদ্ধার পেয়ে বসন্তকালে যখন বিন্ধ্যাগিরিতে উপস্থিত হল তখন সুগ্রীবের নির্দিষ্ট সময়কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। কাল উত্তীর্ণ হওয়ায় সুগ্রীবেব ক্রোধের কথা চিন্তা করে এবং সীতার সন্ধানে ব্যর্থ হওয়ায় হনুমান প্রমুখ প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করার উদ্যোগ করলে তাদের সঙ্গে সম্পাতির সাক্ষাত ঘটে। তখন বসন্তকাল। সম্পাতি ও জটায়ু দুই ভাই। সম্পাতি জ্যেষ্ঠ ও জটায়ু কনিষ্ঠ। পুরাকালে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বিনষ্ট হলে সম্পাতি ও জটায়ু ইন্দ্র বিজয় অভিলাষে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে পরাস্ত করে। পরে আকাশ-পথে সূর্যের নিকট উপস্থিত হয়। তখন সূর্য মধ্যস্থান প্রাপ্ত হলে জটায়ু সূর্যতেজে অবসন্ন হওয়ায় সম্পাতি নিজ পক্ষদ্বয় দ্বারা ভ্রাতাকে আচ্ছাদন করে। ফলে পক্ষদগ্ধ হওয়ায় সম্পাতি বিন্ধ্যাগিরিতে পতিত হয়। ষষ্ঠরাত্রের পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে অবশেষে স্থানটি বিন্ধ্য বলে বুঝতে পারে।

এখানে মহাতপা নিশাকর ঋষির আশ্রম ছিল। এই বিন্ধ্যাগিরিতে সম্পাতিকে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আটহাজার বছর কাটাতে হয়। ইতিমধ্যে এক-দিন নিশাকরের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনায় সম্পাতি বিন্ধ্যাগিরির শিখরদেশ

হতে অবতরণ করে দর্ভসমন্বিত ধরাতলে ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হল। সেখানে বৃক্ষসকল পুষ্পিত এবং উৎকৃষ্ট ফল সমন্বিত হয়ে আছে, সুগন্ধি বায়ু বইছে।

সম্পাতি দেখল নিশাকর কৃতস্নান হয়ে উত্তরমুখে প্রত্যাগমন করছে। নিশাকর সম্পাতিকে দেখে হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রবেশ করে পুনরায় বেড়িয়ে এসে সম্পাতির দুরবস্থার কারণ জানতে চাইল। ঘটনা জেনে নিশাকর বলল সম্পাতির সুক্ষ্ম রোমরাজি এবং অন্য বৃহৎ পক্ষদ্বয় উদ্‌গত হবে এবং বল বিক্রম চক্ষু প্রাণ প্রভৃতি সকলই পুনঃপ্রাপ্ত হবে। তবে তার আগে তাকে একটি মহৎ কাজ করতে হবে। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পর সীতা অন্বেষণে রামের দূতগণ এখানে উপস্থিত হলে তাদের রাম-মহিষীর সংবাদ জানাতে হবে। সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন সম্পাতির দুরবস্থার আট হাজার বছর পূর্ণ হয়েছিল। সীতার সন্ধান জানানোর পর সম্পাতির পক্ষোদগম হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাতের বহু পূর্বেই হনুমানরা জানত যে রাবণ জনস্থান হতে সীতাকে হরণ করে লংকায় নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সম্পাতি কাহিনীতে নতুন কোন তথ্যের অবতারণা করা হয়নি। অথচ উদ্দেশ্যহীন ভাবেও নিশ্চয়ই এই কাহিনী বিবৃত হয়নি। এই কাহিনীতে সম্পাতি, জটায়ু ও নিশাকর নামকরণ, বিন্ধ্যাগিরি ও জনস্থান, ছয় রাত্রি পরে সংজ্ঞালাভ এবং আট হাজার বছর সময়কাল খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

বিল হতে হনুমানরা নিষ্ক্রান্ত হয়ে যখন প্রায়োপবেশনে বসেছিল তখন বসন্তকাল। রামায়ণের কালে চৈত্র ও বৈশাখ মাস বসন্তঋতু। সম্পাতি যখন বিন্ধ্যাগিরির সমতলে নিশাকরের আশ্রমে উপনীত হয় তখনও বসন্তকাল। আশ্রমের পুষ্প ও ফলসম্ভার তার প্রমাণ দেয়।

এই কাহিনীর বিল অর্থ রেবতী নক্ষত্র সন্নিহিত নিহারিকা। রেবতী নক্ষত্রকে স্বয়প্রভা বলা হয়েছে। কারণ এই নক্ষত্রের বত্রিশটি তারা ছায়াপথে আচ্ছন্ন থাকায় সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এজন্য রেবতী নক্ষত্রটিকে রূপকে স্বয়ম্প্রভা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সম্পাতি,—সম্পাত + ইন্‌ (ইনি)-১ ব, সম্পাতবান। সম্পাত অর্থ

পরস্পর ছেদ বিন্দু। সূর্য ও পৃথিবীর কক্ষপথ যে দুই বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে তাকে সম্পাত বা বিষুব বলে। সুতরাং সম্পাতি শব্দে বিষুব স্থান ইংগিত করছে। বিষুব দুটি, বাসন্ত ও শারদ। যেহেতু কাহিনীতে বসন্ত-কালের উল্লেখ আছে, সেকারণে সম্পাতি বাসন্ত বিষুবর প্রতীক।

শব্দটির আরও একটি অর্থ হয়। সম্পাতি,—সম্পা (বিদ্যুৎ)—অত্ (গমন করা) + ই কর্তৃ। অর্থ হয় যাতে বিদ্যুৎ তথা অগ্নি বিদ্যমান। অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ। এই বৃক্ষের কাঠে একদা অরণি হত, অতএব এই কাঠের অগ্নি উৎপাদন ক্ষমতা আছে। বসন্ত ঋতুতে অশ্বত্থ বৃক্ষ পত্রশূন্য হয় এবং গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথমে নতুন পত্রোদগম হয়। অশ্বত্থ শব্দে অশ্বিনী নক্ষত্র ইংগিত করা হয়। সুতরাং সম্পাতি শব্দে বাসন্ত-বিষুব বুঝানো হয়েছে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিষুবকে বিন্ধ্য বলা হয়।

জটায়ু অর্থ যার আয়ু জট (সংযত, প্রচুর)। জট অর্থ বট (ন্যাগ্রোধ) বৃক্ষের শাখা-শিকড়। সম্পাতি তথা অশ্বত্থ বৃক্ষের সমকক্ষ জটায়ু অর্থাৎ বট বৃক্ষ। এই বৃক্ষ দীর্ঘজীবি, শাখা-শিকড় সমন্বিত। অশ্বত্থের মত এর পাতা ঝরে না।

নক্ষত্র জগতে শ্রবণা নক্ষত্রর আকৃতি পক্ষীসদৃশ। এই নক্ষত্রকে অবলম্বন করে পুরাণে গরুড়ের কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। মকররাশির আদিত্যর নাম অরুণ। জটায়ু, সম্পাতি, অরুণ এরা গরুড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একারণে জটায়ুকে শ্রবণা নক্ষত্রর রূপক ধরা যায়। সুদুর অতীতে শ্রবণা নক্ষত্রে শারদ-বিষুব এবং পরবর্তীকালে উত্তরায়ণ হত।

নিশাকর অর্থ চন্দ্র। কিন্তু নিশা শব্দের এক অর্থ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনুঃ ও মকর রাশিসমূহ। কর অর্থ হস্ত-প্রান্ত। সুতরাং নিশাকর শব্দে কর্কট ও মেষরাশির প্রান্তদ্বয় ইংগিত করছে। অতএব নিশাকরের প্রথম আশ্রম বিন্ধ্যগিরিতে শব্দে বলতে কর্কটরাশির অশ্লেষা নক্ষত্রর শেষপাদ ১২০° (এক শত কুড়ি) অংশে বাসন্ত-বিষুব। নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রর বৈদিক নাম ইন্দ্র এবং রাশিচক্রের ২৪০° (দুই শত চল্লিশ) অংশকে বলা হয় বৃত্র-স্থান। ইন্দ্রর বৃত্র হণন অর্থে বাসন্ত-বিষুব জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ২৪০° (দুই শত চল্লিশ অংশে)। সম্পাতি ইন্দ্রকে পরাজিত করে, অর্থাৎ বাসন্ত-বিষুব জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র অতিক্রম করে অনুরাধা নক্ষত্রে ২২৬°-৪০′ (দুই শত ছাব্বিশ অংশ চল্লিশ কলায়) অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এবার সম্পাতি সূর্যর প্রতি ধাবিত। সূর্য মধ্যগগনে এলে পক্ষদগ্ধ হয়ে

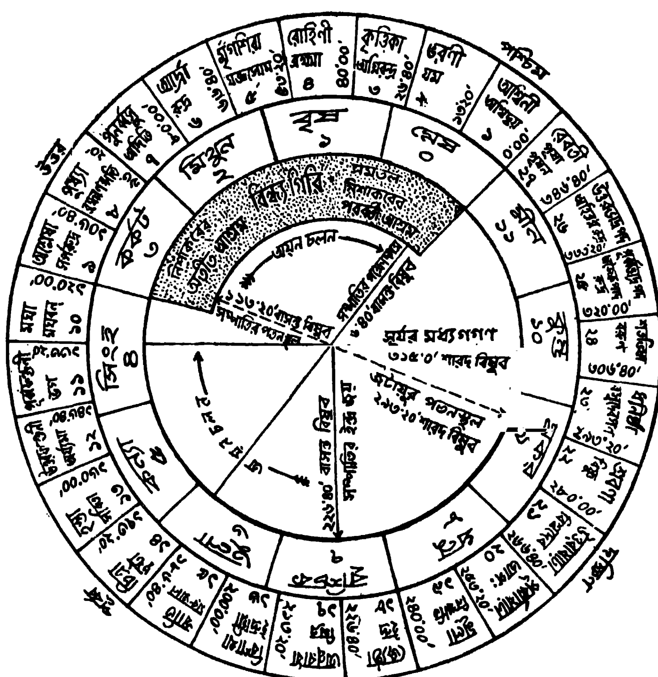
ব. বি /রামায়ণের উৎস/৬০০-৭

সম্পাতির বিন্ধ্যগিরিতে পতন।

কুম্ভরাশিস্থ আদিত্যের নাম সূর্য। মধ্যগগন অর্থে কুম্ভ রাশির মধ্যভাগ, ৩১৫° (তিনশত পনের অংশ)। অর্থাৎ এই অংশে যখন শারদ-বিষুব, তখন বাসন্ত-বিষুব হবে ১৩৫° (একশত পঁয়ত্রিশ অংশে) পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে।

জটায়ুর পতন হয়েছিল জনস্থানে, অর্থাৎ শারদ-বিষুব পিছিয়ে এল শ্রবণা নক্ষত্রে ২৯৩°-২০′ (দুইশত তিরানব্বই অংশ কুড়ি কলায়)। তাহলে বাসন্ত-বিষুব কর্কট রাশিতে অশ্লেষা নক্ষত্রে ১১৩°-২০′ (একশত তেরো অংশ কুড়ি কলায়)।

কাহিনীতে রাশিচক্রের এই অংশকে নিশাকরের অতীত-আশ্রম বিন্ধ্য-গিরি বলা হয়েছে। এখানে নিশাকরের সঙ্গে সম্পাতির সাক্ষাৎ হয়নি। 'অতীতের আশ্রম' বলে এই স্থানে একদা বাসন্ত-বিষুব হত তার ইংগিত দেওয়া



হয়েছে। সম্পাতি বিন্ধ্যগিরির শিখর হতে সমতলে নেমে বসন্তকালে নিশাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দুঃখের কথা বলেছিল। কাহিনীর স্বরূপ-বদল কারণে অশ্লেষা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব ইংগিত করার জন্য বিন্ধ্যগিরির শিখর বলা হয়েছে এবং কালের ব্যবধানের ইংগিত রেখে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব সময়ে পৌঁছানো হয়েছে। সম্পাতির দুরাবস্থার আট হাজার বছর যেদিন পূর্ণ হয়, সেদিন হনুমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অথর্ব-সংহিতা মতে অয়ন ১ বৎসরে ৪৮" (৪৮ বিকলা) পশ্চাদ্‌গামী হয়। তাহলে ৮০০০ বছরে অয়ন রাশিচক্রের ১১৩°-২০' (১১৩ অংশ ২০ কলা) হতে ১০৬°-৪০' (১০৬ অংশ ৪০ কলা) পশ্চাদ্‌গামী হয়ে অশ্বিনী নক্ষত্রে ৬°-৪০' (৬ অংশ ৪০ কলায়) বাসন্ত-বিষুব অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্পাতি যখন হনুমানদের সীতার সন্ধান দিয়েছিল। সে সময় ৯৬°-৪০' (৯৬ অংশ ৪০ কলায়) পুষ্যা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন, ১৮৬°-৪০' (১৮৬ অংশ ৪০ কলায়) চিত্রা নক্ষত্রে শারদ-বিষুব এবং ২৭৬°-৪০' (২৭৬ অংশ ৪০ কলায়) উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হত। সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হয়ে পতিত হওয়ার ছয় রাত্রি পরে সংজ্ঞা লাভ করে। এই কথার তাৎপর্য অশ্লেষা নক্ষত্রের ১১৩°-২০' (১১৩ অংশ ২০ কলায়) বাসন্ত-বিষুব কালে পূর্ণিমান্ত বা অমান্ত মাস ধরে বলা যায় সংজ্ঞা লাভের দিন নবমী তিথি ছিল। এই নবমী তিথির ইংগিত দেওয়ার উদ্দেশ্য মনে হয় অশ্বিনী নক্ষত্রের ৬°-৪০' (৬ অংশ ৪০ কলায়) বাসন্ত-বিষুব ও একদা নবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেখা যায় রামের জন্ম শুক্লা নবমী তিথিতে।

অতএব, সম্পাতি কাহিনী রামায়ণ কালের বিষুব স্থানের নির্দেশ করছে।



সপ্তম প্রকরণ

কৃষিশ্রী সীতা

বাল্মীকি 'পৌলস্ত বধ' তথা 'রামায়ণ' রচনা শেষ করে বেদবিশারদ ও গন্ধর্ব-সংগীতাভিজ্ঞ লবকুশকে শিক্ষাদান কালে বলেছেন,—

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রত ॥ ৭

(১. ৪. ৭)

অর্থাৎ 'পৌলস্ত্য বধ' কাব্যে রামের অয়নসহ সীতার মহৎ চরিত্র বিবৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে সীতার পরিচয় বসুন্ধরা তথা সীরখাত অর্থাৎ হলরেখ।

"ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের সাতান্ন সূক্তের ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋকে আছে,—

অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা
যথা নঃ সুভগামসি যথা নঃ সুফলামসি।

(ষষ্ঠ ঋক্)

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষা অনু যচ্ছতু
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম।

(সপ্তম ঋক্)

অর্থাৎ হে তরুণী সীতে! সুভগে হও তোমাকে বন্দনা করি যেন আমাদের সুভোগে এস যেন আমাদের সুফলে এস। ইন্দ্র কর্তৃক গৃহীত সীতার নিখিল, তাকে পূষা অনুসরণ করে যাচ্ছেন, সে আমাদের পয়স্বতী উত্তরোত্তরকালে সমান দোহনীয়।"[১] ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একশো পঁচিশসূক্তে দ্বিতীয় ঋকে অদিতি নক্ষত্র সম্পর্কে উল্লেখ আছে "আমি সোমের আহন্ সংযুক্ত তিথি, আমি ধারণ করি ত্বষ্টা নক্ষত্রকে পূষণ নক্ষত্রকে এবং ভগ নক্ষত্রকে। আমি দাত্রী হবির্বাহী দ্যুতিদ্রব্যের আমাকে সুপ্রাপ্ত যাযাবর জ্যোতিষ্কেরা সুআশ্রিত।" "ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে : একদা যজ্ঞহীন দেবতারা

অদিতিকে বললেন, তুমি যজ্ঞ বলে দাও। অদিতি বললেন, তথাস্তু, যজ্ঞের আবর্তন আমার শীর্ষদ্বয়ে আরম্ভ ও শেষ হোক।' এ আখ্যানের জ্যোতিষীক অর্থ একদা সায়ন বৎসরের আরম্ভ ও শেষ দ্যুতিদ্বয়াত্মক অদিতি বা পুনর্বসু নক্ষত্রে হোত।"[২] যজ্ঞ অর্থ বর্ষ। ঋগ্বেদে যজ্ঞ অর্থ কর্ম বা জীবনবহনোপায়।

উপরোক্ত বক্তব্য অনুসরণে সহজেই বলা যায় পণ্ডিতগণের হিসাব মত আনুমানিক খৃঃ পূঃ ছয় হাজার বছর আগে পুনর্বসু নক্ষত্রে অমাবস্যা তিথিতে পুরাতন বৎসরের শেষ হত এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী শুক্লা প্রতিপদ হতে নতুন বৎসরের গণনা প্রচলিত ছিল। ঐ দিন যজ্ঞকর্মও অনুষ্ঠিত হত।

যদি মিথুন রাশিতে (অদিতি) পুনর্বসু নক্ষত্র মধ্যভাগে বাসন্ত-বিষুব হয়, তাহলে (ত্বষ্টা) চিত্রা নক্ষত্র দ্বিতীয় পাদে দক্ষিণায়ন, (আপঃ) পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র শেষপাদে শারদ-বিষুব এবং (পূষণ) রেবতী নক্ষত্র শেষপাদে উত্তরায়ণ অনুষ্ঠিত হবে।

ঋগ্বেদের উক্ত ঋকের 'ভগম্' শব্দটিকে ভগ অর্থাৎ পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র না ধরে আপঃ অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র ইংগিত গ্রহণ করলে তৎকালীন অয়ন ও বিষুবস্থান সুস্পষ্ট হয়। ভগ অর্থ যোনি এবং যোনি অর্থ জল। জল অর্থাৎ আপঃ (পূর্বাষাঢ়া) নক্ষত্র সম্পর্কে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তে ষোড়শ ঋকে উল্লেখ আছে "হে মাতৃস্নেহধারা মধুসঞ্চারিণী জল, তুমি অধ্বর্যুদের যজ্ঞাভিমুখে জয়দাত্রীরূপে প্রবাহিত হয়েছ।"[৩] মিথুন ও ধনু উভয় রাশির নক্ষত্রগুলি ছায়াপথে নিমজ্জমান। অতএব ভগ নক্ষত্র বলতে এক্ষেত্রে আপঃ নক্ষত্র ইংগিত গ্রহণ করা অসংগত হয় না।

অদিতি অর্থে পুনর্বসু নক্ষত্র ; অন্য অর্থ অবিচ্ছিন্ন, ভূমি, পৃথিবী। বিষুবকালে দিন ও রাত্রি সমান হয়। ঐ নক্ষত্রে বৎসরের শেষ ও শুরু। এত কিছুর সমন্বয়ে ঋগ্বেদে অদিতি নক্ষত্রকে উপলক্ষ করে মূলতঃ পৃথিবীর মূর্তিময়ী স্বরূপ সীতার বন্দনাই করা হয়েছে। সীতার এই প্রথম আবির্ভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

শিকার, বনজসম্পদ আহরণ, আয়াসসাধ্য কৃষিকাজ এবং পশুপালন যাদের মুখ্য জীবিকা তাদের কাছে বসন্ত ঋতু শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় গম যব ইত্যাদি রবিফসল ঘরে ওঠে। লক্ষণীয় যে একদা বৈদিক-যজ্ঞে যবচূর্ণের পিষ্ঠকের প্রচলন ছিল। এই পিষ্ঠকের নাম পুরোডাশ। সুতরাং বাসন্ত-বিষুবতে সীতার ভূয়সী স্তুতিতে তৎকালীন মানব সমাজের জীবিকার আভাষ পাওয়া যায়।

সীতা ঋগ্বেদে ধরিত্রীর মূর্তিময়ী সত্ত্বা, শুক্লযজুর্বেদে লাঙ্গলপদ্ধতি, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে সাবিত্রী, পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ইন্দ্রপত্নী এবং রামায়ণে রামপত্নী। অথর্ববেদের কৌশিকসূত্রে (১৪৭) সীতাকে বলা হয়েছে 'পর্জন্যপত্নী হরিণী'। পর্জন্য মেঘাধিপতি ইন্দ্র। শব্দটির অর্থ শব্দায়মান মেঘ, গর্জন্মেঘ, মেঘশব্দ, মেঘ। হরিণী "শব্দটি 'মৃগী' অর্থে পাই অর্বাচীন বৈদিকে। শব্দটির মূল পুংলিঙ্গরূপ 'হরিৎ' ঋগ্বেদে স্ত্রীলিঙ্গরূপেও ব্যবহৃত ছিল বিশেষণ হিসাবে (ঘোড়ার রং)। প্রজাপতির গল্পের 'রোহিৎ' এই হরিণীর সঙ্গে তুলনীয়।"[৪] রোহিৎ এবং লোহিত শব্দদ্বয় সমার্থক। রোহিণী নক্ষত্র লোহিতবর্ণ, হরিৎবর্ণও বলা যায়। সুতরাং কৌশিকসূত্রে সীতাকে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে সীতার স্তুতিকাল বাসন্ত-বিষুবতে। বেদে ইন্দ্রর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। ইন্দ্র দ্বাদশাদিত্যের এক আদিত্য। 'আদিত্য' শব্দটি পুংলিঙ্গ ও দ্বিবচনান্ত হলে অর্থ হয় অদিতিদেবতার পুনর্বসু নক্ষত্র। সুতরাং ঋগ্বেদে সীতার সঙ্গে ইন্দ্রর উল্লেখ করে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব নির্দেশ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে সূর্যর অয়নচলনহেতু বাসন্ত-বিষুব পশ্চিমদিকের নক্ষত্রগুলিতে সরে এলে এবং কালক্রমে দ্বাদশ রাশি সংশ্লিষ্ট দ্বাদশ মাসের সূর্যকে দ্বাদশ আদিত্যে বিভাগ ও নামকরণ করা হলে পূর্বসূত্র অনুসারে মনে হয়, বাসন্ত-বিষুব কালের সূর্যকে ইন্দ্র নামেই আখ্যাত করা হয়। এজন্যই হয়ত বৃষরাশিতে জ্যৈষ্ঠমাসে বাসন্ত-বিষুব অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে এই মাসের সূর্যকে 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে কারণে যে নক্ষত্র বা যে মাসের শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন মানুষের ধ্যানে ছিল সেই নক্ষত্র ও মাসের সঙ্গে 'ইন্দ্র' নামটি যুক্ত করে নিয়েছিল। "লোকমান্য তিলক প্রমাণ দিয়েছেন খ্রীষ্টের অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব হত। সেকালে চান্দ্র-অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যর জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থান কালে শারদবিষুব হতে বৎসর গণনার রীতি ছিল।"[৫]

এখানে লক্ষণীয় যে এই সময় শারদ-বিষুব অর্থাৎ শরৎকাল প্রাধান্য লাভ করেছে। বর্ষার পর শরৎ ঋতুতে কৃষিকর্মের ফলাফল স্পষ্ট হয়। অতীতের সীতার ধ্যানধারণার সঙ্গে এবার কৃষিকাজ জড়িয়ে গিয়েছে। হয়ত ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার কারণে এবং নভঃমণ্ডলের বৃহত্তম নক্ষত্র জ্যেষ্ঠার গুরুত্ব মেনে নিয়ে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রেরও নামকরণ হয়েছিল ইন্দ্র।

খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদের কালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হত। এই কালে সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গলপদ্ধতি নির্ধারণ করে সীতার স্বরূপকে

স্থিরনিশ্চয় করা হয়।

সীতাকে ইন্দ্রপত্নী এবং পর্জন্যপত্নী আখ্যা দিয়ে সীতার সঙ্গে মেঘবর্ষণ দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করে প্রথমে ইন্দ্র এবং পরে পর্জন্য নাম ব্যবহার করে ইন্দ্রর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রর স্বরূপ প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও সীতার চারিত্রিক ব্যাপ্তি সংকুচিত করা হয়েছে। যে সীতার উদ্ভব হয়েছিল পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুবতে বর্ষশেষ ও বর্ষ আরম্ভ উভয়ের সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর সর্ব-জীবধাত্রী স্বরূপ হিসাবে, সেই সীতা কয়েক হাজার বছর পরে কৃষি-ভিত্তিক সমাজ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীরখাতে সীমিত হয়ে মেঘবর্ষণ-দেবতার পত্নীরূপে বন্দিতা হয়েছে। রামায়ণের কালে বসুন্ধরার কন্যা হিসাবে আমরা তাঁকে পেয়েছি। এখানে সীতা জনকের পালিত-কন্যা ও রামের পত্নী। এই সীতাকে কেন্দ্র করে বাল্মীকির 'রামায়ণ' কাব্য।

রামের ক্ষেত্রে যেমন জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্র সমাবেশ বিবৃত হয়েছে, সীতার ক্ষেত্রে কোন সময়েই তার বিশদ উল্লেখ নাই। কিন্তু সীতার জন্ম-কাহিনী অনুসারে সীতাকে হলরেখ হিসাবে সহজেই চেনা যায়।

রাম ও লক্ষ্মণের সাহায্য নিয়ে বিশ্বামিত্র 'সিদ্ধাশ্রম' আশ্রমে সিদ্ধিলাভ করার পর দুই ভাইকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে না গিয়ে উত্তরে মিথিলায় জনকের যজ্ঞে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছুলে জনক বিশ্বামিত্রকে স্বাগত জানিয়ে বললেন যে তার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হতে আর মাত্র দ্বাদশদিন বাকি। তারপর জনকের পুরোহিত শতানন্দ বিশ্বামিত্রর অতীত ইতিহাস সকলকে অবগত করলেন। পরদিন প্রভাতে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটলে বাল্মীকি জনককে অনুরোধ করলেন রাম ও লক্ষ্মণকে তার নিকট রক্ষিত ধনুটি দেখাতে। তখন জনক ধনুর ইতিহাস বর্ণনা করলেন। অতীতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর মহাদেব যজ্ঞভাগ হতে তাকে বঞ্চিত করার কারণে এই ধনুর দ্বারা দেবতাগণের শিরচ্ছেদ করার ভীতিপ্রদর্শন করায় দেবতাগণ মহাদেবকে স্তবে তুষ্ট করলেন তখন মহাদেব শান্ত হয়ে এই ধনু দেবতাগণকে অর্পণ করেন। দেবতাগণ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাতকে এই ধনু ন্যাসস্বরূপ রাখতে দিয়েছিলেন।

ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্ব্বজে বিভো।
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ ॥ ১৩

ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবৰ্দ্ধত মমাত্মজা ॥ ১৪
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থিতাং তাস্তু বৰ্দ্ধমানাং মমাত্মজাম্ ॥ ১৫

(১. ৬৬. ১৩-১৫)

অতঃপর একদিন ক্ষেত্রকর্ষণকালে লাঙ্গলমুখে এক কন্যার উদ্ভব হল। যেহেতু ক্ষেত্র পরিচর্যাকালে এই কন্যার আবির্ভাব ঘটে সেকারণে কন্যার নাম সীতা। সীতার বিবাহ ব্যাপারে জনক পণ করেছিলেন, যে এই ধনুর্ভঙ্গ করতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিবাহ দেবেন। রাম অবলীলাক্রমে ধনুর মাঝখানে ধরে জ্যা আরোপ করে ভেঙ্গে দিলেন।

ধনু কাহিনীতে অসামঞ্জস্য রয়েছে।

প্রথমতঃ; বিশ্বামিত্র দশরাত্রর জন্য মাত্র রামলক্ষ্মণকে তার নিজের কার্যোদ্ধারের কারণে দশরথের নিকট হতে চেয়ে এনেছিলেন। কার্যসিদ্ধির পর অযোধ্যায় না ফিরে মিথিলায় যাওয়া কি অস্বাভাবিক নয়?

দ্বিতীয়তঃ; ধনুর সঙ্গে সীতার বিবাহ বিষয়টি যখন জড়িয়ে আছে জানা গেল. তখন বিশ্বামিত্র দশরথের পূর্ব মতামত না নিয়ে কেন রামকে ধনু প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন?

তৃতীয়তঃ; রাম সীতার বিবাহের প্রাক্কালে জনক তার বংশের যে তালিকা পেশ করেছিলেন সেই অনুসারে দেবরাত নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র নয়. সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ।[৬]

চতুর্থতঃ; মহাদেব প্রদত্ত ধনু দেবতাগণ ন্যাসস্বরূপ দেবরাতের নিকট রেখেছিলেন। সুতরাং ঐ ধনু ভেঙ্গে নষ্ট করার অধিকার জনক কোথায় পেলেন?

এই ধনু প্রসঙ্গে আবার অন্যত্র বলা হয়েছে মহাযজ্ঞে বরুণ তুষ্ট হয়ে ধনু প্রদান করেছিলেন।

মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
দত্তং ধনুর্ব্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ ॥ ৩৯

(২. ১১৮. ৩৯)

সাধুর ছদ্মবেশে রাবণ পঞ্চবটী বনে সীতাকে হরণ করতে এসে সীতার পরিচয় জানতে চাইলে সীতা প্রসঙ্গক্রমে জানান বিবাহের পর বারো বৎসর

শ্বশুরকুলে বাস করার পর ত্রয়োদশবর্ষে তিনি রামের সঙ্গে বনবাসে আসেন। তখন তাঁর বয়স আঠারো এবং রামের বয়স পঁচিশ।

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকুণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী ॥ ৪
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ ॥ ৫
*　　　　*　　　　*
মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মানি গণ্যতে ॥ ১০

(৩ ৪৭. ৪-৫., ১০)

বারো বৎসর শ্বশুরকুলে বাস করার কথা অশোকবনে বন্দিনী সীতা হনুমানের সাক্ষাৎকারের সময়েও ব্যক্ত করেছিলেন।

সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী ॥ ১৭
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্।
অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে ॥ ১৮

(৫. ৩৩. ১৭-১৮)

এই তথ্য অনুসারে সীতা আঠারো বছর বয়সে রামের সঙ্গে বনে গমন করেন। অতএব ছয় বছর বয়সে সীতার বিবাহ হয়েছিল। সাবালিকা না হলে স্বয়ম্বর সভায় বিবাহ হয় কি? অত্রির আশ্রমে সীতা নিজেই অনসূয়াকে বলেছিলেন তাঁর পতিসংযোগসুলভ বয়স হলে তাঁর বাবা তনয়ার জন্য ধর্মতঃ স্বয়ম্বরসভা স্থির করেন।[৭]

সুতরাং ধনুকাহিনীর সঙ্গে মূলতঃ মানবী সীতার সম্পর্ক নাই। এই সীতা কৃষিশ্রী। সীতার জন্মকাহিনীতেও তার সীরখাত-স্বরূপ সুস্পষ্ট।

জনক শব্দের সাধারণ অর্থ জন্মদাতা। বসুন্ধরার বুকে কৃষক হলকর্ষণ করলে সীতার উদ্ভব হয়। সুতরাং কৃষক হলেন জনক, সীতার পিতা, যদিও সীতার মাতা বসুন্ধরার সঙ্গে কৃষকের কোন যৌন সম্পর্ক নাই। অগ্নিপরীক্ষা-কালে সীতা একথা ব্যক্ত করেছেন।[৮]

জনকের আসল নাম সীরধ্বজ, অর্থাৎ কৃষক। জনক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে পৃথিবী শাসন করতেন। ক্ষত্র ও ক্ষেত্র শব্দ দুটি সমার্থক ধরলে কৃষি-কাজের ইংগিত পাই। যদি স্বতন্ত্র অর্থ ধরা হয় তাহলে সীতার সূত্র ধরে

ব. বি. /রামায়ণের উৎস/৬০-৮

বলা যায় একটি কৃষি নির্ভরশীল অঞ্চলের প্রধান ছিলেন 'জনক' উপাধিধারী বংশের সীরধ্বজ, যিনি যথাসময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম হলকর্ষণ করে কৃষিকাজের শুভারম্ভ ঘোষণা করতেন।

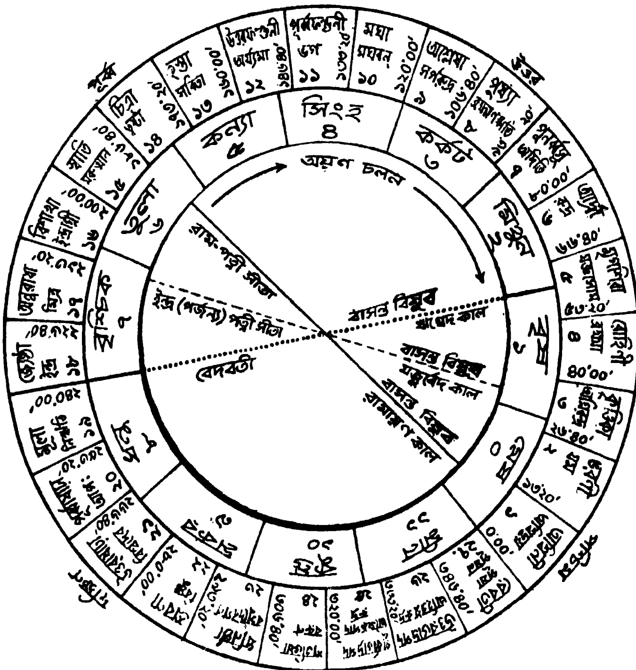
পুরাণে কালপুরুষ নক্ষত্র নিয়ে নানা কাহিনীর বিস্তার। দক্ষযজ্ঞ বিনাশক মহাদেবের জ্যোতির্বিজ্ঞান-স্বরূপ হল কালপুরুষ নক্ষত্র ও পুনর্বসু নক্ষত্র হল সেই ধনু। পাঁচ তারা বিশিষ্ট পুনর্বসু নক্ষত্রটি ধনুরাকৃতি। একদা মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হত। পরবর্তীকালে অয়নচলন হেতু বাসন্ত-বিষুব মৃগশিরা নক্ষত্রর পরিবর্তে রোহিণী এবং আরও পরে কৃত্তিকা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হয়। বিষুবর নক্ষত্র পরিবর্তনের ঘটনাকে উপলক্ষ করে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কাহিনী। দক্ষর কল্পনাও কালপুরুষ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। কাল-পুরুষ নক্ষত্রর শীর্ষস্থ তিনটি তারা নিয়ে দক্ষর ছাগমুণ্ড কল্পনা।[৯] বাসন্ত-বিষুব যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে, তখন কালপুরুষ নক্ষত্রের ভূমিকা গৌণ। একারণে ধনু জনক বংশের পূর্বপুরুষের নিকট ন্যাসস্বরূপ প্রদান। কালক্রমে অয়নচলন হেতু বাসন্ত-বিষুব আরও পশ্চাদগামী হলে পুনর্বসু নক্ষত্র পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে। কারণ তখন সূর্য কর্কটরাশিতে প্রবেশ করলে শ্রাবণ মাস বর্ষাঋতুর প্রথম মাস হিসাবে গণ্য হত। অতএব পুনর্বসু নক্ষত্রর শেষ-পাদে সূর্য এলে আগামী বর্ষার আশায় কৃষিকাজের প্রস্তুতি শুরু হত। কৃষি-কাজের এই প্রস্তাবনাই হল জনকের যজ্ঞ।

আমরা জানি দক্ষিণায়নাদি দিবস হতে বর্ষা ঋতু গণনা করা হয়। রামায়ণের কালে গ্রীষ্মঋতুর দ্বিতীয় মাস আষাঢ়ে সূর্য যখন পূনর্বসু নক্ষত্রে তখন সূর্যর প্রখর তাপে আবহমণ্ডলের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে গভীর নিম্ন-চাপের সৃষ্টি করে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে মেঘবাহী উত্তর-পূর্বমুখী বায়ুপ্রবাহ বর্ষাঋতুর আগমন ত্বরান্বিত করে। বায়ুমণ্ডলের এই গভীর নিম্ন-চাপের স্থান পূরণই হল ধনুর্ভঙ্গ। ধনু অর্থ চাপ।

বিশ্বামিত্রর সঙ্গে জনকের সাক্ষাৎকারের দিন যজ্ঞের দ্বাদশ দিবস বাকি ছিল। রাম যেদিন ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করে ধনুর্ভঙ্গ করেন তার একাদশতম দিনে জনকের যজ্ঞ শেষ হয়, অর্থাৎ চাষের প্রাথমিক কাজ বীজতলা সম্পূর্ণ হয়। ঐদিন দক্ষিণায়নাদি। পৃথিবী এই সময় রসসিক্ত হয়, একারণে তিন দিন হলকর্ষণাদি নিষিদ্ধ। এই সূত্রে অম্বুবাচীর সঙ্গে

দক্ষিণায়নাদির সম্পর্ক টানা যায়।

এখানে ধনুর মধ্যভাগ অর্থে পুনর্বসু নক্ষত্রর মধ্যভাগ ধরা হলে সূর্য তখন রাশিচক্রের ৮৬° ৪০′ (ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়)। বাকি এগারো দিনে সূর্য আন্দাজ দশ অংশ পূর্বগামী হয়ে ৯৬° ৪০′ (ছিয়ানব্বই অংশ চল্লিশ কলায়) পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থান করবে। অতএব রামায়ণের কালে ঐ সময় দাক্ষিণায়নাদি।



কিন্তু দেবরাত কে?

দেবরাত অর্থে দেব রক্ষিত যেখানে। দেব অর্থ মেঘ। সুতরাং দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশ কাহিনীতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে পুষ্যা নক্ষত্রে দাক্ষিণায়নাদি হলে পুনর্বসু নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে বায়ুমণ্ডলে যে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হবে, সেই তথ্যকে দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ ধনু প্রদান বলা হয়েছে। সুতরাং দেবরাত শব্দের মধ্যেও পুনর্বসু নক্ষত্র এবং

দক্ষিণায়নাদির ইংগিত আছে। অতএব ধনু-কাহিনীর মধ্যে রামায়ণের কালের *দক্ষিণায়ন স্থানটির নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। 'সম্পাতি রহস্য' অধ্যায়েও বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। বিশ্বামিত্রর সিদ্ধাশ্রম কাহিনীর বিশ্লেষণ কালে* পুনরায় এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। এখানে লক্ষণীয় যে জনক বিশ্বামিত্রর নিকট যজ্ঞ শেষের সময়কাল উল্লেখ করেছেন, কোন তিথি নক্ষত্রর নাম করেননি। তাছাড়া রাম অহল্যাকে উদ্ধার করে বিশ্বামিত্রর সঙ্গে মিথিলায় উপনীত হন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় রামের ধনুর্ভঙ্গ পর্যন্ত 'বিদেহ' বা 'বৈদেহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। একবার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে 'বৈদেহোর্মিথিলাধীপঃ' (১. ৬৫. ৩৯)। এখানে মিথিলাপতি বৈদেহ বলে উভয় শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য টানা হয়েছে মনে করি। কিন্তু দশরথের জনক গৃহে আগমন উপলক্ষে 'মিথিলা' শব্দটি ব্যবহার না করে সকল সময় 'বিদেহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিদেহ অর্থ বিগত দেহ, অর্থাৎ একদা ছিল।

এই শব্দে অবশ্যই বৈদিক কালের পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদির ইংগিত করা হয়েছে। দশরথ বিদেহ রাজ্যে পৌঁছানোর পর সীতার বিবাহ প্রসঙ্গে জনক মঘা ইত্যাদি নক্ষত্রর উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণায়নাদির প্রায় একমাস পরে পুরোদমে বর্ষা নামে, চাষের কাজও চলে দ্রুততালে। তখন বারিধারার সূত্রে মেঘদেবতা রাম ও কর্ষিত জমি সীতা একটি সত্তায় যেন পরিণত হয়। সামাজিক জীবনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নর ও নারী 'অর্ধনারীশ্বর' ভাবে অবস্থিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে। এজন্যই নৈসর্গিক ঘটনাকে প্রকাশ করতে রামায়ণে ভগ নক্ষত্রে রামসীতার বিবাহ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই রীতিতে রামায়ণে প্রায়শঃ রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

বর্ষারম্ভের পূর্বেই জমি চাষ করে বীজতলা তৈরী করতে হয়। তখন জমিতে বীজের অংকুরোদগম করার মত জলের প্রয়োজন। যেহেতু সীতাকে রূপকে মানবী-সত্তা দেওয়া হয়েছে, সেকারণে বর্ষার পূর্বমুহূর্তের সীরখাতের পর্যায়কে সন্তান ধারণোপযোগী রজঃস্বলা যুবতী হিসাবে প্রকাশ করতে হবে। নতুবা বর্ষার জলস্পর্শে সীরখাত (সীতা) বীজ হতে চারা উৎপাদন করবে কিভাবে?

সীতার স্বয়ম্বরসভা হয়েছিল।

কর্ষিত জমি ত সকল সময়ের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু গ্রীষ্মঋতুর শেষে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ ভেদ করতে একমাত্র উত্তর-পূর্বমুখী মেঘ-বাহিত বায়ু-

প্রবাহ সক্ষম। এই মেঘবর্ষণের দরুণ শস্যক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি, সীতার কৃষিশ্রী স্বরূপ। সুতরাং সীতার ভর্তা হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র মেঘদেবতার। রাম এই মেঘবর্ষণের দেবতা। মেঘের উৎপত্তি সূর্যর প্রখর উত্তাপে। সূর্যর বার্ষিকগতির দ্বারা মেঘের গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মেঘদেবতা সূর্যরই আরেকটি স্বরূপ। সূর্যর এক নাম বিষ্ণু। রাম বিষ্ণুর অর্ধাংশ এবং সূর্য-বংশীয়।

অতএব কৃষিশ্রী সীতা বিবাহের পূর্বেই পতিসংযোগসুলভ বয়স প্রাপ্ত হয়ে স্বয়ম্বর সভায় পতিলাভ করেছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

ধনুর সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক টানা হয়েছে। বরুণ জলের দেবতা। সুতরাং বর্ষারম্ভর সঙ্গে সম্পর্ক টানা যায়। অপরদিকে শতভিষা নক্ষত্রর বৈদিক নাম বরুণ। পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদি হলে শতভিষা (বরুণ) নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হয়। এই প্রাচীন তথ্য নির্দেশের কারণে বরুণের সঙ্গে ধনুর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। অতএব আপাতঃ দৃষ্টিতে যা অসামঞ্জস্য মনে হয়েছিল, সেগুলি সবই রহস্য।

ধনুর্ভঙ্গের পর জনক বিশ্বামিত্রর অনুমতি নিয়ে রামের বিবাহ বিষয়ে দশরথের সম্মতি লাভার্থে অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করলেন। তিন রাত্রি অতি-বাহিত করে চতুর্থ দিবসে দূতগণ অযোধ্যায় পৌঁছে দশরথের নিকট সকল ঘটনা পেশ করল। পরদিন দশরথ যাত্রা করে পথে চার দিবস অতিক্রান্ত করে বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হলেন। তখন জনক দশরথকে জানালেন,—কাল প্রভাতে এই যজ্ঞের অবসানে আপনি বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন করুন।

পরদিন প্রভাতে বিশেষ দূত পাঠিয়ে জনক সাঙ্কাশ্যা নগরী হতে ভ্রাতা কুশধ্বজকে নিয়ে এলেন। এখানে কিন্তু কুশধ্বজ কন্যাদ্বয় সহ বিদেহরাজ্যে এসেছিলেন এমন কোন ইংগিত দেওয়া হয়নি।

তারপর বিশ্বামিত্রর মতানুসারে দশরথের নির্দেশে বসিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের গুণকীর্তন করলেন। নিজ বংশের বর্ণনা পেশ করার পর জনক তিন সত্য করে তাঁর দুই কন্যাকে সম্প্রদানের অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়ের উল্লেখ করলেন না।

মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু ॥ ২৪

(১. ৭১ ২৪)

অর্থাৎ অদ্য মঘা নক্ষত্র, সুতরাং তৃতীয় দিবসে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে

আপনি বৈবাহিক কাজ সম্পাদন করুন।

তখন বসিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্র জনককে বললেন কুশধ্বজের দুই কন্যাকেও দশরথের পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হোক। অতএব স্থির হল একই দিনে চারজনের বিবাহ হবে।

উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১৪

(১. ৭২. ১৪)

অর্থাৎ পরশুদিন ফল্গুনী-নক্ষত্র হবে, সুতরাং ঐদিন বিবাহে প্রশস্ত, যেহেতু মনীষীরা বিবাহ বিষয়ে ভগদৈবত ফল্গুনী-নক্ষত্রের প্রশংসা করে থাকেন। সেই মত দশরথের চারিপুত্রের সঙ্গে সীরধ্বজের দুইকন্যা ও কুশধ্বজের দুই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হল।

এই বিবরণে ধনুর্ভঙ্গের পর দূতগণের অযোধ্যা গমন ও দশরথের বিদেহরাজ্যে আগমনের মধ্যে জনকের যজ্ঞ সমাপনের এগার দিনের হিসাব ঠিক আছে মনে হবে। কিন্তু আসলে কুশধ্বজ প্রসংগ টেনে ঘটনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে। সুতরাং দশরথের উপস্থিতিতে ঘোষিত বিবাহের দিন সূর্য পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে এবং চন্দ্র উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে।

বিবাহের প্রস্তাবনায় কাহিনী রহস্যপূর্ণ।

যজ্ঞান্তে পরদিন প্রভাতে জনক দূত পাঠিয়ে সাঙ্কাশ্যা নগরী হতে কুশধ্বজকে আনিয়েছিলেন। সাঙ্কাশ্যা অর্থে সাদৃশ্যযুক্ত, সমভাবাপন্ন। সাঙ্কাশ্যা নগরীর প্রাক্তন রাজা সুধন্বাকে বধ করে সীরধ্বজ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সেখানে অধিষ্ঠিত করেছেন। সুধন্বা অর্থে শ্রেষ্ঠ ধানুকী।

রামায়ণ কালের পূর্বে মৃগশিরা নক্ষত্রে এবং পরে রোহিণী নক্ষত্রে যখন বাসন্ত-বিষুব ছিল, তখন পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদি হত। সুতরাং বৈদিককালের দক্ষিণায়নাদির সূত্র ধরে পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রকে সাঙ্কাশ্যা বলা হয়েছে। দক্ষিণায়নাদিতে বায়ুমণ্ডলে গভীর নিঃচাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রুতি বর্ষাগম। এই তথ্যের ইংগিত সাঙ্কাশ্যা নগরীর প্রাক্তন নৃপতি সুধন্বা, শ্রেষ্ঠ ধানুকী। যেমন, রামায়ণের কালে রাম। প্রাকৃতিক ঘটনা একই, শুধু মাত্র কালের ব্যবধান। রামায়ণকালের ভাদ্র মাস ঘোর বর্ষাকাল, অতএব সাঙ্কাশ্যা তখন কুশধ্বজ অর্থাৎ ঘোর বর্ষার অধীন। সুতরাং কাহিনীকে অর্থাৎ দক্ষিণায়নাদি পুনর্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্র হতে পূর্ব ও উত্তর-ফল্গুনীতে নিয়ে আসা হয়েছে।

উপরোক্ত শ্লোকে 'ভগ' শব্দের প্রয়োগে সূর্যর সিংহরাশিতে ভগ অর্থাৎ পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থান বুঝতে হবে। পূর্ব-ফল্গুনীর বৈদিক নাম ভগ। সিংহরাশিস্থ ভাদ্র মাসের আদিত্যর নামও ভগ।

রামসীতার বিবাহদিনে সূর্য পূর্ব-ফল্গুনীর শেষ পাদে, চন্দ্র উত্তর-ফল্গুনীতে। তিথি অমাবস্যা ; শুক্ল প্রতিপদও হতে পারে। বৈদিক কালে পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্য এলে বর্ষাকাল সংক্রান্ত হলকর্ষণ জাতীয় উৎসব হত মনে হয়। সেই স্মৃতি অনুসারে রামায়ণের কালেও হয়ত ঐ সময় মেঘদেবতা ও বসুন্ধরা কন্যার বিবাহ জাতীয় কোন উৎসব পালন করা হত। সেই ইংগিত রামায়ণে রামসীতার বিবাহ উপলক্ষে রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, সাঙ্কাশ্যা, সুধন্বা এবং কুশধ্বজকে কাহিনীর মধ্যে জড়ানোতে বলা যায় দক্ষিণায়নাদিতে বর্ষাঋতু গণনা করা হলেও পুরোপুরি বর্ষা নামে এক মাস পরে। সুতরাং শ্রাবণ বর্ষাঋতুর প্রথম মাস হলেও আকাশের মেঘ এবং পৃথিবীর কর্ষিত জমির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে ভাদ্রমাসে। একারণে আনুষ্ঠানিক বিবাহের ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হয়েছে সূর্য যখন ভগ (ভাদ্র) মাসে ভগ (পূর্ব-ফল্গুনী) নক্ষত্রে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রর শেষপাদে অমাবস্যা হলে কর্কটরাশিতে দুইটি অমাবস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে শ্রাবণ মাস অবশ্যই মলমাস হবে। অতএব শুভানুষ্ঠান শুদ্ধ শ্রাবণমাসে হতে হবে।

এই মলমাসের ইংগিত বিশ্বামিত্র কাহিনীতেও আছে। বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ সমাপনের কারণে দশরাত্রর জন্য দশরথের নিকট হতে রামকে চেয়ে নিয়েছিলেন। এখানে 'রাত্র' শব্দে মাসকে ইংগিত করা হয়েছে। তাহলে সেই বৎসরে মলমাস থাকায় এগারো মাসে বৎসর পূর্ণ হয়। অতএব রাম যে মাসে অযোধ্যা ত্যাগ করেন সেই মাস এবং মলমাস বাদ দিয়ে দশমাস গণনা করলে বৎসরের হিসাব মেলে।

সুতরাং পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে সীতার বিবাহ উল্লেখ করে বৈদিক যুগের দক্ষিণায়নাদি কাল এবং রামায়ণের কালের কোনও এক বৎসরের মলমাস উভয়ের ইংগিত দেওয়া হয়েছে। বিশ্বামিত্রর সঙ্গে রামের অযোধ্যা ত্যাগ কালে রামের বয়স ছিল ঊনষোড়শ। ঊন শব্দটি ব্যবহার করে ঊন বৎসরের ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে এখনও একটি সংশয় থাকে।

সীতা হরণের উদ্দেশ্যে রাবণ মারীচকে সাহায্য করার অনুরোধ করলে মারীচ রামের শৌর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদা সে যখন মহাবিক্রমে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করছিল তখন তার ভয়ে ভীত হয়ে বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন দশরথ জানান রামের বয়স ঊন-দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

ঊনদ্বাদশবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ।
কামন্তু মম তৎ সৈন্যং ময়া সহ গমিষ্যতি ॥ ৬

(৩. ৩৮. ৬)

বিশ্বামিত্রর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত দশরথ রাজী হয়ে রামকে নিয়োগ করলে বিশ্বামিত্র সেই দিনই তাঁর যজ্ঞ সমাধা করেন। মারীচ যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য রামকে উপেক্ষা করে ধাবিত হলে রাম শরাঘাতে মারীচকে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। এই প্রসঙ্গে তাড়কাবধ অথবা জনকের যজ্ঞের কোন উল্লেখ নাই। উপরন্তু বিশ্বামিত্র যেদিন রামকে প্রার্থনা করেন সেই দিনই যজ্ঞ সমাধা করেন।

অদ্য রক্ষতু মাং রামঃ পর্ব্বকালে সমাহিতঃ।
মারীচান্মে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নরেশ্বরঃ ॥ ৪

(৩. ৩৮. ৪)

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র দশরথকে বলছেন; "মারীচ হইতে আমার অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে; অতএব অদ্য আমি যখন যজ্ঞ করিব, রাম তখন আমাকে রক্ষা করুন"।

কিন্তু পূর্বকাহিনীতে অযোধ্যা ত্যাগের পর যজ্ঞস্থলে পৌঁছুতে বিশ্বামিত্র রামকে নিয়ে একাধিক রাত্র পথে রাত্রিবাস করেছিলেন।

রামের জন্ম চৈত্রমাসে, রবি মেষরাশিতে। অতএব রামের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হতে তখনও রাশিচক্রের এক-চতুর্থ অর্থাৎ একভাগ কম। তাহলে সূর্য তখন মকররাশিতে, যখন রাম মারীচকে বিতাড়িত করেছিলেন।

মনে হয় রামের ঊনদ্বাদশ বৎসর বয়সে মারীচ অর্থাৎ দীপ্তি সম্পন্ন কোন ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল। সেই ধূমকেতুটি পুনরায় চার বৎসর পরে রামের ঊনষোড়শ বৎসরে দেখা গিয়েছিল। এটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল সীতা হরণের প্রাক্‌কালে। মনে হয় রামায়ণের কালে এই ধূমকেতুটি মানুষের মনে বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি করেছিল।

'ঊনদ্বাদশ' শব্দে বারো বৎসর পূর্ণ হতে তিন মাস বাকি আছে।

'ঊনষোড়শ' শব্দে ঊন বৎসর অর্থাৎ মলমাস সমন্বিত বৎসর বুঝানো হয়েছে। ঊন শব্দটি দুই ক্ষেত্রে দুই অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মানবী সীতার অস্তিত্ব স্বীকার করলে বলা যায় রামের দ্বাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহ হয়েছিল। তখন সীতার বয়স ছয় বৎসর মাত্র। চার বৎসর পরে সীতা ঋতুমতী হলে দ্বিতীয়-বিবাহ হয়।[১০] উভয় বিবাহের ক্ষেত্রেই হয়ত পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ঐতিহাসিক ঘটনাকে রহস্যাবৃত করার কারণে রামের ঊনষোড়শ বর্ষের উল্লেখ করে মানবী সীতাকে কৃষিস্বরূপা সীতার সঙ্গে একাত্মা করা হয়েছে।

বিবাহ বাসর ছাড়া সীতার তিন বোনের কোন ভূমিকা সমগ্র রামায়ণে নাই। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং এ'দের কোন মানবিক সত্তা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ'দের কৃষিচরিত্র অনস্বীকার্য। হলকর্ষণের পর সীতার উদ্ভব। সীরখাত সমন্বিত কর্ষিত জমি ঊর্মি সমন্বিত। এই অবস্থাকে ঊর্মিলা বলা হয়েছে। একারণে ঊর্মিলা সীতার কনিষ্ঠা। ক্ষেত্রের এই উভয়বিধ অবস্থার সৃষ্টি হয় কৃষকের হাতে। এজন্য সীতা ও ঊর্মিলা সীরধ্বজের কন্যা। কর্ষিত জমির সঙ্গে মেঘবর্ষণ দেবতার সম্পর্ক। কিন্তু বর্ষণের প্রকাশ বারিধারায়। বারিবিন্দু প্রথম স্পর্শ করে কর্ষিত জমির ঊর্মির উর্ধ্বপীঠ। এজন্য ঊর্মিলা লক্ষ্মণের স্ত্রী। বর্ষাকালে জমির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তখন জমির মাটি মণ্ডে পরিণত হয়। এই অবস্থার প্রকাশ ভরত ও মাণ্ডবীর বিবাহ। শ্রুতকীর্তি অর্থ বিখ্যাত, শ্রুতযশাঃ। শত্রুঘ্ন অর্থ শত্রুনাশক। কর্ষিত জমির সার্থকতা ফসল উৎপাদনে। ক্ষেত্র হতে এই ফসল প্রাপ্তিকে নির্দেশ করছে শত্রুঘ্ন ও শ্রুতকীর্তির বিবাহ। বিনা জলে জমির মাটি মথিত হয় না এবং ফসল উৎপাদিত হতে পারে না। এজন্য এ'রা দুইজনে কুশধ্বজের কন্যা।

সুতরাং ধনুর্ভঙ্গ এবং সীতার বিবাহ উভয় প্রসঙ্গে সীতার কৃষিসত্তা খুবই স্পষ্ট।

রামায়ণে আছে সীতা লক্ষ্মীর অংশজাতা।

রাবণকে বধ করে লংকা জয়ের পর রাম সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করায় সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় অবতীর্ণা হলেন। সে সময়ে ব্রহ্মা রামকে বলেন ;

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দ্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৭

(৬. ১১৯. ২৭)

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০-৯

অর্থাৎ, সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণ অর্থে রাম শব্দটির ব্যবহার আছে (১০।৩৩ সায়ন)। হরিকে কি ভাবে মহাসমরে লাভ করা যায় রাবণ যখন এই চিন্তা করছিলেন তখন সনৎকুমার প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন ;

তস্য পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মীঃ সীতেতি বিশ্রুতা।
দুহিতা জনকস্যৈষা উত্থিতা বসুধাতলাৎ ॥ ২৩

(৭ ৪৪ ২৩)

অর্থাৎ, তাঁহার (রামের) পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে বিখ্যাতা হবেন,—সেই জনকনন্দিনী সীতা বসুধাতল হতে সম্ভূতা হবেন।

নারদ সনৎকুমারের নিকট রাবণের ক্রিয়াকলাপ জ্ঞাত হয়েছিলেন। নারদের নিকট যেমনটি জেনেছেন, অগস্ত্য সেই রকম বর্ণনা রাম অযোধ্যার রাজা হলে তাঁকে শুনিয়েছিলেন।

সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ।
ত্বদর্থমিয়মুৎপন্না জনকস্য গৃহে প্রভো ॥ ৫৩

(৭ ৪৬ ৫৩)

অর্থাৎ, মহাভাগা লক্ষ্মীই ধরিত্রীসম্ভূতা সীতা, তিনি তোমার (রামের) জন্য জনকগৃহে উৎপন্না হন। সকল শ্রী সম্পদ সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী। সুতরাং লক্ষ্মীস্বরূপা সীতা অবশ্যই কৃষিশ্রী। বাল্মীকি সীতার এই লক্ষ্মীসত্তার প্রত্যক্ষ প্রস্তাবনা প্রথম করেছেন লংকা জয়ের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে। অনেকে মনে করেন রামায়ণে এই ঘটনাটি প্রক্ষীপ্ত। কিন্তু সীতার কৃষিসত্তা স্বীকার করে নিলে এই ঘটনাকে প্রক্ষীপ্ত বলার কারণ নেই।

অতীতে কৃষিবিজ্ঞান যখন আজকের মত উন্নত হয়নি, সেকালে বসন্ত-ঋতুতে চাষোপযোগী ভূখণ্ডের বনে আগুন লাগানো হত। বর্তমান কালেও অরণ্য অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। একে বলে ঝুম চাষ। আগুনে বন পরিষ্কার হলে দুই এক পশলা বৃষ্টির পর সেই জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। ছাইগুলো সারের কাজ করে। তারপর বর্ষার চাষ।

আগেই বলেছি রামায়ণে কৃষিভিত্তিক রামকথার পটভূমিকায় রহস্যে ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং ঐতিহাসিক মানবী সীতার ক্ষেত্রে বলা যায় বাল্যকালে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্ ॥ ১৬

(৬. ১১৮. ১৬)

অর্থাৎ, বাল্যকালে শাস্ত্রানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, তাহাও আপনি দেখিলেন না।

সুতরাং বিবাহকালে মানবী সীতা ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকা হওয়া অস্বাভাবিক নয়, স্বয়ম্বর নিশ্চয়ই হয়নি। বিবাহের বারো বৎসর পরে সীতার বয়স যখন আঠারো তখন ঐতিহাসিক রামচন্দ্র বনবাসে গমন করেন এবং সীতার প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। লংকা জয়ের পর রামসীতার মিলনের পূর্বে সীতার অগ্নিপরীক্ষা (অগ্নিতে প্রবেশ নয়) হয়েছিল বসন্তঋতুতে। এক্ষেত্রে মানবী সীতা ও কৃষিশ্রী সীতাকে একটি সত্তায় ব্যক্ত করে রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

সীতা যখন লংকার অশোকবনে বন্দিনী, হনুমান সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে রামকে প্রদানের জন্য হনুমান অভিজ্ঞান প্রার্থনা করলে সীতা রামকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য চিত্রকূটে অবস্থানকালে বায়স ঘটনাটি বিবৃত করে হনুমানের হাতে চূড়ামণি প্রদান করেন।

এষ চূড়ামণির্দ্দিব্যো ময়া সুপরিরক্ষিতঃ।
এতং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানঘ ॥ ৭
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
অতঃপরং ন শক্ষ্যামি জীবিতুং শোকলালসা ॥ ৮

(৫ ৪০. ৭-৮)

অর্থাৎ, আমি এ পর্যন্ত এই মনোহর চূড়ামণি সর্বতোভাবে রক্ষা করেছি। বিশেষতঃ তোমাকে দর্শন করলে যে প্রকার আনন্দ লাভ হয়, আমি ইহা দেখে সেরূপ আনন্দলাভ করছি। এই মনোহর সামুদ্র রত্নটি তোমার প্রত্যাভিজ্ঞানের জন্য প্রেরণ করলাম, তুমি শীঘ্র না এলে শোকনিবন্ধন উৎকণ্ঠায় প্রাণরক্ষা করতে পারব না।

রাম এই চূড়ামণি দেখে শোকে অভিভূত হয়ে বললেন,—

মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে।
বধূকালে যথাবদ্ধমধিকং মূর্দ্ধ্নি শোভতে ॥ ৪

অয়ং হি জলসম্ভূতো মণিঃ প্রবরপূজিতঃ।
যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শক্রেণ ধীমতা ॥ ৫

(৫. ৬৬. ৪-৫)

অর্থাৎ, ধীমান ইন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হয়ে এই দেবপূজিত জলজাত রত্ন, যজ্ঞকালে জনককে দান করেন। আমার শ্বশুর জনকরাজ, সীতার শিরোভূষণের জন্য বিবাহকালে আমার পিতার নিকটে এটা সমর্পণ করেছিলেন। বৈদেহী এই মণির শোভাবর্ধনের নিমিত্ত সর্বদা মস্তকে ধারণ করতেন।

এই কাহিনীতে 'ইন্দ্র' শব্দে যজুর্বেদ অনুসারে বর্ষণদেবতাকে ইংগিত করছে। জমিতে বীজ বপনের পর ভূগর্ভস্থ জলের সংস্পর্শে বীজের অংকুরোদগম হয়। পরবর্তীকালে বৃষ্টিপাত হলে অংকুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে চারায় বা গাছে পরিণত হয়।

সীতার চূড়ামণি অংকুরিত বীজের প্রতীক। সীতা আঁচলের ভিতর হতে চূড়ামণি বের করেছিলেন। বীজের অংকুরোদগম হয় মাটির তলায়। উপরের আচ্ছাদনের মাটিকে সীতার বস্ত্রাঞ্চল কল্পনা করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলকে সমুদ্র কল্পনা করে চূড়ামণিকে সমুদ্রজাত বলা হয়েছে।

সীতা হনুমানকে বারংবার একমাস কাল জীবিত থাকার কথা জানিয়েছিলেন।[১১] দক্ষিণায়ন কালে মেঘ সঞ্চারিত হয়ে বর্ষা সমাগম না ঘটলে বীজ অংকুরে নষ্ট হলে সীতার অর্থাৎ কর্ষিত জমির কৃষিশ্রী সত্তা বিঘ্নিত হয়। একারণে একমাস সময়কাল বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ ঘটেছিল বর্ষাঋতুর প্রথম মাসে, অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষে। বর্ষাঋতু শেষ হতে আর তখন একমাস বাকি।

অশোক বনে হনুমান বন্দিনী সীতার সন্ধান পেয়েছেন। এমন সময় রাবণের আগমন। হনুমান বৃক্ষ মধ্যে শত শত পুষ্প এবং পত্রের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। এটা বর্ষাঋতুর ইংগিত। তখন বৃক্ষাদি পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়। রাবণ এখানে অনাবৃষ্টির প্রতীক।

পরবর্তীকালে সীতার সম্মুখবর্তী হওয়ার প্রাক্কালে হনুমান শিংশপা বৃক্ষের (শিশু গাছ) পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে ইক্ষ্বাকু বংশের গুণকীর্তন করে সীতার বিশ্বাসভাজন হন। বর্ষাকালে শিশুগাছ পত্রশোভিত হয়। সুতরাং হনুমান গুপ্তচরবৃত্তি করতে লংকায় গিয়ে বর্ষাঋতুতে প্রথম সীতাকে দেখতে পান এবং পরে সাক্ষাৎকার।

রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুকাল পরে লোক অপবাদ কারণে সীতাকে গঙ্গার অপর তীরে নির্বাসনে পাঠান। সীতা তখন গর্ভবতী। বাল্মীকি সীতাকে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন। ইতি-মধ্যে রাম শত্রুঘ্নকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে লবণ-বধের জন্য মথুরায় পাঠান। শত্রুঘ্ন মথুরার পথে বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি বাস করেছিলেন। সেই শ্রাবণের মধ্যরাত্রে লবকুশ জন্মগ্রহণ করেন।

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ।
তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ॥ ১
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ।
বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভম্ ॥ ২

(৭. ৭৯. ১-২)

অর্থাৎ, শত্রুঘ্ন যে রাত্রিতে বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করেন, সেই রাত্রিতেই সীতাদেবী দুটি পুত্র প্রসব করেন। মুনিপুত্রগণ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বাল্মীকির নিকট এই শুভ সংবাদ নিবেদন করলেন।

কতকগুলি সাগ্রকুশ মধ্যভাগে কাটলে তার অগ্রভাগ কুশমুষ্টি এবং অধোভাগ লব বলে উক্ত হয়। বাল্মীকি ঐ কুশ ও লব বৃদ্ধাদের হাতে দিয়ে বললেন, যে আগে জন্মেছে তাকে কুশমুষ্টি এবং কনিষ্ঠকে লব দিয়ে সম্মার্জন করো। এই অনুসারে পুত্রদ্বয়ের কুশ ও লব নাম হয়।

শত্রুঘ্ন নিজের কুটিরে শুয়ে সব শুনলেন এবং চিন্তা করতে করতে শ্রাবণ মাসের সুদীর্ঘ নিশা কেটে গেল।

ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা ॥ ১৩

(৭. ৭৯. ১৩)

সীতার পুত্র প্রসব সম্পর্কে 'দারক' শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ।

দারক অর্থ বিদারক, ভেদক, দুঃখনাশক, পুত্র। সুতরাং 'দারক' শব্দটি ব্যবহার করে বাল্মীকি একদিকে মানবী সীতার যমজ পুত্র প্রসব এবং অপর-দিকে সীরখাতে বীজ হতে চারার আবির্ভাব উভয় ইংগিত রেখেছেন। কৃষি-বিজ্ঞান অনুসারে বীজ হতে চারার আবির্ভাবের দু'টি স্তর আছে। প্রথম অংকুরোদগমটিকে বলে বীজ-মূল যা পরবর্তীকালে শিকড়ে পরিণত হয়। দ্বিতীয় স্তরটির নাম ভ্রূণমুকুল, যা পরবর্তীকালে কাণ্ডে পরিণত হয়। এই দুটি স্তরকে যথাক্রমে কুশ ও লব নামে বাল্মীকি অভিহিত করেছেন।

শ্রাবণের রাত্রি, বর্ষার রাত্রি। রামায়ণের কালে শ্রাবণ বর্ষাঋতুর প্রথম

মাস। সুতরাং জমিতে তখন বীজ হতে চারা উৎপন্ন হয়।

শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করে মথুরাতে রাজধানী স্থাপন করে এক সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তোলেন। বারো বছর সেখানে বসবাসের পর রামকে দেখার বাসনায় শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় রওনা হন। পথিমধ্যে পনের দিন অতিবাহিত করে বাল্মীকি আশ্রমে রাত্রিবাসকালে আড়াল হতে কুশলবের মুখে রামায়ণ গান শোনেন।

সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছচ্ছ্রুত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্।
নিবেশনঞ্চ শত্রুঘ্নঃ শ্রাবণেন সমারভৎ ॥ ৮
স পুরা দিব্যসংকাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে।
নির্বিষ্ট শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ ॥ ৯

(৭. ৮৩. ৮-৯)

অর্থাৎ, শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হতে পুরী (মথুরা) প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলেন। শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারম্ভে সেই সুচারু নগর নির্মিত হল।

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নো রামপালিতাম্।
অযোধ্যাং চবমে গন্তুমল্পভৃত্যবলানুগঃ ॥ ১
ততো মন্ত্রিপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্নিবর্ত্ত্য চ।
জগাম হয়মুখ্যেন রথানাঞ্চ শতেন সঃ ॥ ২
স্ব গত্বা গণিতান্ বাসান্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ।
বাল্মীক্যাশ্রমমাগত্য বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৩

(৭. ৮৪. ১-৩)

অর্থাৎ, দ্বাদশ বৎসরের পর কতিপয় অনুচর সঙ্গে নিয়ে রামপালিত অযোধ্যা নগরে যেতে বাসনা করলেন।

শত্রুঘ্ন মথুরা হতে যাত্রা করে পনের দিনের পর বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। লবণ বধের সময় বাল্মীকি আশ্রম হতে শত্রুঘ্ন সাতদিনে মথুরা পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এবার অযোধ্যার পথে মথুরা হতে বাল্মীকি আশ্রমে পৌঁছুতে পনের দিন অতিবাহিত হল। শত্রুঘ্ন মথুরার জনপদ স্থাপন করলেন, অথচ অযোধ্যার সঙ্গে যোগাযোগের পথ উন্নত করলেন না; এটা সমর্থনযোগ্য নয়। সুতরাং এই পনের দিনের উল্লেখ লক্ষণীয়।

শ্রাবণ মাসের মধ্যরাত্রে কুশলবের জন্ম হয়। এখানে 'রাত্র' শব্দটিতে নিশা এবং মাস দুই ই বুঝানো হয়েছে। মাস অর্থে 'রাত্র' শব্দের ব্যবহার রামায়ণে অন্যত্র দেখা যায়। সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যারাজ্যে অধিষ্ঠিত করে রাম

লক্ষ্মণ সহ বর্ষাঋতু প্রস্রবণগিরি-গুহায় কাটিয়েছিলেন।

ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম্ ॥ ৬

(৪. ২৭. ৬)

অর্থাৎ, সুমিত্রানন্দন! এই গিরিগুহা পরম রমণীয় এবং বিস্তৃত, ইহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়, সুতরাং বর্ষার কয়েক মাস এস্থানে কাটাবো।

অতএব লবকুশের জন্ম হয়েছিল শ্রাবণ মাসের (নিশ্চয়ই চান্দ্র মাসে) পনের তারিখ এবং শত্রুঘ্ন যেদিন পুনরায় বাল্মীকি আশ্রমে আসেন, সেদিন লবকুশের বারো বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে দুই দফাতেই শত্রুঘ্ন সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। বাস্তবে, ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থান এবং লবকুশের সত্য পরিচয় শত্রুঘ্নর নিকট অনিবার্য রাজনৈতিক কারণে গোপন রাখা হয়েছিল। এই কাহিনীতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে লবকুশ বারো বৎসর বয়স হতেই রামায়ণ গানে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সীতার একটি পূর্বকাহিনী আছে।

রাবণ ধরণীতলে ভ্রমণকালে হিমালয় পর্বতের নিকটস্থ বনে উপনীত হয়ে বিচরণ কালে কৃষ্ণাজিনজটাধারিণী তপস্যারতা বেদবতীকে একাকিনী দেখে কামমোহিত হয়ে কন্যার পরিচয় জানতে চাইলে বেদবতী বললেন, "অমিতপ্রভ বৃহস্পতিসূত ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। সতত বেদাভ্যাসী কুশধ্বজের নিকট হতে বাংময়ী বেদ (কন্যা, মূর্তি) উৎপন্না হয়। সুতরাং পিতা আমার বেদবতী এই নাম রাখেন। আমার পিতার ইচ্ছা ছিল বিষ্ণু তাঁর জামাতা হবেন। এজন্য আমাকে অন্য কাউকে দান করার ইচ্ছা নাই জেনে বলগর্বিত দৈত্যপতি শম্ভু কুপিত হয়ে অবশেষে নিশাকালে সুপ্ত অবস্থায় আমার পিতাকে বধ করে। আমার শোকার্ত মাতা পিতার দেহ আলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রবেশ করে। পিতার বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমার এই তপস্যা। সেই বিষ্ণু নারায়ণই আমার পতি।"

বেদবতীর পরিচয় পেয়েও তাঁকে লাভ করার বাসনায় রাবণ তার হাতের অগ্রভাগ দিয়ে বেদবতীর কেশ স্পর্শ করেন। রাবণের এই আচরণে নিজেকে ধর্ষিতা মনে করে বেদবতী রাবণকে অভিসম্পাত দিয়ে অনলে

প্রবেশ করেন।

সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো।
তব ভার্য্যা মহাবাহো বিষ্ণুস্তং হি সনাতনঃ ॥ ৩৫
পূর্ব্বং ক্রোধহতঃ শত্রুর্যয়াসৌ নিহতস্তয়া।
উপাশ্রয়িত্বা শৈলাভস্তব বীর্য্যমমানুষম্ ॥ ৩৬
এবমেবা মহাভাগা মর্ত্ত্যেযুৎপৎস্যতে পুনঃ।
ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা ॥ ৩৭
এষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীৎ কৃতে যুগে।
ত্রেতাযুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ।
উৎপন্না মৈথিলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮

৭. ১৭ ৩৫-৩৮

অর্থাৎ, "সেই বেদবতী জনকরাজের কন্যারূপে জন্ম লইয়া তোমার (রামের) ভার্য্যা হইয়াছেন এবং তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু। পূর্বে বেদবতীর ক্রোধ দ্বারা যে শত্রু নিহত হইয়াছিল এক্ষণে সেই বেদবতীই তোমার অমানুষ বলের আশ্রয় লইয়া সেই শৈলাভ রিপুকে বধ করিয়াছেন। সেই মহাভাগা বেদিমধ্যস্থা অগ্নিশিখার ন্যায় ভবিষ্যৎকালে পৃথিবীতে হলমুখ দ্বারা কর্ষিত ভূমিমধ্য হইতে এইরূপ বারবার উৎপন্না হইবেন। পূর্বকালে সত্যযুগে ইহার বেদবতী নাম ছিল, ত্রেতাযুগ প্রাপ্ত হইয়া ইনি রাক্ষসকুলের বধের নিমিত্ত মৈথিলকুলে মহাত্মা জনকের কন্যারূপে জন্ম লইয়াছেন।"

বেদবতীর অস্তিত্ব ছিল সত্যযুগে। ঋগ্বেদের কালকে সত্যযুগ মনে করা যেতে পারে। সেকালে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব হত। তখন কৃষিকাজ গৌণ কর্ম ছিল। বর্ষায় যে অঞ্চল জলে ডুবে যায়, শরতের পর হতে সেখানে ডাঙ্গা জেগে ওঠে। ঐ নরম পলিমাটিতে ছিটিয়ে ধান ও অন্য শস্য বোনা হয়। এই ধান বসন্তঋতুতে ঘরে ওঠে। নীবার বা উড়ি ধান বিলে বা জলায় আপনিই হয়। ধান পাকলে অল্প বাতাসে উড়ে যায় বা ঝরে পড়ে। এই ধানের অগ্রভাগে শুঁয়া থাকে এবং তুঁষের রং কালো।

এই কাহিনীর বেদবতী সহজাত ধানের রূপক। তুঁষের রং-এর ইংগিত রয়েছে 'কৃষ্ণাজিন' শব্দে এবং জটা তথা কেশের অগ্রভাগ অর্থে ধানের শুঁয়া। ধান পাকার সময় হলে শুঁয়া প্রথমে বিবর্ণ হয়।

বৃহস্পতির পৌরাণিক কাহিনী হল এর জন্ম পুষ্যা নক্ষত্রে। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি পুষ্টিবর্ধক (১।১৮।২) এবং ওষধি সমূহের জনক (১০।৯৭।১৫)।

স্থান বিশেষে ঋগ্বেদে বৃহস্পতিকে অগ্নি বলা হয়েছে (২। ১, ৩। ২৬)[১২]।

অগ্নি অর্থাৎ তেজঃ-রশ্মিতে মেঘের উৎপত্তি। সুতরাং বৃহস্পতি-সুত কুশধ্বজ মেঘবর্ষণ দেবতা।

বর্ষায় বিল খাল জলে ভরে যায়, জলাজমি ডুবে থাকে। বর্ষান্তে জমিতে সহজাত ধান উৎপন্ন হয়। বেদ অর্থ বিষ্ণু ; অর্থাৎ জল। জলের বাঙ্ময়ী স্বরূপ সহজাত ধান, এজন্য নাম বেদবতী।

দৈত্যপতি শম্ভু মূলতঃ কালপুরুষ নক্ষত্র। মৃগশিরা নক্ষত্রে মিথুন রাশিতে সূর্য প্রবেশ করলে তৎকালে বসন্ত ঋতুতে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ভাগ কমে যায়। অনুরূপ, ভূখণ্ডে জলস্তর নীচে নামতে থাকে। এই দুই অবস্থার রূপক শম্ভুর কুশধ্বজকে হত্যা এবং শোকে তার পত্নীর অনলে প্রবেশ।

বেদবতীর বিষ্ণু তথা নারায়ণকে পতি হিসাবে লাভের বাসনা অর্থে সহজাত ধানের অমরত্ব কামনা। কিন্তু রৌদ্রতাপ হেতু ফসল পাকে।

রাবণ অর্থে রাবিতলোকত্রয়, অর্থাৎ লোকবাসীকে যে কাঁদায়। সুতরাং প্রখর সূর্য ধরা যায়। রাবণের কেশস্পর্শ তারই ইংগিত। রামায়ণে 'রাবণ' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা ইষ্ট নষ্ট করে তাই রাবণ।

ত্রেতা যুগে অর্থাৎ দক্ষিণায়নাদি যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের পরবর্তী পুষ্যা নক্ষত্রে তখন কৃষিচর্চার প্রসার হেতু চাষের উন্নতি হওয়ায় যা ছিল সহজাত, তাই সীরখাতে বপন করে ফসল তোলার প্রাধান্য হেতু বেদবতীর জনকদুহিতা-সীতারূপে আবির্ভাবের বর্ণনা। সুতরাং বেদবতী উপাখ্যান সীতার কৃষি চরিত্রটি দৃঢ়তর করছে।

রামায়ণের সীতা চরিত্রের মূল অংশগুলি বিশ্লেষণ করার পর চরিত্রটির কৃষিসত্তা যেমন সুস্পষ্ট হয়, তেমনি সীতার একটি মানবিক সত্তাকেও স্বীকার করে নিতে হবে।

সীতার এই দুই সত্তাকে একীভূত করে বাল্মীকি রহস্যর সৃষ্টি করেছেন।

মনে করি, এই সঙ্গে সীতার আরও একটি সত্তা মিশে রয়েছে। সেটি হল লক্ষ্মীস্বরূপা-সীতার রাজ্যশ্রী স্বরূপতা।

সীতা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সীতাহরণের কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। সত্যই কি সীতা নাম্নী কোন মানবী ঐতিহাসিক রামচন্দ্রর

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০--১০

পঞ্চবটী আশ্রম হতে অপহৃতা হয়েছিলেন ? মনে হয় না। অপহৃতা সীতা এখানে মানবদেহী রামের ভাগ্যশ্রী তথা রাজ্যশ্রী। লংকাপতি রাবণ মারীচকে দিয়ে রামলক্ষ্মণকে বিভ্রান্ত করে দূরে পাঠিয়ে রামের পঞ্চবটী অধিকার করেছিলেন। ফলে রামচন্দ্র রাজ্যহারা হয়েছিলেন। পরে রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যার সুগ্রীবের সহায়তায় লংকা জয় করে সেই রাজ্যশ্রীকে পুনরুদ্ধার করেন।

সীতাহরণ কাহিনীর মধ্যে রহস্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান তথ্যও ব্যক্ত করা হয়েছে। যে নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে প্রথম হলকর্ষণ করা হত, সেই নক্ষত্রকে সীতার জন্মনক্ষত্র ধরা যায়। উক্ত নক্ষত্রে গ্রহণ এবং একাধিক বৎসর অনাবৃষ্টির ইংগিত সীতাহরণ কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনুরূপ, চিত্রকুট পাহাড়ের বায়স কাহিনী। এই কাহিনীতে ইন্দ্রপুত্র বায়স শনিগ্রহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। রামের বনবাস কালের কোনও এক সময়ে সীতার জন্ম নক্ষত্রে চন্দ্রর অবস্থানকালে শনিগ্রহের প্রবেশ এবং সেই অংশ হতে উক্ত গ্রহের গতির দিক পরিবর্তন শুরু। শনিগ্রহ বছরে বারো অংশ অতিক্রম করে। সুতরাং এক নক্ষত্র অতিক্রম করতে তেরো মাস কয়েকদিন সময় লাগে। দ্বিতীয় দফায় বক্রী গতিতে পুনরায় উক্ত নক্ষত্রকে স্পর্শ করে আবার মার্গী হয়। কাল নির্ধারণ জন্য এই জ্যোতিষ তথ্যটি রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে। এবিষয়ে স্বতন্ত্র প্রকরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই সুদীর্ঘ আলোচনায় ঋগ্বেদের কাল হতে সীতার কৃষিশ্রী স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। ঋগ্বেদের কালে ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে দক্ষিণায়নাদিতে বর্ষা সমাগমে ধরিত্রী জীবধাত্রীরূপা হয়ে উঠত। বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে অরণ্য তার সম্পদ উজার করে দিত পরবর্তী ঋতুগুলিতে। এখানে সীতা মুখ্যতঃ বসুন্ধরা।

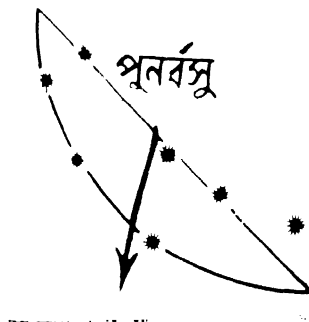
পরবর্তীকালে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠলে সীতার ব্যাপকতর স্বরূপকে সংকুচিত করে কৃষিশ্রীতে রূপান্তরিত করা হল। তখন সীতা হল সীরখাত, মেঘবর্ষণ দেবতার পত্নী। সীতার কৃষিশ্রী-সত্তা রামায়ণের মূল উপজীব্য। এই আবরণের অন্তরালে বাল্মীকি ঐতিহাসিক তথ্য রহস্যে ব্যক্ত করেছেন।

রামায়ণে সীতাকে বারংবার রোহিণী নক্ষত্রর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রামায়ণের কালে বৃষরাশিতে রোহিনী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মের প্রথম মাস। বর্ত্তমানকালেও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে দেখেছি কৃষিজীবিরা রোহিণী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশীতে 'রোণীপরব' উদ্‌যাপন করে। রোহিণী শব্দের অপভ্রংশ রোণী। অতি সাধারণ পরব, প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু পরবের ধরণ অনুসরণ করলে

বুঝা যায় এর সঙ্গে কৃষিকাজ আরম্ভের যোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলের চাষীরা সূর্য রোহিণী নক্ষত্র অতিক্রম করে গেলে ইতিমধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে অনাবৃষ্টি ও অনাবাদ আশংকা করেন। রোহিণী নক্ষত্র নিয়ে কৃষি-জীবিদের এই ধ্যানধারণা অবশ্যই প্রাচীন যুগের স্মৃতি বহন করছে।

যাইহোক আপাতঃদৃষ্টিতে সীতার সঙ্গে তিনটি নক্ষত্রর যোগসূত্র টানা যায়। রোহিণী, পুনর্বসু ও পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র।

রামায়ণের অন্যান্য কাহিনী পর্যালোচনা কালে এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে। রামায়ণে বিভিন্ন ধরণের তথ্য এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে একটি মাত্র তথ্যকে সুস্পষ্ট করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য তথ্যগুলির প্রসঙ্গও উপস্থিত হয়। কৃষিশ্রী সীতার আলোচনার ক্ষেত্রে তাই মানবী সীতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি, যদিও রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মানবিক সত্তা উদ্‌ঘাটনের জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।



অষ্টম প্রকরণ

ইক্ষ্বাকু বংশ

রামায়ণের মূল কাহিনীতে তিনটি বংশের প্রাধান্য,—ইক্ষ্বাকু বংশ, জনক বংশ এবং এই দুই বংশের সংযোগসাধনকারী কুশ বংশ।

মেঘ-দেবতা রামের বংশ তালিকায় ব্রহ্ম তথা মহাশূন্য হতে প্রাণ তথা উদ্ভিদ জগতের আবির্ভাবের বিভিন্ন স্তরগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। জনক বংশে বীজ হতে পুনরায় বীজের উদ্ভবের প্রতিটি পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে। কুশ বংশে অল্পকথায় শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশ পাওয়া যায়।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে একই শব্দ দ্বারা চিহ্নিত একটি চরিত্র সেই শব্দের বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটা উদাহরণ রাখা যেতে পারে। বেদে 'রঘু' শব্দটি সূর্যর প্রতিপদ। দশরথ এবং রাম 'রাঘব' নামে পরিচিত, অর্থাৎ সূর্য তথা সূর্য-সঞ্জাত। সুতরাং দশরথ শব্দে সূর্য, দশদিক, ঋতুচক্র, গুচ্ছধর্মী উদ্ভিদ ইত্যাদি বুঝানো যায়। অপরদিকে ব্যক্তি দশরথের অপর নাম অতিরথ; অর্থাৎ বিশেষ বলবান পুরুষ। অতএব রামায়ণের ঐতিহাসিকতা যখন স্বীকার করা হবে তখন দশরথকে একজন রাজ-চক্রবর্তী হিসাবে গণ্য করতে হয়। কাহিনীতে প্রয়োজন বোধে এই সকল অর্থে 'দশরথ' শব্দটি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ চরিত্রটি পরিবেশিত হয়েছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে একটি চরিত্র মনে হলেও আসলে একাধিক তথ্যের রূপক।

ইক্ষ্বাকু বংশ 'সূর্যবংশ' নামে পরিচিত, অর্থাৎ সূর্য হতে উদ্ভূত। রামায়ণে এই বংশের রাজন্যবর্গের তালিকা কয়েক ধরণের পাওয়া যায়, ফলে বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন অম্বরীষকে কখনও বলা হয়েছে নাভাগের পুত্র, কখনও মান্ধাতার পুত্র, কখনও বা প্রশুশ্রুকের পুত্র। সুতরাং রামসীতার বিবাহ বাসরে বৈবাহিক রীতি অনুসারে উভয় পক্ষের যে বংশ-পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল, আলোচনায় সেই বংশানুক্রম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়; কারণ বিবাহ একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। তাছাড়া রামসীতার বিবাহকে ভিত্তি করে

রামায়ণের কৃষিস্বরূপ চিত্রটি সহজবোধ্য হয়। আসরে ইক্ষ্বাকু বংশের বিস্তারিত তালিকা পেশ করেন কুলগুরু বসিষ্ঠ। আর জনকবংশের উল্লেখ করেন সীতার পিতা সীরধ্বজ স্বয়ং।

ইক্ষ্বাকু বংশের তালিকা হল :— ১। ইক্ষ্বাকু ২। কুক্ষি ৩। বিকুক্ষি ৪। বাণ ৫। অনরণ্য ৬। পৃথু ৭। ত্রিশংকু ৮। ধুন্ধুমার ৯। যুবনাশ্ব ১০। মান্ধাতা ১১। সুসন্ধি ১২। ধ্রুবসন্ধি (এ'র এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম প্রসেনজিৎ) ১৩। ভরত ১৪। অসিত ১৫। সগর ১৬। অসমঞ্জ ১৭। অংশুমান ১৮। দিলীপ ১৯। ভগীরথ ২০। ককুৎস্থ ২১। রঘু ২২। কল্মাষপাদ ১৩। শঙ্খণ ২৪। সুদর্শন ২৫। অগ্নিবর্ণ ২৬। শীঘ্রগ ২৭। মরু ২৮। প্রশুশ্রুক ২৯। অম্বরীষ ৩০। নহুষ ৩১। যযাতি ৩২। নাভাগ ৩৩। অজ ৩৪। দশরথ ৩৫। রাম এবং লক্ষ্মণ। লক্ষণীয় যে এক্ষেত্রে ভরত ও শত্রুঘ্নর কোন উল্লেখ নাই।[১]

ইক্ষ্বাকুর জন্মদাতা মনু, মনুর পিতা সূর্য। সূর্যকে উৎপন্ন করেন কশ্যপ। কশ্যপের পিতা মরীচি হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা স্বয়ং নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত; তিনি মায়াসমন্বিত পরব্রহ্ম হতে উদ্ভূত। অতএব ব্রহ্ম হতে রাম পর্যন্ত মোট একচল্লিশ জনের নাম পাওয়া যায়। এ'দের অনেকের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। উপরন্তু অনেক নামের সঙ্গে নানা পুরাণে নানা কাহিনী জড়িয়ে আছে, যেগুলোর সঙ্গে এই তালিকার সামঞ্জস্য নাই। যেমন যযাতির কাহিনী; শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে নিয়ে। সেখানে নাভাগর প্রসঙ্গ নাই; হরিশচন্দ্র ও তার পুত্র রোহিতাশ্ব এই তালিকায় বাদ পড়েছে। সুতরাং এই তালিকায় প্রদত্ত নামগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কালে অনেক নামের সঙ্গে জড়িত বহুল প্রচলিত কাহিনী প্রয়োজনবোধে বর্জন করতে হবে। কারণ সেসব কাহিনীর মূল অন্যত্র, হয়ত একই নামের অন্য ব্যক্তি বিশেষের অথবা স্বতন্ত্র তথ্যের রূপক হতে পারে। পরবর্তীকালে নামসাদৃশ্য হেতু একটি সত্তার কাহিনী হয়ে উঠেছে।

দেখা যায় এই বংশ ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত। সুতরাং এই বংশ তালিকায় মহাকাশ বিজ্ঞান তথা সৃষ্টির রহস্য জড়িয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সৃষ্টির এই ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটল প্রথমে দেখে নিলে সুবিধা হবে।

মহাকাশের কোটি কোটি তারাজগতের একটিকে নাম দেওয়া হয়েছে

ছায়াপথ। এই ছায়াপথের প্রায় দশ পনের হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি নগন্য নক্ষত্র আমাদের প্রাণদায়ী মহান সূর্য।. কোটি কোটি বছর আগে এই সূর্যর দেহ হতে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে কালক্রমে সৌরজগতের গ্রহ-সমুহের সৃষ্টি। এই গ্রহগুলির তৃতীয়টি আমাদের জীবনধাত্রী পৃথিবী। বিজ্ঞান বলছে মহাকাশের যেখানে গ্রহ নক্ষত্র কিছুই নাই, নাই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কোন বস্তু, সেই নিরবিচ্ছিন্ন মহাশূন্যের ঘোর তমিস্রা ভেদ করে অজ্ঞাত-অস্তিত্ব কোন উৎস হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটি যুগ্মরশ্মি। এই যুগ্মরশ্মি তার চলার পথে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৃষ্টি করছে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কণিকা। কল্পনা করা যায় না এমন দুরন্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে সেই কণিকা ও রশ্মির সংঘর্ষে উদ্ভূত হচ্ছে পরমাণুর সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বস্তু যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে হতে মহাকাশের তারাজগতে রূপায়িত হয়েছে। কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্রপুষ্ট একটি তারাজগতে অহরহ চলছে নক্ষত্রের সৃষ্টি, নক্ষত্রের স্থিতি এবং নক্ষত্রের মৃত্যু। এই ত্রিদশা-সমন্বিত তারাজগতের বর্তমানে প্রায় স্থিতাবস্থা প্রকৃতির একটি নক্ষত্র হল সূর্য—যে সূর্য নয়টি গ্রহের সাহচর্যে সৃষ্টি করেছে নিজস্ব সৌরজগৎ।

যে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর মানুষ চাঁদ জয় করে অন্য গ্রহে পদার্পণের চেষ্টা করছে, সেই পৃথিবী তার আবির্ভাবের ঊষালগ্নে ছিল বিপুল বিস্তৃত অনিলপুঞ্জ মাত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে সেই অনিলপুঞ্জ একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছিল, যে ঘুর্ণনকে আজকের বিজ্ঞানে বলা হয় বার্ষিক গতি। এই বার্ষিক গতি ছাড়াও সেই অনিলপুঞ্জর নিজস্ব অক্ষোপরি একটা গতি সৃষ্টি হয়েছিল. যার আজকের পরিভাষা 'আহ্নিক গতি'। সেই অনিলপুঞ্জেই আজকের পৃথিবীর সকল কার্যকারণ বর্তমান ছিল। ঘুর্ণির ফলে অনিল-পুঞ্জটি ঘনীভূত হতে হতে তাপ বিকীরণ শুরু করে। ঘনীভবন এবং তাপ হ্রাস হেতু আলোক-সমন্বিত অনিলপুঞ্জতে সূক্ষ্মাণুগুলির পরমাণু ও অণু এবং বস্তু পর্যায়ে রূপান্তর আরম্ভ হয়। সৃষ্ট সকল বস্তুই অনিলপুঞ্জর আহ্নিক গতির রীতিতে সংক্রামিত হয়ে একই রীতিতে পশ্চিম হতে পূর্বে ঘুর্ণিত হতে থাকে। নির্দিষ্ট রীতি ও ক্রমে বাঁধা বস্তুগুলি অনিলপুঞ্জটির মেরুদণ্ডকে (মেরু-রেখা বা অক্ষরেখা) কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে নিরাকার হতে সাকার অবস্থার দিকে এগিয়ে চলে। বহু কোটি বছর ধরে এই রূপান্তরের ফলে অনিলপুঞ্জটি বর্তুলাকার ধারণ করে, উপরিভাগটিও কঠিনীভূত হয়। রূপান্তরিত সেই অনিলপুঞ্জ, যা আমাদের আদিম পৃথিবী, তখনও তাপবিকীরণ ও দেহসংকোচন করে চলেছে : এখনও করছে। বস্তু বা পদার্থর পরমাণুগুলি সংযোজিত হয়ে

বিভিন্ন মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ তারতম্য অনুসারে কোনটা কঠিন, কোনটা তরল আবার কোনটা অনিল অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। এমনিভাবেই একদিন পৃথিবীপৃষ্ঠের কোথাও অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী, কোথাও সুগভীর খাদ সৃষ্টি হল। সৃষ্টি হল হিমবাহ, অন্তরীক্ষের জল-অণুগুলি আকস্মিক তাপহ্রাসে সরাসরি কঠিনতা লাভ করল। সূর্যদেহ হতে বিচ্ছুরিত কণিকাস্রোত এবং মহাজাগতিক রশ্মিগুলির পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ায় বাধা সৃষ্টি করে উদ্ভূত হল হাইড্রোজেন বলয়, চৌম্বক রশ্মিজাল, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুস্থ অধিকর্ষ। সৃষ্ট হল আবহমণ্ডল, আবির্ভাব ঘটল মেঘের, মেঘ হতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় জলে পূর্ণ হল সুগভীর খাদগুলি, দুরন্ত বেগে শিলাময় পাহাড় হতে নামল জলধারা, মহাসমুদ্র স্থায়ী আসন পাতল পৃথিবীর বুকে। জলের ঘর্ষণে আবহমণ্ডলের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় তাপ-তারতম্য প্রভৃতি বিভিন্ন যোগাযোগে জন্ম নিল মৃত্তিকা। এত সব পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে দেহসংকোচনের দরুণ বার বার ভূপৃষ্ঠের চেহারার বদল হল। এসব ঘটনার কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে অথবা সবই একসঙ্গে কিনা বলা শক্ত।

সেই দ্রুত পরিবর্তনশীল জড় পৃথিবীর মহাসমুদ্রে একদিন প্রাণের স্পন্দন জাগল ; আদি প্রাণের আবির্ভাব ঘটল, বিজ্ঞান পরিভাষায় যার নাম প্রটোপ্লাজম (প্রাণকোষ)। মোটামুটি ছয়টি জড় উপাদানে গঠিত প্রটোপ্লাজম নিজ দেহকে বহুধা বিভক্ত করে নিমেষে মহাসমুদ্রে দুধের সর পড়ার মত বিস্তৃত হয়ে গেল। তার পর একদিন, জল ও বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত উপাদান-গুলিতে তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটবে না বুঝতে পেরেই হয়ত প্রটোপ্লাজম এক নতুন পথ ধরল, যা হল সালোকসংশ্লেষের (Photo Synthesis) দ্বারা সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেহ ধারণ। আবির্ভাব ঘটল 'ক্লোরোফিল' এর, উদ্ভিদজগতের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ভু-পৃষ্ঠের জলে স্থলে শুরু হল উদ্ভিদের রাজত্ব। পাশাপাশি আবির্ভূত হল প্রাণী ; জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী এবং সকলের শেষ ধাপে চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীব,—মানুষ। সেও আজ লক্ষ কোটি বছর আগেকার কথা। আদিম মানুষ পশুসংসর্গ ছেড়ে আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য পাথরের হাতিয়ার বানাতে শিখল। দল বাঁধল, দল বেঁধে আদিম পৃথিবীর বুকে বিচরণ শুরু করল এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত। অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদের সেই প্রব্রজ্যা প্রবৃত্তি বুঝিবা আজও মানুষের রক্তে মিশে আছে। ধীরে ধীরে মানুষ বুদ্ধির গোড়ায়

শান দিয়ে কুঠারের সঙ্গে ধনুক তুলে নিল, বনের পশু হত্যা না করে পোষ মানিয়ে পশু প্রজননের সূত্র ধরে অল্প আয়াসে আহার সংস্থানের ব্যবস্থা করল। আরেকটু এগিয়ে নিছক প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করে না থেকে ফসল ফলানোর কৌশল আয়ত্ব করে নিয়ে মানুষ জন্তু পর্যায় হতে সম্পূর্ণ নিজের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করল। ঘর বাঁধল, পরিবারের বন্ধন মানল, সমাজ গড়ে তুলল।

স্থূলভাবে এই হল মহাশূন্য হতে পৃথিবী এবং পৃথিবীর বুকে মানব সমাজ গড়ে ওঠার কাহিনী। এই বক্তব্যের বহু তথ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে নানা ধরণের মতবাদ আছে। এখানে শুধু একটা মোটামুটি কাঠামো তুলে ধরা হল ইক্ষ্বাকু বংশের বিশ্লেষণের পটভূমিকা হিসাবে। আদিমকাল হতে মানুষ সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে প্রাচীন ধ্যান-ধারণারও রদবদল ঘটেছে। সুতরাং আজকের সৃষ্টি-তত্ত্বের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে অমিল হলেও রামায়ণের কালের মানুষের এ সম্পর্কে নিজস্ব একটি কল্পনা নিশ্চয়ই ছিল। এই আলোচনাও সেকারণে যুক্তি দিয়ে সেই কল্পনার তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিটি ধাপের একটা করে নাম দিলে কেমন হয়?

যেমন যুগ্মরশ্মি এবং তারাজগৎ সৃষ্টির মধ্য পর্যায়ে পরবর্তী সৃজনের কার্যকারণতাকে বলা যেতে পারে ব্রহ্মা, কেননা সেই পর্যায় নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত, অথচ মায়া-সমন্বিত পরব্রহ্ম; অর্থাৎ যুগ্মরশ্মি হতে উদ্ভূত। এই ব্রহ্মা হতে তারাজগৎ, যার নাম মরীচি; বর্তমানকালে এমন একটি তারা-জগৎকে বলা হয় ছায়াপথ (Milky way)।

মরীচি—মৃ (নাশ করা)+ঈচ অপাতনে, যে (অন্ধকার) নাশ করে; কিরণ।

তারাজগৎ বস্তু-সমন্বিত আলোকরশ্মি ছাড়া আর কি?

তারাজগতের বিশেষ একটি অংশে প্রায়-স্থায়িত্ব-সম্পন্ন একটি নক্ষত্র আছে যার নাম সূর্য। সুতরাং সূর্য তারাজগতের যে বিশেষ অংশ হতে সৃষ্ট সেই অংশের নাম কশ্যপ। কশ্যপ,—কশ্ (শব্দ করা)+য (কর্মে) = কশ্য— পা (পান করা)+ড কর্তৃ। কশ্য অর্থে মদ্য ধরে শব্দটিতে বুঝান হয়েছে যে, যিনি মদ্যপান করেন। শব্দময় এই অর্থও করা চলে। মহাশূন্য শব্দহীন নয়, সুতরাং যেখানে নক্ষত্র সৃজন হচ্ছে সেই শব্দময় স্থানের নাম

কশ্যপ।

তারাজগতের 'কশ্যপ' স্থানের একটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য।

সূর্যর পুত্র মনু। মন্ (জ্ঞান, মনন, পূজা, গর্ব, সম্ভাবন, ধারণ, মান) + উ কর্তৃ। মনু শব্দটিতে মূলতঃ বুঝানো হয়েছে যে পরবর্তীকালে প্রাণের যে বিকাশ হবে, সূর্যদেহে সেরকম মনন বা ক্রিয়ার সবেমাত্র উন্মেষ ঘটছে।

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। শব্দটি ইষ্ (ইচ্ছা, গমন, পুনঃ পুনঃ করণ) ধাতু নিস্পন্ন। সুতরাং ইক্ষ্বাকু অর্থে সূর্যদেহ হতে ভবিষ্যত গ্রহের বিচ্যুতির কারণে পুনঃ পুনঃ স্পন্দন অবস্থা।

ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি। অর্থ হল জঠর, অভ্যন্তর। অর্থাৎ, স্পন্দনের নির্দিষ্ট রূপ।

এরপর বিকুক্ষি। কাহিনী অনুসারে এঁকে ইক্ষ্বাকু বিসর্জন দেন। বি (নাই) কুক্ষি (জঠর, মধ্য, অভ্যন্তর) (মধ্যে)। বিকুক্ষি শব্দে বুঝানো হয়েছে যে ইক্ষ্বাকু অর্থাৎ স্পন্দনের বিচ্যুতি। মাতৃগর্ভে শিশুর ভ্রূণ ভিন্নদেহী হলেও মাতৃদেহে সংলগ্ন থাকে, এই গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব যেমন মাতা আপন সত্তা জেনেও ভ্রূণের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে, অথচ ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার দেহেরই একটা অংশ হিসাবে লীন হয়ে থাকে এমত অবস্থাকে বিকুক্ষি পর্যায় বলা যায়। যথা সময়ে মাতা সন্তান প্রসব করে অর্থাৎ আপনাকে যথাযথ ঠিক রেখে আপন দেহজাত একাংশকে বিসর্জন দেয়।

বিসর্জনের পর সন্তানের স্বাতন্ত্র্য পরিচয়, তখন নাম হল বাণ। বন্ (শব্দ করা, গমণ করা, ব্যপ্ত হওয়া) ধাতু নিস্পন্ন বাণ শব্দের অর্থ শর, তীর, অগ্নি, আগুনের আঁচ, শব্দ, ধ্বনি, বন্যা প্রভৃতি। সুতরাং সূর্যদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বিরাট শব্দময় রশ্মি-সমন্বিত অবস্থাকে বাণ বলা হয়েছে।

বাণের পর অনরণ্য। ন (নাই) অরণ্য (বন, নিবিড়, ঘন) যার। অঘন তেজোময় বিরাট এক অনিলপুঞ্জ সূর্যদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘূর্ণিত হচ্ছে। সেই বিশাল বিস্তৃত স্থূল মহৎ অনিলপুঞ্জ, পরবর্তীকালে যা পৃথিবী নামক গ্রহে পরিচিত হয়, তার নাম পৃথু। পৃথুর কাহিনীতে আছে এঁর স্ত্রীর নাম অর্চি. ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং লোকহিতার্থে গোরূপা ধরিত্রীকে দোহন করেছিলেন। মর্তে ইনি প্রথম রাজা এবং এঁর নামানুসারে ধরার নাম পৃথ্বী। অর্চি অর্থ কিরণ। অশ্বমেধ যজ্ঞ অর্থ রশ্মি বিচ্ছুরণ গোরূপা ধরিত্রী অনিলপুঞ্জ-ময় অতীত পৃথিবী। মর্তে প্রথম রাজা অর্থে অনিলপুঞ্জটির আপন কক্ষপথে স্বতন্ত্র বিচরণ।

অতএব কাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত অর্থ দাঁড়ায় সূর্যদেহে প্রথম স্পন্দনের নাম মনু। স্পন্দনের তীব্রতা বাড়লে ইক্ষ্বাকু। সূর্যদেহের চারিদিকে একটি বলয়ের আবির্ভাব ঘটলে কুক্ষি। বলয়টি মূল দেহ হতে বিচ্যুত হলে বিকুক্ষি। বিচ্যুত বলয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাব ধারণ করলে বাণ। স্বতন্ত্র বলয়টির অঘনীভূত অবস্থা অনরণ্য। বলয়টি রূপান্তরিত হয়ে পিণ্ডাকার ধারণ করলে পৃথু। এই আদিম পিণ্ডটি প্রথম হতেই সূর্যকে কেন্দ্র করে আপন কক্ষপথে রশ্মি বিচ্ছুরণ করতে করতে আবর্তিত হতে লাগল।

এরপর ত্রিশংকু। এঁর সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বিখ্যাত কাহিনীটি এই আলোচনার অন্তর্গত হবে না। কেন না সেই ত্রিশংকু হরিশ্চন্দ্রর পিতা। যদিও বিশ্বামিত্রর ক্ষমতার বিবরণ কালে এই কাহিনীর অবতারণা হয়েছে, কিন্তু সেখানে হরিশচন্দ্রর উল্লেখ নাই। এজন্য ত্রিশংকুকে এই পর্যায়ে অন্য দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করতে হবে।

ত্রিশংকু—ত্রি (তিন) শংকু (শঙ্ক, ভয়, ত্রাস) যাহার। শংকু শব্দটি শনক্ (ভয় সংশয়) ধাতু নিষ্পন্ন। পৃথু নামক অনিলপুঞ্জটিতে তিন ধরণের ক্রিয়া শুরু হল; যেমন আবর্তন বা গতি, তাপ বিকীরণ এবং দেহ-সংকোচন। যেন ভয় হতে এইগুলির উদ্ভব, তাই নাম হল ত্রিশংকু।

এবার ধুন্ধুমার। অপর নাম কুবলয়াশ্ব বা কুবলাশ্ব। ধুন্ধ অর্থ ধূম বা ধোঁয়া। ধুন্ধুমার অর্থ সোরগোল, কোলাহল, হৈ চৈ। কুবলয়াশ্ব,—কুবলয় (কু অর্থাৎ পৃথিবীর বলয়রূপ বা পদ্ম) + অশ্ব (রশ্মি)। ত্রিশংকু অবস্থার অনিলপুঞ্জটির আকৃতি যখন পদ্মফুলের মত, রশ্মি বিচ্ছুরণ তখন পাঁপড়ি সদৃশ। অথবা রশ্মি ও কণিকার অর্থাৎ ধোঁয়ার বলয়-সমন্বিত। এই ধোঁয়া বা রশ্মি পদার্থে পরিণত হওয়ায় আগামী দিনের পৃথিবীর আবির্ভাব। সুতরাং ধুন্ধুমার।

এরপরে যুবনাশ্ব। যুবন (তারুণ্য) + অশ্ব (রশ্মি)। ধূম্রাচ্ছাদিত অনিলপুঞ্জটি তখন জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করেছে।

তারপর মান্ধাতা। বিখ্যাত মান্ধাতা পিতা যুবনাশ্বর বামপার্শ্বদেশ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। মান্ধাতার প্রচলিত কাহিনী এখানে গ্রহণ করা হবে না, কারণ সেই কাহিনীর মান্ধাতার পুত্রের নাম মুচুকুন্দ। বশিষ্ঠ প্রদত্ত বংশ তালিকানুসারে মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি।

মান্ধাতা—মাম্ (আমাকে)—ধে (পান করা) + তৃন্ কর্তৃ। অথবা, মাম্ (আমাকে) ধাতা (ধারক, নির্মাণকর্তা)।

ঘূর্ণন, তাপ বিচ্ছুরণ এবং দেহসংকোচন দরুণ জ্যোতির্ময় অনিলপুঞ্জটির পৃষ্ঠদেশ কঠিনতা লাভ করতে আরম্ভ করে ; কারণ তখন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের অণুগুলির অবস্থান্তর ঘটতে শুরু করেছে। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে। অনিল, তরল ও কঠিন পদার্থ সমন্বিত 'যুবনাশ্ব' পিণ্ডটির আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতির কারণে গতিধর্ম অনুসারে ভারী বস্তুগুলি প্রথমতঃ বামদিকে জমা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীর উভয় গতি পশ্চিম হতে পূর্বে। তারপর ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কাঠিন্যের পাশাপাশি রয়েছে তরল পদার্থ, যা পৃথিবীর কঠিন পিঠের নিম্নাংশকে আবৃত করে রেখেছে। যত কেন্দ্রবিন্দুর দিকে যাওয়া যায় বস্তু সকল সেখানে অনিল অবস্থায়। পিণ্ডাকার পৃথিবীর এই অবস্থান্তর প্রকাশের কারণে মান্ধাতার বামপার্শ্বদেশ হতে জন্ম। পৃথিবীর আদিমতম অবস্থার নাম মান্ধাতা হওয়ায়, প্রাচীনকাল বলতে বলা হয় 'মান্ধাতার আমল'।

তিন অবস্থাপ্রাপ্ত পদার্থময় পৃথিবীতে যে সহাবস্থান অবস্থা চলেছে, সেই পর্যায়ের নাম সুসন্ধি। সু (উৎকৃষ্ট) সন্ধি (মিলন) যাহাতে। সুসন্ধি সংজ্ঞায় পৃথিবীর দুই প্রকার আবর্তন, তাপহ্রাস এবং দেহসংকোচন মধ্যে যে সামঞ্জস্য ঘটেছে তাই বুঝানো হয়েছে।

সুসন্ধির পরে ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুব অর্থ স্থির, অপরিবর্তনীয়। ত্রিস্তরের পদার্থময় পৃথিবীর আকৃতি এবং প্রকৃতির পরিবর্তন হেতু বার্ষিকগতি ও আহ্নিকগতির প্রতিনিয়ত যে তারতম্য ঘটছিল তা এখন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ও কক্ষপথে সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই ধ্রুবসন্ধি পর্যায়ে পৃথিবীদেহ হতে কিছু অংশ বিচ্যুত হয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভ করে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে থেকে নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হতে থাকে। এই নবসৃষ্ট বস্তুটি প্রসেনজিৎ তথা চন্দ্র উপগ্রহ। প্রসেন শব্দে পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে, তাকে জয় করেই যেন চন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য।

ধ্রুবসন্ধির ভাই প্রসেনজিৎ। প্রসেন (প্রকৃষ্ট সেনা যার) তাহাকে যিনি জয় করেন। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রের সৃষ্টি কিভাবে তা এখনও স্থিরিকৃত হয়নি। হয়ত আদিমতম কোনও এক কালে কোন ধূমকেতুর আকর্ষণে পৃথিবীর সামান্য অংশ বিচ্যুত হয়ে এই উপগ্রহের সৃষ্টি। রামায়ণের কালে এ নিয়ে কোন কল্পনা থাকা বিচিত্র নয়।

তারপরের আবির্ভাব ভরত। ভৃ (পোষণ, ধারণ, ভর্জন, ভৎর্সনা)

ধাতু নিষ্পন্ন। অর্থ তন্তুবায়, ক্ষেত্র। শব্দটির বানান 'ভরৎ' ধরলে অর্থ হয় ধারণকারী। এই অবস্থায় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেহ কাঠিন্য হেতু উচ্চাবচ আকার ধারণ করেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের ত্রিস্তর-পদার্থের সংঘট্টে যৌগিক পদার্থসমূহের আবির্ভাবের দরুণ বায়বীয় তথা অনিল মণ্ডলর সৃষ্টি। বিভিন্ন অনিল পদার্থে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ যখন ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে প্রায়-অন্ধকার, তখন নাম হল অসিত। ন (নাই) সিত (শ্বেত) অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ, আলোহীন, মেঘাচ্ছন্ন।

পৃথিবীর এই অসিত পর্যায়ের পরের অবস্থাকে বলা হয়েছে সগর। গর (বিষ, বৈপরীত্য)এর সঙ্গে বর্তমান। ইনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বিমাতা গর্ভ নষ্ট করার জন্য বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি গরলসহ ভূমিষ্ট হন। সগর সম্পর্কে এই কাহিনী ছাড়াও আরেকটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে এঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র চুরি করে নিয়ে গিয়ে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে রেখে এসেছিলেন। এই কপিল মুনির ক্রোধে সগরের শতপুত্র ভস্মীভূত হয়। পৃথিবীর জড় রাজত্বে প্রাণের আবির্ভাব নিশ্চয়ই বিপরীত-ধর্মী। অপরদিকে প্রাণের ক্ষেত্রে বিষ-তুল্য পরিবেশে আদি প্রাণের আগমন গরলসহ ভূমিষ্ট হওয়ার সামিল। কপিল শব্দের একটি অর্থ অগ্নি। অন্তরীক্ষের (ইন্দ্র) তেজ ভূমণ্ডলে অগ্নি নামে খ্যাত। অঙ্গার, উদ্‌যান, যবক্ষারজান, অম্লজান, গন্ধক আর যে কোন একটি উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট প্রাণকোষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোষটির কেন্দ্রবিন্দু—যা তেজ বা অগ্নি-সমন্বিত। এই প্রাণকোষ হয়ত অনিল পদার্থর মত বায়বীয় মণ্ডল অথবা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। তরল জলের অভাবে প্রাণকোষের বিস্তার ঘটে না। প্রসঙ্গটি সহজবোধ্য করার জন্য বলা যায় বাতাসে অবস্থিত এক প্রকার বিশেষ জীবাণু দুধের মত উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সেই দুধে বংশবিস্তার করে দুধকে দই-এ রূপান্তরিত করে। প্রাণ-কোষের ক্ষেত্রেও অতীতে এই রকম ধারণা পোষণ করা বিচিত্র নয়।

কপিল শব্দের আর একটি অর্থ কুক্কুর।

কুক্কুর—কুক্ (কুক্ষি, উদর) কুর (শব্দ)। অর্থাৎ পৃথিবীর উদরে (অভ্যন্তরে) যে শব্দশক্তি (স্পন্দন বা তরঙ্গশক্তি) ভাবার্থে মাধ্যাকর্ষণ, যা সকল বস্তুকে পৃথিবীর দিকে টানে।

ফলে বস্তুর পলায়ন-প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় পৃথিবীতে তাদের নানা রূপান্তর। এই রূপান্তর বা বন্ধনকে রূপকে বলা হয়েছে কপিলক্রোধে শত-

পুত্র ভস্মীভূত। এখানে ভস্মীভূত অর্থে রূপান্তরিত ধরতে হয়।

পৃথিবীর এই অবস্থার কালে অতি প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন (উদ্‌যান) অণুর নিঃসরণ শুরু হয়েছিল, এই ক্রিয়াকে বলা হয়েছে সগর তার পুত্র অসমঞ্জকে উচ্ছৃংঙ্খলতার জন্য ত্যাগ করেন। অসমঞ্জ অর্থ অসদৃশ, অসংগত, অনুপযুক্ত। এই নিঃসরিত হাইড্রোজেনকে ধরে রাখতে না পারলে পৃথিবীতে কোনদিন প্রাণের আবির্ভাব ঘটত না। পৃথিবীর উর্ধ্বমহলে অন্তরীক্ষে হাইড্রোজেন বলয় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য।

তাই অসমঞ্জর চেয়ে তার পুত্র অংশুমানের প্রাধান্য বেশী। অংশুমান অর্থ কিরণ বিশিষ্ট, প্রভাবশালী। মাধ্যাকর্ষণ তার ছড়িয়ে দেওয়া অদৃশ্য কিরণে সকল বস্তুকে পৃথিবী অভিমুখে ধরে রেখেছে।

এই সঙ্গে আরও একটি ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, তা হল চুম্বক-রশ্মিজাল, যা সূর্যদেহজাত প্রোটিন-কণিকা-স্রোত প্রভৃতিকে সরাসরি পৃথিবী-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়তে বাধার সৃষ্টি করল। এই চুম্বক-রশ্মি পৃথিবীর অভ্যন্তর হতে যেমন বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তেমনি মহাজাগতিক রশ্মিগুলিকেও বহুলাংশে শোষণ করে নিচ্ছে। তাই পৃথিবীর এই অবস্থার নাম দিলীপ ; শব্দটি দল্‌ (ভেদ, বিকাশ পাওয়া) ধাতু নিষ্পন্ন।

দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগ শব্দের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, শক্তি, যোনি প্রভৃতি বহু অর্থ। ইনি শৈশবে মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন। অষ্টবক্র মুনির বরে উত্তমাঙ্গ হন। কপিলের শাপে ভস্মীভূত পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধারার্থে গোকর্ণ তীর্থে বহুকাল তপস্যা করে গঙ্গাকে ভূমণ্ডলে এনেছিলেন। এই পর্যায়ে 'দিলীপ' নামক পৃথিবীর আবহমণ্ডলে জলের সঞ্চার।

গোকর্ণ,—গো (রশ্মি), + কর্ণ (প্রসারতা) ; অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, যেখানে জলকণা অণু অবস্থায় বিদ্যমান। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের মূলে জল, সুতরাং অন্তরীক্ষের জল-অণু আগামী দিনে যে ঐশ্বর্য নিয়ে এল তাই ভগীরথ। কাহিনীতে গঙ্গা জলের প্রতীক।

সঞ্চারমান বিশাল মেঘপুঞ্জকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের ককুদ। বজ্র বিদ্যুতের সংঘর্ষে মেঘ হতে বৃষ্টি ঝরে। তাই বলা হল ককুৎস্থ। এর অন্য নাম পুরঞ্জয়। ইনি বিষ্ণুর পরামর্শে মহাবৃষভরূপী ইন্দ্রর ককুদে চেপে যুদ্ধে অসুর দমন করেন। সেজন্য নাম হয় ককুৎস্থ। অর্থাৎ, জলকণাময় বিস্তৃত-দেহী মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ সংযোগে যে রূপান্তর ; বৃষ্টিপাতের পূর্বাবস্থা। সূর্য (ইন্দ্র) বৃষরাশিতে সঞ্চরণকালে নভঃ-মণ্ডলে মেঘের আবির্ভাব হত ঋগ্বেদ-

কালে। পুরঞ্জয় ; পুর (দেহ, নগর) বা পুর (প্রবাহ, জলরাশি)—জি (জয় করা) খশ্ কর্তৃ।

ককুৎস্থর পুত্র রঘু। রঘ্ (গমন করা) + কু (পৃথিবী) কর্তৃ,। অন্তরীক্ষের মেঘ হতে পৃথিবীর বুকে বারিধারা নেমে এল। কঠিন নিষ্প্রাণ পৃথিবী-পৃষ্ঠের খাদগুলিতে জল জমে মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হল. অন্য দিকে তাপহ্রাস-জনিত আকস্মিক পরিবর্তনে জল অণু হতে সরাসরি পর্বতচূড়ায় হিমবাহরও সৃষ্টি। এই অবস্থার নাম কল্মাষপাদ। অর্থ অগ্নি বিশেষ. শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত। কল্মষ—কল্ গমন করা) ক্বিপ্ কর্তৃ = কল (যে গমন করে)। মস্ (হানি করা) + অ—কর্তৃ = মাস (যে অন্যকে নষ্ট করে)। সুতরাং তেজ বা অগ্নির রূপান্তর বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ সংস্পর্শে মেঘ বিদারণ হেতু চরাচরে জলবর্ষণ। অপরদিকে হিমবাহর মধ্যে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। এজন্য বলা হয়েছে অগ্নিবিশেষ. কল্মাষপাদ। তাপ সৃষ্টি হয় বলেই হিমবাহ বিগলিত জলধারা নদীতে রূপান্তরিত হয় ; যেমন গঙ্গানদীর উৎস গোমুখী।

কল্মাষপাদের পর শঙ্খণ। শব্দটি শম্ (শান্তভাব, দমন, উপশম, নিবৃত্তি) ধাতু নিষ্পন্ন। হিমবাহ হতে উদ্ভূত জলীয় বাষ্পর দরুণ পৃথিবীর যে রূপ তাকেই বলা হয়েছে শঙ্খণ। রৌদ্রতেজে হিমবাহ হতে যে বাষ্প উর্ধ্বে উঠে যায়, তার নীচের দিকটা শঙ্খর মতই সরু ও পেটমোটা এবং দক্ষিণ বা বামাবর্তে সেই বাষ্পের উর্ধ্বগতি। অথবা, বলা যায় যে, মেঘমণ্ডলে তখন ঘন ঘন বজ্রধ্বনি উঠছিল, সেই শব্দময় পৃথিবী চিহ্নিত হয়েছে 'শঙ্খণ' নামে।

অন্তরীক্ষের মেঘসঞ্চার, হিমবাহ ও তদুদ্ভূত শঙ্খাকার বাষ্প এবং শিলাময় ভূখণ্ডে পৃথিবী তখন অপরূপা। সুতরাং এই পর্যায়ের নামকরণ হয়েছে সুদর্শন।

এই সুদর্শন-পৃথিবীর উপর সূর্যর আলো পতিত হয়ে যে শোভা ধারণ করেছে তার নাম অগ্নিবর্ণ।

পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে উচ্চভাগ হতে নিম্নভাগে নেমে আসা জলস্রোতের সঙ্গে অন্তরীক্ষ হতে আদি প্রাণকোষ পৃথিবীর মহাসমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে ত্বরিৎ গতিতে যে বংশ-বিস্তার করল, 'শীঘ্রগ' শব্দে সেই ক্রিয়া বুঝান হয়েছে।

জলস্রোতে পাহাড়ের ধ্বস ভেঙ্গে পাথর গুঁড়িয়ে জলবায়ুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার জন্ম হলেও পৃথিবী তখনও উদ্ভিদহীন, তথা প্রাণহীন।

সুতরাং বলা হয়েছে মনু।

এরপরে প্রশুশ্রুক। প্র (প্রকৃষ্ট) শুশ্রু (শ্রোতা) যে। শুশ্রু শব্দটি শ্রু (শ্রবণ, গতি) ধাতু নিষ্পন্ন। মহাসমুদ্রে যে প্রাণকোষ (প্রটোপ্লাজম) সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রাণ এখন বংশ বিস্তারের উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে মহাসমুদ্রে এবং জল-সিক্ত স্থলে শৈবাল-এর সৃষ্টি করল। শৈবাল (Algae)এর নাম দেওয়া হয়েছে প্রশুশ্রুক।

শৈবাল এবং মস্ (Bryophyta) পর্যায়ের মাঝে ছত্রাক (Fungus)। ক্লোরোফিল-সৃজন-শক্তিহীন বস্তুটির আকার গোলাকার বা ছাতার মত। 'ছত্রাক' পর্যায়ের নাম অম্বরীষ। অর্থ অন্তরীক্ষ, ভর্জনপাত্র, নরক বিশেষ। ভাজনাখোলা শব্দময় (যার বৃদ্ধি বা গতি আছে তাই শব্দময়) এবং ছাতার আকার। অপরদিকে জল হতে উৎপন্ন অর্থে নরক ধরলে ছত্রাকের সৃষ্টি-কর্তা প্রাণকোষ জল হতে উদ্ভূত। তৃতীয়তঃ, ছত্রাকে যে জীবাণু থাকে সেটির আদি বিচরণক্ষেত্র অন্তরীক্ষ।

এবার নহুষ। শব্দটি নহ্ (বন্ধন) ধাতু নিষ্পন্ন। নহুষের ত্রৈলোক্যর রাজা হওয়া এবং অগস্ত্য মুনির শাপে অজগররূপ ধারণ করা, এই উপাখ্যানটি চন্দ্র বংশীয় আয়ুর পুত্র নহুষের ধরে নিয়ে এই আলোচনায় টানা হল না, যেমনটি বাদ দেওয়া হয়েছে অম্বরীষ-শুনঃশেফ কাহিনী। নহুষ হল মস্ পর্যায়। পাকাবাড়ীর ছাদের কার্নিশে মখমলের মত নরম সবুজ ঘন সন্নিবিষ্ট শেওলা জাতীয় যে উদ্ভিদ দেখা যায় তাকে মস্ বলে। ঘন সন্নিবেশের দরুণ নহ্ ধাতুজ 'নহুষ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

নহুষের পুত্র যযাতি। য (বায়ু)—যা (যাওয়া) + তি কর্তৃ ; অর্থাৎ, যা বায়ুতে গমন করে।

মস্ পর্যন্ত উদ্ভিদের বিস্তার আছে, কিন্তু উচ্চতা নাই, অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে বৃদ্ধি পেয়ে বায়ুমণ্ডল আবৃত করে না।

কিন্তু মস্ এর পর ফার্ণ (Pteridophyta) জাতীয় উদ্ভিদ উচ্চতায় তালগাছের মতও হয়। আদিম পৃথিবীর ফার্ণ হয়ত আরও বড় ছিল। ছোট বা বড় যাইহোক ফার্ণ প্রথম বায়ুতে গমন করল।

যযাতি-দেবযানি-শর্মিষ্ঠার একটি সুন্দর গল্প আছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু যেহেতু সেই যযাতির পুত্র হিসাবে নাভাগর নাম উল্লেখ নাই, সে কারণে ঐ কাহিনী আলোচনার গণ্য হল না।

ফার্ণ এর পরের ধাপে পাইন (Gymnosperm) অনাবৃতবীজ উদ্ভিদ।

এই পর্যায়ে প্রথম উদ্ভিদজগতে বীজের আবির্ভাব ঘটে। এই বীজের কোন আবরণ নেই, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। বাতাস এবং কীটপতঙ্গ দ্বারা স্ত্রী পুরুষ সম্মেলনে বীজের প্রজনন ক্ষমতা সৃষ্ট হয়। বীজ পাকার পর ঝরে পড়ে গাছ হয়। এই প্রসঙ্গে শৈবাল ইত্যাদির প্রজনন পদ্ধতিটা জেনে নেওয়া যেতে পারে। কোষ বিভাজন দ্বারা শৈবালের বংশবৃদ্ধি। শৈবাল পিচ্ছিল বস্তু ; মূল, পাতা বা কাণ্ড নাই। মস্-এর পাতা ও কাণ্ড আছে, কিন্তু মূল নাই ; তবে মূলের মত একটি অংশ আছে। তাকে বলা হয় রাইজয়েড (Rhyzoide)। মসের কাণ্ডের মাথায় একটি আধার (Capsul) তৈরী হয়, সেই আধারে দানার মত একটি বস্তুর, যাকে বলা হয় স্পোর (Spore), দরুণ বংশবৃদ্ধি ঘটে। উর্ভলিঙ্গের মত বৈশিষ্ট্য। পাইনের অনাবৃত বীজ, যার স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদ সুস্পষ্ট এবং বংশবৃদ্ধির দরুণ স্ত্রী পুরুষের মিলন প্রয়োজন।

এই অনাবৃত বীজ উদ্ভিদ পর্যায়কে বলা হয়েছে নাভাগ। না অর্থ পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষের ভাগ বা ভূমিকা যেখানে সুনির্দিষ্ট।

নাভাগর পুত্র অজ। অর্থ খাঁটি, ঠিক, আদৎ।

অজ শব্দের অন্য অর্থ শস্য বিশেষ, বিষ্ণু ইত্যাদি।

অনাবৃত বীজে উদ্ভিদজগতের যে অপূর্ণতা ছিল, তা সুষ্ঠুরূপ পেল আবৃত বীজ উদ্ভিদ (Angiosperm)-এর আবির্ভাব ঘটায়।

এই পাঁচ জাতীয় উদ্ভিদ এবং এদের পরস্পরের সংযোগে উদ্ভূত সংকর উদ্ভিদ ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করে প্রাণের জয়যাত্রার সহায়ক হয়েছে। এই আবৃত-বীজ উদ্ভিদ পর্যায় যে সত্যরূপ তাকে 'অজ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অজর পুত্র দশরথ। দশ অর্থ সংখ্যা-বিশেষ (১০), দশবাচক যথা হস্তাঙ্গুলি, বহুবচন বোধক শব্দ। রথ অর্থে কায়, চরণ, বেতসলতা। সুতরাং দশরথ অর্থে বহুচরণ বিশিষ্ট।

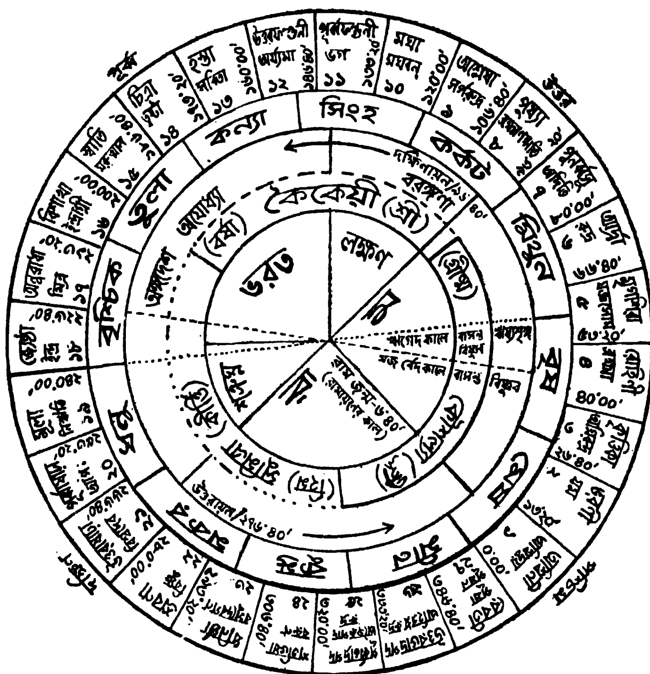
তৃণ পর্যায় উদ্ভিদ হতে শস্য উৎপাদক উদ্ভিদের (যথা ধান, গম, যব ইত্যাদি যাদের একটি চারা হতে অনেকগুলি কাঠি বা ডাঁটা আবির্ভূত হয়) উদ্ভবকে বলা হয়েছে দশরথ। এই জাতীয় উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম একবীজ-পত্রী (Monocotyledon)।

এখানে বলা প্রয়োজন দশরথ শব্দটি নানা অর্থে প্রয়োগ করা যায়। যেমন সূর্য, অন্তরীক্ষ, নভঃমণ্ডল, ঋতুচক্র ইত্যাদি। শব্দটি বিভিন্ন অর্থে

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০০-১২

রামায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকের স্বার্থে। রাম লক্ষ্মণের পিতা দশরথ অর্থ অন্তরীক্ষ ; কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রার পতি দশরথ অর্থে ঋতুচক্র।

ইক্ষ্বাকু বংশের নামের তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট উপকাহিনী বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টি-তত্ত্বের সঙ্গে যে মিল দেখানো হয়েছে তা কি খুব কষ্টকল্প মনে হয় ?



*

অনেক নামের সঙ্গে জড়িত বহুল প্রচারিত কাহিনীগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এই আলোচনা হতে, তার মূল কারণ বিবাহবাসরে বসিষ্ঠর প্রদত্ত বংশ তালিকাকে অনুসরণ করায় অথবা রামায়ণে উল্লেখ না থাকার দরুণ অথবা রামায়ণে আছে, কিন্তু বসিষ্ঠ প্রদত্ত বংশ তালিকার সঙ্গে গরমিল।

রামায়ণে রামের বিশেষণ হিসাবে এই বংশতালিকার তিনজন মাত্র প্রাধান্য পেয়েছে, ককুৎস্থ, রঘু এবং দশরথ। ককুৎস্থ শব্দটি মেঘের দ্যোতক।

রঘু শব্দে গমনকারী ; মেঘ গমন করে, বারিবিন্দু মেঘ হতে পৃথিবীতে আগমন করে। দশরথ শব্দে ঋতুচক্র, যা মেঘের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করে।

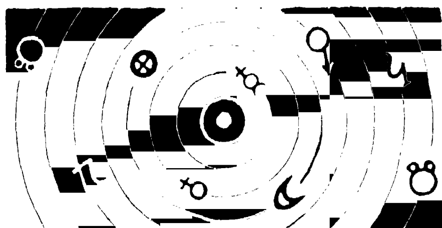
সুতরাং ইক্ষ্বাকু বংশ তালিকায় সৃষ্টি-রহস্য বিবৃত হলেও রামের মেঘ-স্বরূপ প্রকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ নাম তথা পর্যায়গুলোকে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ; উপরন্তু ঐ সকল শব্দের অর্থ ধরা যায় সূর্য। রামায়ণ, বিশেষ করে কাহিনীতে বিশ্বামিত্র যতক্ষণ জড়িয়ে আছেন, মূলতঃ তখন ক্ষত্রায়ণ বা কৃষিবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার সম্পর্ক ঘনিষ্ট-তম, সুতরাং মৃত্তিকার উৎস জানা প্রয়োজন ছিল। শুধু মৃত্তিকা নয় ; জলের উৎপত্তি, আবহমণ্ডল সৃষ্টি, পৃথিবীর বার্ষিক ও আহ্নিক গতির সুনির্দিষ্ট আবর্তন, পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌরশক্তি ছড়িয়ে পড়ার সামঞ্জস্য, অন্তরীক্ষমণ্ডলের (বা সৌরশক্তির) সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং উদ্ভিদজগতের আবির্ভাব এগুলোও জানতে হবে। ইক্ষ্বাকু বংশে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের শুধু মাত্র ইংগিত রয়েছে। সে কারণে এই গুলির বিস্তৃত আলোচনার জন্য অন্য কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে রামায়ণে এবং সেগুলিকে নির্দিষ্ট করে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

ইক্ষ্বাকু বংশে সৃষ্টির শুরু হতে আবৃত-বীজ উদ্ভিদের আবির্ভাব পর্যন্ত বলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে প্রাণকোষ হতে আরেকটি ধারায় প্রাণীজগতের আবির্ভাব ঘটেছে সে কথার কোন উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার দরুণ এবং উদ্ভিদজগৎ পর্যন্ত বংশতালিকা শেষ হওয়ার কারণেই দাবী করা চলে 'রামায়ণ' মুখ্যতঃ ক্ষত্রবিজ্ঞান।

একথা মেনে নিলেও কোনক্রমেই বলা যায় না যে রামায়ণ ইতিহাস নয়।

হাজার হাজার বছর আগে তৎকালীন ধ্যানধারণার ভিত্তিতে যিনি ক্ষত্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি এত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি শুধু কুশলী ভাষাবিদ বা পালাকার নন, অত্যন্ত

ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কবে এবং কোথায় প্রথম শস্য-জাত তৃণের সন্ধান পেয়ে মুখের গ্রাস সহজলভ্য করার জন্য 'রামায়ণ' আয়ত্ব করেছিলেন—এই তথ্য খুঁজে দেখার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণের।



নবম প্রকরণ

কুশ বংশ

যেহেতু 'রামায়ণ' কৃষিবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী, এজন্য সৃষ্টির তথা উদ্ভিদের আবির্ভাবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি অবশ্য-কর্তব্য হল প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজাত ভাবে যে শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদজগতের আবির্ভাব ঘটেছিল তাকেও ব্যক্ত করা। কৃষিবিজ্ঞান প্রধানতঃ শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট। সেকারণে সৃষ্টির বিবর্তনের ক্রম অনুসারে বর্ণনা না দিয়ে ইক্ষ্বাকু বংশে উদ্ভিদজগতের প্রাথমিক পাঁচটি ধাপ সৃষ্টির ইংগিত দেওয়া হয়েছে মাত্র। কুশ বংশে মূলতঃ তৃণগোষ্ঠীর শস্যজাতীয় প্রজাতির পরিচয় রয়েছে। অবশ্য কুশ অর্থে জল এবং কুশ অর্থে যোক্ত্র, এই দুই অর্থ ধরে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও করা যায়।

রাম ও লক্ষ্মণের সহায়তায় বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁদের নিয়ে জনক রাজার যজ্ঞে ধনু দেখতে যাওয়ার পথে একদিন তাঁরা সকলে শোণা নদীর তীরে রাত্রিবাস করেন। সমৃদ্ধ বনে শোভিত সেই দেশ সম্পর্কে রাম কৌতূহল প্রকাশ করলে বিশ্বামিত্র কুশ বংশের বিবরণ শোনালেন।

"সুব্রতানুষ্ঠায়ী, মহাতপস্বী, মহাত্মা, সজ্জনপূজক কুশ নামক জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতনয় ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশ-নাভ, অমূর্তরজস্‌ ও বসু নামক চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন।" ক্ষত্রধর্মের বৃদ্ধিকারণাভিলাষে কুশ মহোৎসাহসম্পন্ন পুত্রগণকে প্রজাপালন করার নির্দেশ দিলেন। সেইমত কুশাম্ব কৌশাম্বী, কুশনাভ মহোদয়, অমূর্তরজস্‌ ধর্মারণ্য এবং বসু গিরিব্রজ নামে উত্তম নগর স্থাপন করলেন। গিরিব্রজ বসু কর্তৃক স্থাপিত সেকারণ অপর নাম 'বসুমতী'। চারিদিকে যে পাঁচটি পর্বত আছে তাদের মধ্যদেশ দিয়ে রমণীয় মালার মত অবস্থিত হয়ে শোণা নদী মগধ দেশে প্রবাহিত হচ্ছে, সে কারণে নদীটির অন্য নাম 'মাগধী'।[১]

কুশনাভ ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরাতে একশত পরম রূপগুণ সম্পন্না কন্যা উৎপাদন করেন। সেই কন্যারা যৌবনশালিনী হলে তারা একদিন বাগানে নাচগান করছিল। সর্বাত্মা বায়ু তাদের সকলকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে তারা অসম্মতা হয়, কেননা তারা স্বয়ম্বরা না হয়ে জনকের নির্বাচিত ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করতে চায়। একথা শুনে বায়ু সাতিশয় ক্রোধ-প্রযুক্ত হয়ে তাদের দেহে প্রবেশ করে সমস্ত অবয়ব ভগ্ন করে ফেললে কন্যাগণ ঐ অবস্থার বিষয় কুশনাভকে জানালে পিতা কন্যাগণকে সৎপাত্রে দানের নিমিত্ত মন্ত্রীগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। সেই সময় ঊর্ধ্বরেতা, শুদ্ধাচারী, দ্যুতিশালী মহর্ষি চুলী ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতারূপ তপস্যা করছিলেন এবং সোমদা নামে ঊর্মিলানন্দিনী গন্ধর্বী তাঁর সেবায় নিযুক্তা ছিল। কালক্রমে সোমদার সেবায় তুষ্ট হয়ে চুলী বর দিতে চাইলে সোমদা বলল যে তার পতি নাই বা সে কাহারও স্ত্রী নয়। তথাপি সে ব্রাহ্মনিয়মে মহর্ষি সদৃশ একটি পুত্র কামনা করলে চুলী প্রার্থনা মত "ব্রহ্মদত্ত" নামে তপঃসমন্বিত একটি পুত্র সোমদাকে দান করলেন।

ব্রহ্মদত্ত কাম্পিলী নামক পুরীতে বাস করছিল। কুশনাভ তার কন্যা-গণকে ব্রহ্মদত্তর হাতে সমর্পণ করলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাগণের পাণিস্পর্শ করা মাত্র তারা সকলকে বিকুব্জা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভাসম্পন্না হল। এবার কুশানভ পুত্র লাভার্থে পুত্রেষ্ঠিযজ্ঞ করলে পিতা কুশের বরে গাধি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র, কুশ বংশে জন্ম বলে "কৌশিক" নামে বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রগণের কোন উল্লেখ করেননি। বিশ্বামিত্রর ভগিনী ঋচিকপত্নী সত্যবতী, হিমালয় হতে উদ্ভূতা নদী বিশেষ 'কৌশিকী' নামে বিখ্যাতা। বিশ্বামিত্র এই ভগিনীর নিকট বাস করেন; কেবলমাত্র নিয়মবশতঃ সিদ্ধাশ্রমে এসে রামের প্রভাবে সিদ্ধি লাভ করেন।[২]

একটা বিশাল অনিলপুঞ্জ হতে পৃথিবী গ্রহের যেমন সৃষ্টি, তেমনি উদ্ভিদজগতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্লোরোফিলের সহযোগিতায় সহজাত 'কুশ' নামক তৃণের আবির্ভাব। সেই কুশের পরবর্তী কালে বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তর। প্রাকৃতিক পরিবেশে যত ধরণের উদ্ভিদ দেখা যায় তার মধ্যে তৃণ জাতীয় সকলের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ হল কুশ। মনে হয়, এই কারণে হিন্দু-ধর্মে সকল যজ্ঞ হোম শ্রাদ্ধকৃত্য ইত্যাদিতে কুশের বিশেষ ভূমিকা স্থির করা

হয়েছে। এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডে কুশকে ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

শৈবাল, ছত্রাক, মস্, ফার্ণ, ব্যক্তবীজ (অনাবৃত-বীজ) এবং গুপ্ত-বীজ (আবৃত-বীজ) উদ্ভিদের পরিচয় ইক্ষ্বাকু বংশে পাওয়া গিয়েছে। ভাবতে বিস্ময় জাগে—এদের মধ্যে এবং এদের সৃষ্ট নানা প্রজাতির মধ্যে সংযোগ ঘটে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদের যে আবির্ভাব ঘটেছে—একথা প্রাচীন ঋষিগণ চিন্তা করেছেন।

আদিম পৃথিবীতে যখন কীটপতঙ্গ সৃষ্টি হয়নি, তখন অনুঘটক বা যোগাযোগের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল বায়ু ও জলস্রোত এবং লতা ও বল্লী। কীটপতঙ্গ, বায়ু, জল ইত্যাদির দ্বারা মূলতঃ কুসুম রেণুর চলাচল হয়, অর্থাৎ, পুংরেণুর সঙ্গে স্ত্রীরেণুর মিলন ঘটে, যা শুধু মাত্র অনাবৃত-বীজ ও আবৃত-বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু লতা বা বল্লী যখন যোগাযোগকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে তখন উভয়ের দেহরসের মিশ্রণের দরুণ নতুন প্রজাতি এবং নতুন ধরণের উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ধরা যাক একটি ফার্ণ জাতীয় গাছ যার পাতার নীচের দিকে ক্যাপসূলের মধ্যে অনাবৃত অবস্থায় প্রজনন রস জমা আছে, তার সঙ্গে যদি স্বর্ণলতা জাতীয় লতা যার শুধু মাত্র রজ্জুর মত দেহ এবং অনাবৃত রস নিষ্কাষণ কেন্দ্র আছে, এই দুই জাতের উদ্ভিদের পরস্পর বাহ্যিক মিলন হলে ভিতরে ভিতরে উভয়ের দেহরসের মিশ্রণও ঘটবে। পরিবেশ, তাপ ইত্যাদি কারণে সেই মিশ্রিত রস উভয়ের দেহে সঞ্চালিত হয়ে নতুন ধরণের লতা এবং ফার্ণ সৃষ্টি করা ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি বর্ণসংকর উদ্ভিদের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে এমনি করেই উদ্ভিদজগতের ক্রমবিবর্তনে পুনরায় আরও পাঁচটি পর্যায়ের বিভাজন ঘটেছে। যথা, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, বল্লী এবং লতা। যে শস্যজাতীয় উদ্ভিদ মানুষের আহারের জোগান দেয় এবং যার উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোর জন্য কৃষিবিজ্ঞান, সেই উদ্ভিদের উদ্ভব হয়েছে কুশ এবং দর্ভ জাতীয় তৃণের মিথুনে বর্ণসংকর সৃষ্ট হওয়ার ফলে। কুশ এবং বৈদর্ভীর যোগাযোগে উৎপন্ন হয় কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজস্ এবং বসু।

কুশ অর্থ জল, তৃণ বিশেষ (Poa Cynosuroides) যোক্ত্র, মত্ত, অঙ্কুশ। কু (পৃথিবী)—শী (শয়ন করা) + ড (কর্তৃ সংজ্ঞার্থে) ; অথবা, কুশ্ (যোগ করা) + অ (কর্তৃ-অচ্), যে পরস্পর যোগ করিয়ে দেয়।

কুশ চার প্রকার। (১) যাজ্ঞিক,—দর্ভভেদ, রক্তখদির, পলাশ, অশ্বত্থ। (২) হ্রস্বগর্ভ,—হ্রস্ব (খর্ব, কৃধু, অর্ভক, দভ্র), গর্ভ (ভ্রূণ, শিশু, অগ্নি, কুক্ষি) ;

অর্থাৎ আকারে ছোট এবং অন্তরে অগ্নি বা তেজ রয়েছে। (৩) বর্হিঃ,—অগ্নি, দীপ্তি, গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ (গ্রন্থি আছে পর্ণে বা পত্রে যার)। (৪) কুতুপ,—চর্মনির্মিতাল্পস্নেহপাত্র। কুতুপ=কুতপ অর্থ দৌহিত্র, সূর্য, অগ্নি, তিল। কু (ঈষৎ) হয়েছে তপ (সূর্যতাপ) যাহাতে। অর্থাৎ, তৈলপ্রদায়ী উদ্ভিদ।

বৈদর্ভী অর্থ বিদর্ভ কন্যা। বি (বিশেষ, সম্যক্, ভিন্ন) দর্ভ (তৃণ, কুশ); বিশেষ ধরণের তৃণ; উলপতৃণ, কাশ। অথবা, ভিন্ন ধরণের তৃণ।

দর্ভ ছয় প্রকার। কাশ, তীক্ষ্ণ, (কুশ), রোমশ (দুর্বা), মৌঞ্জ (শরগাছ), বল্বজ (উলুখড়) এবং শাদ্বল (শ্যামক ঘাস)।

কুশ জাতীয় উদ্ভিদের সঙ্গে বিশেষ ধরণের দর্ভ জাতীয় উদ্ভিদের মিথুন হয়ে চারপুত্র অর্থাৎ বর্ণ সংকর চার প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল। কুশও তৃণ, দর্ভও তৃণ; কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। যেমন তৃণগোষ্ঠীতে যারা পড়ে; ঘাস, খড়, গন্ধতৃণ, বংশ, কুশ, নল, শরগাছ, মুথাতৃণ মুঞ্জ, দর্ভ, মেথী, চণক ইত্যাদি।

কুশের চারপুত্র কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজস্ এবং বসু যাদের পর্যায়ক্রমে কুতুপ, বর্হি, যাজ্ঞিক এবং হ্রস্বগর্ভ হিসাবে গণ্য করা যায়।

কুতুপ বা কুশাম্ব,—কুশ (জল)+অম্ব (আহ্বান, গমন, পিতা, শব্দ); অর্থাৎ, জলময় কোষ-সমন্বিত উদ্ভিদ।

বর্হি বা কুশনাভ,—কুশ (যোক্ত্র) নাভি (কেন্দ্র)তে যার, অর্থাৎ তন্তু-সমন্বিত উদ্ভিদ। অথবা, কুশ (জল) নাভি (কেন্দ্র) অর্থাৎ কেন্দ্রাবিন্দুতে জল যে উদ্ভিদের।

যাজ্ঞিক বা অমূর্তরজস্,—অমূর্ত (আকাশ, বায়ু, মূর্তিহীন) রজস্ (বর্ণান্তর-প্রাপক) অর্থাৎ রঞ্জকগুণ বিশিষ্ট উদ্ভিদ (খদির, পলাশ ইত্যাদি)।

হ্রস্বগর্ভ বা বসু,—বসু অর্থ ধন, অগ্নি, সূর্য, কুবের ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে উদ্ভিদের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় অগ্নি আছে, যথা অরণীবৃক্ষ। সাধারণ-ভাবে বলা যায়, যে উদ্ভিদ হতে মূল্যবান কাঠ এবং সেইসঙ্গে ফলও পাওয়া যায়, জ্বালানীও হয়।

বসুর নগর গিরিব্রজ, অপর নাম বসুমতী।

অর্থাৎ, পৃথিবীর স্থলভাগ এই জাতীয় উদ্ভিদে শোভিত হয়েছিল; গাছের দ্বারা পরিত্যক্ত অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রার সমতা রক্ষা করে পৃথিবীকে জীবধাত্রী করে তুলেছিল। এই কারণে এই জাতীয় উদ্ভিদের নাম বসু এবং এই প্রাণদায়ী উদ্ভিদে সমৃদ্ধ বলে পৃথিবীর নাম বসুমতী।

চারিদিকের পাঁচটি পর্বত অর্থে পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) যার সমন্বয়ে সকল বস্তু সৃজন অথবা স্থূলভাবে বলা যায় পাঁচটি মৌলিক পদার্থের (নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম) যোগাযোগে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। উল্লেখিত পদার্থ ছাড়াও উদ্ভিদ ক্লোরোফিল দ্বারা কার্বন ও অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল হতে গ্রহণ করে। এছাড়া হাইড্রোজেন প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ উদ্ভিদ জল হতে শিকড় মারফৎ আহরণ করে। জল সহায়ক হিসাবে থাকে।

'মাগধী' শব্দটি মগধ শব্দ হতে এসেছে, যার অর্থ স্তুতি, বন্দনা। জলের সহায়তাকে স্তুতি ধরা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের চারি-পাশের পরিচিত সকল উদ্ভিদ মূলতঃ কুশ এবং বৈদর্ভীর সম্মেলনে উদ্ভূত হয়েছে। শস্যজাতীয় তৃণের পূর্বপুরুষ হিসাবে বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয় কুশনাভকে।

কাহিনীর পরের অংশে কুশনাভ ও ঘৃতাচীর মিলনে শত কন্যার জন্ম।

কন্যা শব্দ কন্ (দীপ্তি, কান্তি, গতি, প্রীত হওয়া), ধাতু নিষ্পন্ন। কন্যা অর্থে কুমারী নারী, ঔষধিবিশেষ, ঘৃতকুমারী। ঘৃতাচী অপ্সরা ও গন্ধর্বী। মধ্যরাত্রির একটি যামকে বলা হয় ঘৃতাচী। তন্তু-সমন্বিত-উদ্ভিদ (কুশনাভ) এর উপর সৌররশ্মি চাঁদে প্রতিফলিত হওয়ায় যে বিশেষ শক্তি সৃষ্টি হয় তার প্রতিক্রিয়া এবং গন্ধশক্তির মিশ্রণ দরুণ নতুন পর্যায়ের উদ্ভিদের আবির্ভাব। এই পর্যায়ে শর, বেত, কলা গাছ ইত্যাদি ধরা যেতে পারে।

'একশত' শব্দে বহুত্ব বুঝানো হয়েছে মাত্র।

বায়ু কর্তৃক কন্যাগণের দুরাবস্থা বলতে এই জাতীয় উদ্ভিদগুলি ঝড়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ ভঙ্গুরধর্মী।

এই জাতের রূপান্তর ঘটে 'ব্রহ্মদত্ত'র সম্পর্কে এসে। ব্রহ্মদত্তর স্বতন্ত্র কাহিনী। চুলীর স্পর্শে সোমদার গর্ভে ব্রহ্মদত্তর জন্ম।

চুলী = কেশী = শিখা, টিকী = বহুল কেশযুক্ত = বিষ্ণু, সিংহ। কেশী অর্থ অজলোমাশুঁয়া-শিম্বী, অগ্রপর্নী, আলকুশী। চুলী শব্দে শুঁয়ো আছে এমন জাতীয় উদ্ভিদ বুঝিয়েছে।

সোমদা = সোম (অমৃত) দা (প্রদায়িনী, রক্ষণকর্ত্রী)। যা অমৃত দান করে বা অমৃত রক্ষা করে।

সোমদা ঊর্মিলানন্দিনী। ভাবার্থে লতা ধরা যায়। গন্ধর্বী (গন্ধ-

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০--১৩

শক্তিযুক্তা) সোমদা পতিহীনা অর্থে সহজাত লতা, বর্ণসংকর নয়। স্থূলভাবে বলা যায় চূলীর স্পর্শে 'সোমদা' লতা হতে যে উদ্ভিদ জন্ম নিল তার গায়ে কাঁটা বা শুঁয়ো আছে। অর্থাৎ, শুঁয়ো-সমন্বিত উদ্ভিদের সঙ্গে সহজাত গন্ধ-তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের মিলনে সৃষ্ট বর্ণসংকর উদ্ভিদের নামকরণ করা হয়েছে ব্রহ্মদত্ত।

এই সংকর জাতের উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে কুশনাভ কন্যারা। ফলে কন্যাদের দেহশ্রী সুগঠিত হয়। এই পর্যায়ে খেজুর, বেত, তাল, বাঁশ, নারিকেল গাছ প্রভৃতি ধরা যায়। এগুলি আগের মত সহজ ভঙ্গুর নয়। লক্ষণীয় যে এগুলি আগের পর্যায় হতে শুধু শক্তই নয়, কাঁটা-সমন্বিত। বাঁশের কাণ্ড এবং নারিকেলের পাতার বৈশিষ্ট্য কাঁটার মত।

কুশনাভর এবার পুত্র প্রাপ্তি, নাম—গাধি। কিন্তু কার গর্ভজাত সে কথার উল্লেখ নাই। গা (গতি, স্তুতি) ধি (ধারণ, দান, প্রানন্—সন্তোষ সম্পাদন)।

গাধ্ (প্রতিষ্ঠা, লিপ্সা, রচনা, গ্রন্থ) + ই কর্তৃ।

গাধির আরেক নাম 'কুশিক,' যার অর্থ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ, শাল গাছ, বয়রা গাছ, বিভীতক গাছ (বহেড়া)। অশ্বকর্ণ অর্থ শস্য সম্বরণ। শস্য (ফলের শাঁস, বৃক্ষাদির ফলপুষ্প) সম্বরণ (আবরণ)। শাল অর্থ শক্ত বৃক্ষ বা মুড়াগাছ, অর্থাৎ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। সুতরাং গাধি গুল্ম বা গুচ্ছ জাতীয় উদ্ভিদ, যার ফল ও পুষ্প হয় এবং ফলের মধ্যে আবরণযুক্ত বীজ থাকে। কুশিক শব্দের অর্থ লাঙ্গলের ফাল।

লক্ষণীয় যে গাধির মধ্যে পিতামহী বৈদর্ভীর গুল্মধর্ম বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে, বিজ্ঞান-ভাষায় উত্তরাধিকার সূত্র।

কুশনাভর পুত্রেষ্ঠী-যাগকালে ব্রহ্মনন্দন কুশ বলেছিল যে গাধি নামক এই পুত্র দ্বারা লোকে চিরস্থায়িনী কীর্তি লাভ হবে। অর্থাৎ গাধি পর্যায়ে শস্যপ্রদায়ী গুচ্ছ-উদ্ভিদের আবির্ভাব। গাধির মাতার কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় সৌরশক্তির বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার দরুণ কুশ হতে সহজাতভাবে গাধির অর্থাৎ শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

বর্তমান বিজ্ঞান অনুসারে গাধিকে ধান্যগোত্রের (ফ্যামিলি গ্রামিনিঈ—(Family Gramineae) অন্তর্গত একবীজপত্রী, বর্ষজীবি, বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ বলা যায়। সুতরাং সহজাত বনজ আদিমতম তণ্ডুল-শস্য-প্রদায়ী উদ্ভিদের নাম গাধি।

গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। ইনি কৌশিক নামে বিখ্যাত। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠা ভগিনী সত্যবতীর কাছে থাকেন, নিয়মবশতঃ তাকে পরিত্যাগ করে সিদ্ধাশ্রমে এসে রামের প্রভাবে সিদ্ধ হয়ে থাকেন। গাধিপত্নী বা বিশ্বামিত্রর মায়ের কোন উল্লেখ নাই।

কৃশিক অর্থাৎ লাঙ্গলের ফাল দ্বারা উৎপাদিত ফসলকে কৌশিক শব্দ দ্বারা ইংগিত করা যায়।

কৌশিক অর্থ ইন্দ্র, গুগ্‌গুল, উলূক, ব্যালগ্রহী, নকুল, কোষজ্ঞ, কোষ-কার, শৃঙ্গাররস, অশ্বকর্ণ বৃক্ষ।

উলূক পুংলিঙ্গএ অর্থ পেচক। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গ ধরলে তৃণ বিশেষ; উলুখড়, সূচাগ্র, স্থূলক, দর্ভ, ঘুনাখ্য, খরচ্ছদ, উলপ, উলুপ।

উলুপ (পুং, ক্লী) গুল্মিনী। শাখাপত্র প্রচয়যুক্ত লতা।

কুশিক (গাধি) এবং কৌশিক (বিশ্বামিত্র) উভয় শব্দের অর্থ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। সুতরাং কৌশিক অর্থে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ইংগিত করছে।

বিশ্বামিত্র,—বিশ্বা (আতিবিষা, শতাবরী, পিপ্পলী) মিত্র হয়েছে যার সহায়তায়।

আতিবিষা অর্থ অরুণা, শৃঙ্গী, শ্বেতা, শ্বেতকন্দা, ভৃঙ্গী, শ্যামকন্দা, মাদ্রী, শ্বেতবচা, অমৃতা।

অরুণা অর্থ শ্যামা, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিবৃতা, গুঞ্জ।

শতাবরী অর্থ শতমুখী, শটী। শ্বেতা অর্থ শ্বেতদুর্বা।

ত্রিবৃতা = ত্রিবৃৎ (মঞ্জিষ্ঠা লতা বিশেষ)।

পিপ্পলী অর্থ পিপুল (কটু বীজা, তিক্ত তণ্ডুলা)।

তণ্ডুলা = তণ্ডুল = বিড়ঙ্গ। তিক্ত তণ্ডুলা = তেত চাউল।

কটু বীজা,—কটু (তিক্ত) বীজ (অংকুর, মজ্জা) যার।

'বিশ্বামিত্র' শব্দটি নিয়ে এত বিশ্লেষণের মূল কারণ কুশ বংশের এই শ্রেষ্ঠতম ব্যাক্তিটিকে চেনা। ফলে এ'র সঙ্গে রামের যোগাযোগ ঘটা এবং এই যোগাযোগে রামসীতার বিবাহ ঘটার হেতু সহজবোধ্য হবে। রামায়ণ যদি কৃষিবিজ্ঞান হয় তাহলে রাম এবং বিশ্বামিত্র উভয়ে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

'বিশ্বামিত্র' শব্দটির নানা অর্থভেদ করে যা দাঁড়ায় তার সারকথা গুচ্ছধর্মী উলুখড়-জাতীয় তণ্ডুলপ্রদায়ী উদ্ভিদ বিশেষ।

এখন এটিকে সহজেই চেনা যায় ধান্যগাছ হিসাবে। ধান্য অর্থ সতুঁষ তণ্ডুল।

তণ্ডুল বা চাউলের আবরক তু'ষ, এই আবরকের পরিচয় গাধি পর্যায়ে পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য তণ্ডুল শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। খাদ্যশস্য মাত্রই তণ্ডুল। বর্তমানের অনেক শস্যসজ্জী (আলু, টমাটো ইত্যাদি) প্রাথমিক অবস্থায় তিক্ত অথবা বিষাক্ত ছিল, পরিচর্যার দরুণ খাদ্যে উন্নীত হয়েছে। ধানের বীজ বা চাউলও আদিম অবস্থায় কটু ছিল মনে করি। কারণ দেখা গিয়েছে একটু অবস্থার হেরফের ঘটলে চাউল তেত হয় অর্থাৎ কটু প্রবণতা চাউলের আছে।

এখানে ধান্যের একটু পরিচয় দিলে মনে করি ভাল হয়। ধান্য মূলতঃ তিন রকম।

(১) শালিধান্য – হৈমন্তিক ধান্য, আমন ধান।

(২) ষষ্টিক ধান্য—গ্রীষ্মকালীন ধান্য, বোরো ধান।

(৩) ব্রীহি ধান্য — বর্ষাকালীন ধান্য, আউস ধান।

এছাড়া আরও দুটি ভেদ আছে, (ক) কাঙ্গনী ধান্য—শ্যামা, চীনা, কট ও কোদো ভেদে চার রকম এবং (খ) শুক ধান্য—শুঙ্গযুক্ত ধান্য, শিম্বী ধান্য।

ধান্য জাতীয় শস্য যথা যব, গম, মুগ, মাষ, মসুর, কলাই, ছোলা প্রভৃতি। সুতরাং কুশবংশ কাহিনী মারফৎ আদিম ধান্য বা তণ্ডুল জাতীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিশ্বামিত্রর ভগিনী সত্যবতী (কৌশিকী) স্বামী ঋচিকের সঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে থাকেন। বিশ্বামিত্রর মূল আস্তানা সেখানে। নিয়মমাফিক সিদ্ধাশ্রমে এসে রামের প্রভাবে সিদ্ধ হন। বক্তব্যটি লক্ষণীয়।

ধানগাছ ফসল দিয়ে মরে যায়। আবার যথাসময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে অর্থাৎ বর্ষায় বুনতে হয় অথবা গজিয়ে ওঠে। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে রামের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেন অর্থাৎ, আগামী বৎসরের বর্ষার উৎস হিসাবে উত্তরায়ণাদি। আবার নিয়মবশতঃ পরবর্তী বর্ষার আগে সিদ্ধাশ্রমে আসেন তপস্যা করতে। কৃষি-বিজ্ঞানীর মতে ভারত, চীন, জাপান ও জাভায় প্রথম ধান উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় প্রাচীন ভারতে হিমালয়ের যে অংশকে মুঞ্জমান পর্বত বলা হত, হয়ত সেখানেই প্রথম সহজাত ধানের উদ্ভব।

বিশ্বামিত্রর ভগিনী সত্যবতী ঋচিকের পত্নী। ঋচিককে ভৃগু ও ভৃগু-পুত্র দুইই বলা হয়েছে। ঋচিক বা ভৃগু অর্থে পর্বতের সানুদেশ। মনে

হয় বিশ্বামিত্র ও সত্যবতী শব্দ দুটিতে যথাক্রমে ধান ও গম নির্দেশ করা হচ্ছে। ধান ও গম সমগোত্রীয়। গমের আদি জন্মস্থান পাঞ্জাব, হিমালয় পর্বতের সানুদেশ। অথবা, দুই মরশুমের দুই প্রকার ধানের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এই বক্তব্য মেঘদেবতা রামের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতীয় কৃষি আজও মৌসুমী বায়ু নির্ভরশীল। এ কারণেই রামকে (মেঘদেবতা) না হলে বিশ্বামিত্র (শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদ)-এর সিদ্ধিলাভ (ফসল) সম্ভব হয় না।

কুশ বংশে বিশ্বামিত্রর পরে তার পুত্রদের কোনই ভূমিকা নাই। বিশ্বামিত্রকে ধান্যগোত্রের, বিশেষভাবে ধানগাছ হিসাবে ব্যক্ত করার পিছনে বড় যুক্তি হল তাঁর রাম তথা মেঘদেবতার সঙ্গে সম্পর্ক।

পৃথিবীর মৌসুমী অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত ফসল ধান। ভারতবর্ষে সকল ফসলের মধ্যে ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। মনে হয়, প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার প্রচলিত ধান চাষ কালক্রমে গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এলাকায় প্রাধান্যলাভ করেছিল।

এই বিশ্লেষণ আপাতদৃষ্টিতে কষ্টকল্পনা মনে হতে পারে। কিন্তু রামায়ণের কৃষিবিজ্ঞান-ভিত্তিক সত্তাকে মানতে হলে সৃষ্টি-রহস্য প্রসঙ্গে শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদের আবির্ভাবের বিবরণ অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডে এবং বিভিন্ন সর্গে এমন ধরণের ইংগিত পাওয়া যায় না। উপরন্তু ইক্ষ্বাকুবংশ ও জনকবংশের যোগসূত্রকারী কুশবংশের অবশ্যই এই ধরণের তাৎপর্য থাকা সম্ভব। প্রায় দুই হাজার বছর আগের রহস্যধর্মী কাব্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে কষ্ট-কল্পনা মনে হতে পারে।

যাইহোক কুশ বংশের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও অনুধাবন করা যেতে পারে।

রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার পথে শোণা নদীতীরে রাত্রিবাসকালে বিশ্বামিত্র স্বয়ং কুশ বংশের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুশ অর্থে তৃণ ধরে বিভিন্ন তৃণ-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে জীবের বিশেষতঃ মানুষের খাদ্যোপযোগী তণ্ডুল অর্থাৎ শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদের আবির্ভাবের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও রামায়ণে আরেকটি ক্ষেত্রে কুশ বংশের উল্লেখ আছে।

রাম ও লক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্র জনকের যজ্ঞভূমিতে উপনীত হলে পুরোহিত শতানন্দ রামকে বিশ্বামিত্রর অতীত ইতিহাস শোনান।

"রাম! ইঁহার পূর্বপুরুষ ধর্মজ্ঞ, কৃতবিদ্য, প্রজাহিতনিরত, প্রজাপতি-নন্দন কুশ নামে রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র বলবান সুধার্মিক কুশনাভ, এবং তাঁহার পুত্র গাধি নামে বিখ্যাত হন। এই মহামুনি অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্র, সেই গাধির পুত্র। ইনি রাজা হইয়া বহুসহস্রবর্ষ পৃথিবী পালন করত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।"[৩]

লক্ষণীয় যে এখানে কুশের অন্য পুত্রদের এবং বিশ্বামিত্রর ভগিনী কৌশিকী ও তাঁর পুত্রগণের কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য পরবর্তীকালে শুনঃশেফ কাহিনী প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রর পুত্রগণের উল্লেখ রামায়ণে আছে। এক পুত্রের নাম মধুষ্যন্দ। রামায়ণে এদের ভূমিকা এতই নগণ্য যে কুশবংশ বিশ্লেষণে কোন স্থান দেওয়া যায় না।[৪] সুতরাং কুশ-বংশের মূল ধারাতে মাত্র চারজন উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মসম্ভূত কুশ স্বয়ং, কুশনাভ, গাধি এবং বিশ্বামিত্র। এদের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

কুশ অর্থ জল। আদিম পৃথিবীতে জল সহজাতভাবে আবির্ভূত, একারণে কুশ স্বয়ং ব্রহ্মসম্ভূত। জলের এক নাম জীবন। প্রাণজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় জলের উপর নির্ভরশীল। কৃষিকাজে জলের ভূমিকা অপরিহার্য। মেঘদৈবত রামের বহিপ্রকাশ বারিধারা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে বসুন্ধরা-কন্যা সীতা ফসল উৎপাদন করে কৃষিশ্রী রূপে সার্থকতা লাভ করেন।

জলের তিনটি পর্যায়; অনিল, তরল ও কঠিন। জড় পৃথিবীতে জলের আবির্ভাবের পরই শুরু হয়েছিল প্রাণের স্পন্দন। পৃথিবীর উর্দ্ধাকাশে জলকণা বিদ্যমান। ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশেও রয়েছে জলের উৎস। ভূ-পৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশে সমুদ্র বিশাল জলরাশি ধারণ করে আছে। অপরদিকে ধরিত্রীর উত্তরাংশে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হিমালয় পর্বত-মালায় কঠিন হিমবাহর রাজত্ব। ভূপ্রকৃতি এবং আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে সেই কঠিনীভূত হিমবাহ হতে বহু জলধারা নির্গত হয়ে উচ্চাবচ এলাকা পেরিয়ে সমতল ভূমিতে সকল ঋতুতে নদনদী রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও ঋতু-চক্রের আবর্তনে বর্ষাঋতুতে মেঘ সমাগমে বারিবর্ষণের দরুণ সেই সময়কাল কৃষিকাজের প্রকৃষ্ট সময়। তখন

বায়ুমণ্ডলে জলকণা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ভূতলের জলস্তর ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং জল মূলতঃ তিনভাবে অবস্থান করে সৃষ্টি রক্ষা করছে।

কুশের পুত্র কুশনাভ। কুশ (জল) নাভিতে (কেন্দ্রে) যার অথবা নাভি শব্দের অর্থ সন্নদ্ধ (ব্যাপৃত, সজ্জিত) ধরে বলা যায় জলময়। সুতরাং কুশনাভ শব্দে রূপকে জলের দ্বিতীয় অবস্থান অর্থাৎ হিমবাহ, মহাসমুদ্র, ভূতলস্থ জলধারা এমন কি বহতা নদনদীর ইংগিত গ্রহণ করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে কুশনাভ পিতার নির্দেশমত 'মহোদয়' নামক নগর স্থাপন করেছিলেন। যেহেতু কাহিনীতে কুশ-নাভকে নরদেহী হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেকারণে 'মহোদয়' শব্দটির পুংলিংগে অর্থ হয় অভ্যুদয়, আধিপত্য, কান্যকুব্জ দেশ ইত্যাদি।

হিমবাহ এবং মহাসমুদ্র উভয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষা করে জীবজগতের হিতসাধন করছে; অর্থাৎ জলের একটি পর্যায় বা স্বরূপের প্রাণজগতের উপর আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে।

অপরদিকে, কান্যকুব্জ বা কন্যাকুব্জ এবং কুশস্থল শব্দের তাৎপর্য কুশনাভর শত কন্যার কাহিনীতে রূপকে বিবৃত হয়েছে। যেখানে কুশ অর্থাৎ জল বা তৃণ আছে সেই স্থানকে কুশস্থল বলা যায়। জল যেখানে সহজলভ্য, কৃষিকাজ সেখানে প্রসার লাভ করে।

কুশনাভ 'কুশিক' নামেও পরিচিত। কুশিক, কুশী + ক (কন্) স্বার্থে; অর্থ ফাল। সুতরাং এই শব্দের ভিত্তিতে জলনির্ভরশীল সহজাত এবং কৃষিজাত ফসল প্রাপ্তির ইংগিত গ্রহণ করা যায়।

'কুশনাভ' শব্দটির মাধ্যমে যে নৈসর্গিক তথ্য রহস্যে ব্যক্ত করা হয়েছে সেই রহস্যের অন্তঃস্থলে উপনীত হয়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে না পারলে পরবর্তী দু'টি চরিত্র তথা পর্যায় সহজবোধ্য হবে না। কারণ কেবলমাত্র হিমবাহ, মহাসমুদ্র ও নদ-নদীর জলধারার উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বুকে কৃষিভিত্তিক মানবসমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব হত না। ঋতুচক্রের আবর্তনে বর্ষাঋতুর ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রধান।

কুশনাভর পরে গাধি।

গাধ্ (প্রতিষ্ঠা, স্থিতি) ধাতু নিষ্পন্ন 'গাধি' শব্দের অর্থ ধরা যায় স্থিতিশীল বা প্রতিষ্ঠাবান। গাধ্ শব্দের অর্থ অবস্থানযোগ্য স্থান।[৫]

কৃষিবিজ্ঞান অনুসরণে বলা যায় কে প্রতিষ্ঠালাভ করছে অথবা

অবস্থানযোগ্য স্থান কোথায় ?

আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে যেমন বসন্ত ঋতু, তেমনি জীবনধারণের জন্য বর্ষাঋতু অপরিহার্য। রবিপথের দক্ষিণায়নাদিতে বর্ষারম্ভ। অতএব জলের মেঘ পর্যায়কে গাধি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মেঘের বিভিন্ন স্বরূপ ও নামের বর্ণনা আছে।[৬]

বর্ষা ঋতুতে যে মেঘ জলধারা উজার করে সৃষ্টি রক্ষার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেই মেঘের উদ্ভব ঘটে সূর্যর উত্তরায়ণ কালে। ইতিপূর্বে 'রামজন্মকথা' প্রকরণে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে রামায়ণের কালে উত্তরাষাঢ়া (যার বৈদিক নাম বিশ্ব) নক্ষত্রে সূর্যর (মিত্র) অবস্থানকালে উত্তরায়ণাদি হত। এই সূত্র হতেই জলের শেষ পর্যায়কে বিশ্বামিত্র নাম দেওয়া হয়েছে।

অতএব কুশবংশের চারটি পুরুষ তথা পর্যায় বর্ষাঋতুতে বসুন্ধরা-কন্যা সীতার (কর্ষিত জমির) সঙ্গে সূর্যবংশীয় রামের (বর্ষণ দেবতার) সংযোগ সাধন করছে।



৬। "বৃহৎ সংহিতায় অনেক প্রকার মেঘের বর্ণনা আছে। মৎস্যপুরাণেও কয়েক প্রকারের আছে। লিঙ্গপুরাণ (৫৪ অঃ) মতে "চরাচর দগ্ধ হইলে পৃথিবীর ধুম স্বরূপ হইয়া যাহা বায়ু কর্ত্তৃক উর্ধ্বে নীত হয়, তাহাই অভ্র। এজন্য ধুম অগ্নি ও বায়ুর সংযোগে অভ্রের উৎপত্তি বলা যায়।" বলা বাহুল্য ইহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মতও বটে। যে মেঘ হইতে মেহন (বর্ষণ) হয়, তাহার নাম মেঘ। জীমূত মেঘ ধরাপৃষ্ঠ হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উর্ধ্বে থাকে। জীবক মেঘ ক্ষীণ, বিদ্যুৎধ্বনি শূন্য। মেঘসমূহ যোজন মাত্র উর্ধ্বে থাকিলে বহু জল বর্ষণ হয়। ইত্যাদি।

বায়ুপুরাণ (৫১ অঃ) অভ্রাদির লক্ষণ অন্য প্রকার দিয়েছেন। যথা, অভ্র হইতে জল ভ্রষ্ট নয় না বলিয়া অভ্র; মেঘ হইতে মেহন হয় বলিয়া নাম মেঘ।

উৎপত্তি ভেদে মেঘ ত্রিবিধ। এক প্রকার মেঘে—জীমূত—শীত দুর্দিন বাত হয়, উহা মহিষ, বরাহ মত্ত মাতঙ্গ রূপ ধারণ করে, উহা বিদ্যুৎ গুণবিহীন জলধারাবিলম্বী নিঃশব্দ, ঘন, মহাকায়, বায়ুর বশানুগ, ক্রোশ কিংবা অর্দ্ধ ক্রোশ হইতে বর্ষণ করে, পর্ব্বতের অগ্র ও নিতম্বে বর্ষণ করে। জীমূত মেঘের সময়ে বলাকার গর্ভ হয়। (২) জীবক মেঘ (বায়ুপুরাণে পুনর্ব্বার জীমূত নামে লিখিত) বিদ্যুৎগুণযুক্ত, শব্দযুক্ত, উহা হইতে বর্ষণ হয়, তাহাতে বৃক্ষাদির উদ্‌গমে ভূমি পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হয়, যোজন বা সার্দ্ধযোজন বা অর্দ্ধ যোজন হইতে বর্ষণ করে (৩) (ক) পুস্কর (খ) আবর্ত্তক। ইহাদিগের জন্ম পক্ষ হইতে, যে পক্ষ পূর্ব্বে পর্ব্বতের ছিল, এবং যাহাকে ইন্দ্র ছিন্ন করেন। ইহারা কামগ, ও বৃহৎ। (গ) সম্বর্ত্ত নানাকার ধারণ করে. মহাঘোরতর কল্পান্ত বৃষ্টির স্রষ্টা।

পর্জন্য ও দিগ্‌গজেরা হেমন্তকালে শীত আনয়ন করে, এবং সর্ব্ব শস্য বিবৃদ্ধি নিমিত্ত তুষার বৃষ্টি করে। (বায়ুপুরাণ পশ্চিমদেশে রচিত?) ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরিবহ। তাহা আকাশ গোচর দিব্য অতিজল স্বর্গপথে স্থিত গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছে।"
—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী", পৃষ্ঠা ৩৫১ (পাদটীকা)।

দশম প্রকরণ

জনক বংশ

কুশবংশে পেয়েছি প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত শস্যপ্রদায়ী তৃণ। শস্যবীজ হতে গাছ হয় এবং সেই গাছ হতে পুনরায় শস্য উৎপাদিত হয়, এই তথ্যও কৃষিবিদ্যার অন্তর্গত। জনকবংশে সেই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

রামসীতার বিবাহ বাসরে সীরধ্বজ যে বংশ তালিকা পেশ করেন সেটি এখানে আলোচ্য বিষয়। নিমি হতে বংশের শুরু, সীরধ্বজে শেষ। সীরধ্বজ ও তার ভাই কুশধ্বজের পুত্রগণের সম্পর্কে রামায়ণে কোন উল্লেখ নাই। যেন দুই ভাই-এর চার কন্যার সঙ্গে দশরথের চার পুত্র বিবাহের ভিতর দিয়ে বংশটি লোপ পেয়ে গেল। ইক্ষ্বাকুবংশের তুলনায় এই বংশে উপকাহিনীও কম। একমাত্র নিমি সম্পর্কীয় কাহিনী উল্লেখযোগ্য। এই কাহিনী উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। বালকাণ্ডে জনক বংশের পূর্বপুরুষের হরধনু প্রাপ্তির প্রসঙ্গটুকু মাত্র আছে। সীতার বিবাহের পর এই বংশটির আর কোনই ভূমিকা নাই।

জনক বংশের তালিকা,—১। নিমি ২। মিথি ৩। জনক ৪। উদাবসু ৫। নন্দিবর্ধন ৬। সুকেতু ৭। দেবরাত ৮। বৃহদ্রথ ৯। মহাবীর ১০। সুধৃতি ১১। ধৃষ্টকেতু ১২। হর্য্যশ্ব ১৩। মরু ১৪। প্রতীন্ধক ১৫। কীর্তিরথ ১৬। দেবমীঢ় ১৭। বিবুধ ১৮। মহীধ্রক ১৯। কীর্তিরথ ২০। মহারোমা ২১। স্বর্ণরোমা ২২। হ্রস্বরোমা ২৩। সীরধ্বজ এবং কুশধ্বজ।

হ্রস্বরোমার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সীরধ্বজের হলকর্ষণকালের প্রাপ্ত কন্যা অযোনিসম্ভবা সীতা।

এই বংশ তালিকার ব্যক্তিগণের মধ্যে রামায়ণে একমাত্র প্রাধান্য নিমির। জনক; বংশের নামকরণেই মাত্র বিখ্যাত।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে শুধু বীজ বললে হয় না, সেই সঙ্গে বীজের অংকুরোদগম এবং চারার পুষ্টি, বৃদ্ধি, ফুল, ফল সকল পর্যায় বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু বীজ হতে অংকুরোদগম না হলে বাকীটুকু নিরর্থক। তাই জনকের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে।

সীরধ্বজ প্রদত্ত জনক বংশের তালিকায় নিমি উক্ত বংশের প্রথম পুরুষ। কিন্তু রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাম কর্তৃক লক্ষ্মণের নিকট নিমি-বসিষ্ঠ-বৃত্তান্ত বিবৃত করার কালে নিমিকে ইক্ষ্বাকু পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ইক্ষ্বাকু বংশীয় নিমি গৌতম মুনির আশ্রমের নিকট দেবপুরীর ন্যায় রমণীয় এক পুরী নির্মাণ করেছিলেন; যার নাম ছিল বৈজয়ন্ত।

পিতার মনে আহ্লাদ উৎপাদন করতে দীর্ঘসত্র করব, নিমি এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করে প্রথমে বসিষ্ঠ এবং পরে ভৃগু, অত্রি এবং অঙ্গিরাকে বরণ করেন। বসিষ্ঠ নিমিকে জানান যে ইন্দ্রর যজ্ঞে পূর্বেই তাকে বরণ করা হয়েছে সে কারণে নিমি যেন অপেক্ষা করে। বসিষ্ঠ প্রস্থান করলে নিমি গৌতমকে দিয়ে বসিষ্ঠর কর্তব্য সমাধা করে তার নগরের কাছে হিমালয়পার্শ্বে পঞ্চসহস্র বৎসর ব্যাপী একটি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। অপরদিকে ইন্দ্রও সহস্রবর্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। ইন্দ্রর যজ্ঞ সমাধা হলে বসিষ্ঠ নিমির নগরে এসে গৌতমকে যজ্ঞ করতে দেখে কুপিত হলেন। নিমি তখন নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন। সে কারণে বসিষ্ঠ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, 'রাজন! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে যজ্ঞার্থে বরণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার শরীর অচেতন হইবে।'

বসিষ্ঠদত্ত শাপ শুনে নিমি জেগে উঠে বসিষ্ঠকে বললেন, 'আমি অজ্ঞান হইয়া নিদ্রিত ছিলাম তথাপি তুমি কোপে কলুষিত হইয়া আমাকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপ দিয়াছ; ব্রহ্মর্ষে! সুতরাং তোমার দেহও বহুকাল অচেতন হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

শাপ ও প্রতিশাপের দরুণ উভয়েই বিদেহ হলেন।[১]

অতঃপর মহর্ষিগণ রাজা নিমিকে কায়াবিহীন দেখে তার সেই পরিত্যক্ত শবদেহ অবলম্বন করেই যজ্ঞদীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন এবং সকলে মিলে নিমির শবদেহ রক্ষা করতে লাগলেন। পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হলে, মহর্ষি ভৃগু বললেন, 'রাজন! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার চেতনাকে পুনরানয়ন করিব।'

দেবগণও নিমি-চেতনাকে পুনরানয়ন করার ইচ্ছায় বললেন, 'রাজর্ষে ! তুমি বর গ্রহণ কর, আমরা তোমার চেতনাকে কোথায় স্থাপন করিব ?'

একথা শুনে নিমি-চেতনা বললেন, 'আমি প্রাণীগণের নেত্রে বাস করিব ।'

তখন দেবতারা বললেন, 'তাহাই হইবে ; তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীর নেত্রে বিচরণ করিবে। তুমি বায়ুরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে, প্রাণীগণ বিশ্রামার্থ তোমার জন্য নিমেষধর্ম পাইবে ।'

দেবতারা একথা বলে চলে গেলে মহর্ষিরা নিমির পুত্রের জন্য তাঁর দেহে অরণি নিক্ষেপপূর্বক সকলে মন্ত্রহোম-দ্বারা মন্থন করতে লাগলেন। এইভাবে অরণিদ্বারা মন্থন করতে করতে একজন মহা তেজঃশালী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হলেন। তিনি মন্থনদ্বারা জন্মিলেন এজন্য মহর্ষিগণ তাঁকে 'মিথি এবং 'জনক' নাম দিলেন। তিনি বিদেহ নিমি হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে 'বৈদেহ' নামেও প্রসিদ্ধ হলেন ।[২]

এই কাহিনীর প্রথম লক্ষণীয় বিষয় রামের উপস্থিতিতে বিবাহ বাসরে সীরধ্বজ নিমি ও মিথিকে তাঁদের পূর্বপুরুষ বলেছেন। অথচ সেই রাম পরে নিমি ও মিথিকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে জনক বংশের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এই আপাতবিরোধী উক্তির দরুণ নিমি-কাহিনীটি অলীক মনে হতে পারে। কিন্তু রহস্য ভেদ করে অর্থবোধটা যখন দাঁড়াবে নিমি অর্থে বীজের মধ্যে সুপ্ত প্রাণশক্তি, তখন আর বক্তব্য অস্পষ্ট থাকে না। সকল উদ্ভিদের মূল উৎস বীজ ; সেক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ। বীজের উৎস বৃক্ষ, বৃক্ষের উৎস মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও সৌরশক্তি। অতএব নিমিকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলা অসংগত হয়নি।

নিমি শব্দটি সংস্কৃত নেম (কাল, অর্ধ) শব্দ হতে নিষ্পন্ন হতে পারে। অথবা, নিমি—নি (নিবেশ, বন্ধন, আশ্রয়)—মা (লক্ষ্মী)+ডি কর্তৃ। অর্থাৎ, লক্ষ্মীর নিবেশস্থল বা আশ্রয়স্থল বা লক্ষ্মী যেখানে বাঁধা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় জনক বংশের শেষ পর্যায়ে সীতার আবির্ভাব। সীতার কৃষিসত্তা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সীরখাত সৃজনের উদ্দেশ্য হল বীজ বপন ; যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পরিশেষে শস্য উৎপাদন করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সীতার বংশের প্রথম পুরুষ তথা পর্যায়কে বীজ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কারণ বীজের মধ্যে কৃষিশ্রী লক্ষ্মী সুপ্ত অবস্থায়

বিরাজ করে। নিমি-কাহিনীর মধ্যে বীজের তাৎপর্য রহস্যে ব্যক্ত হয়েছে।

আপাতঃদৃষ্টিতে বীজের মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দন নাই। কিন্তু এই বীজকে উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপন করলে অঙ্কুরোদগম হয়। পরবর্তীকালে সেই অঙ্কুর চারা বা গাছে পরিণত হয়ে ফল দান করে। বীজের বিশেষ যে স্থানের আবরণ ভেদ করে অঙ্কুরের উন্মেষ হয়, সেই স্থানটিকে বলে নেত্র বা চোখ। আলু, কচু, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে সাধারণ চাষীদের মধ্যেও চোখ কথার প্রচলন আছে। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত পরিবেশ বলতে মাটি, জল, বাতাস এবং প্রয়োজনীয় তাপ বুঝায়। এই পরিবেশে বীজ রাখা হলে বীজের দেহস্থিত বস্তু, যাকে বলা হয় শ্বেতসার (কার্বো-হাইড্রেট), সেই বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটার ফলশ্রুতি অঙ্কুরোদগম অর্থাৎ প্রাণের আবির্ভাব। সীরখাতে যে বীজ বপন করা হয়, মাটির রস ও তাপে সেই বীজগুলির মাটির নীচেই অঙ্কুরোদগম হয়ে পরবর্তী ধাপে ছোট ছোট চারা মাটি ভেদ করে উপরে মাথা তুললে আমাদের চোখে পড়ে। বীজের যে নির্দিষ্ট স্থান হতে অঙ্কুরোদগম হয় সেই স্থানটি কীটদ্রংষ্ট হলে সেই বীজ নিস্ফলা। নিমি-কাহিনীতে দেখা যায় নিমি হিমালয়ের পাদদেশে গৌতমের আশ্রমের পাশে বৈজয়ন্ত নগরে বাস করতেন। হিমালয় অর্থে দক্ষিণায়নাদি স্থান। গৌতম অর্থে শ্রেষ্ঠ রশ্মি, যা মনে করা যায় ঋতুচক্রে বর্ষাসমাগমের পূর্বকাল অর্থাৎ গ্রীষ্মঋতুর শেষ ভাগ। ইন্দ্রপুরীকেও 'বৈজয়ন্ত' বলা হয়। বৈজয়ন্ত অর্থ কার্তিকেয়। অগ্নি পরিত্যক্ত শিববীর্যে গঙ্গা গর্ভধারণ করে সেই গর্ভ শরবনে স্থাপন করলে কার্তিকেয়র জন্ম হয়; ছয়জন মাতৃকা সেই শিশুকে পালন করেন। জড় পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম প্রকাশ প্রাণকোষ (প্রটপ্লাজম) ছয়টি পদার্থ দ্বারা গঠিত। মনে হয় 'বৈজয়ন্ত' শব্দ দ্বারা প্রাণের সেই প্রথম আবির্ভাবকে ইংগিত করা হয়েছে।

পিতাকে আনন্দিত করার উদ্দেশ্যে নিমি দীর্ঘসত্র, অর্থাৎ বহুকাল ব্যাপী যজ্ঞ করার মনস্থ করেন।

প্রাণকোষ হতে গুপ্তবীজি উদ্ভিদের আবির্ভাবের মধ্যে বহু সময় অতি-বাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়কালকে ইংগিত করার জন্য কাহিনীতে বলা হয়েছে নিমি পাঁচ হাজার বছর যজ্ঞ করেছিলেন।

মহর্ষিগণ নিমির চেতনাহীন দেহ অবলম্বন করে যজ্ঞ-দীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে শবদেহ রক্ষা করতে লাগলেন। অর্থাৎ, ফসল তোলার পর বীজ সংরক্ষণ

করা হয়। যজ্ঞ শেষে ভৃগু স্থির করলেন নিমির চেতনা পুনরানয়ন করবেন। আর দেবগণ নিমি-চেতনাকে নেত্রে স্থাপন করে বললেন, 'প্রাণীগণ বিশ্রামার্থ তোমার জন্য নিমেষধর্ম পাবে'। শস্যদানা পেকে গেলে তার আর কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না যতদিন না উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপন করে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। এই শস্যদানা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হলে একাধিক বৎসর পরেও সেই দানা হতে অঙ্কুরোদগম হবে।

নিমেষ বা নিমেয় অর্থ পরিবর্তন। অতএব নিমি-চেতনার পুনরানয়ন বীজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতঃপর মহর্ষিগণ অর্থাৎ ভৃগু, অত্রি ও অঙ্গিরা নিমির শবদেহে অরণি নিক্ষেপ করে মন্থন করতে শুরু করলেন।

ভৃগু অর্থ পর্বতের সানুদেশ, অর্থাৎ মৃত্তিকা। সহজাত বৃক্ষ বা গুল্মের বীজ মাটিতে পড়ে থাকে। পুনরায় বর্ষাকালে ঐ বীজ হতে চারার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং মৃত্তিকা বীজকে ধারণ করে যথাসময়ে বীজের সুপ্ত প্রাণকে জাগরিত করে।

অত্রির নেত্রনীর হতে জাত চন্দ্র। চন্দ্র অর্থ জল। এই সুবাদে অত্রি জলের প্রতিভূ। অত্রি অর্থ জনক ; জল ছাড়া বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না, এই কারণে জল জনকের ভূমিকা পালন করছে।

অঙ্গিরা অর্থে অগ্নি।

অরণি অর্থ যাহা অগ্নিজনক, অর্থাৎ তাপের প্রতীক।

মন্থন অর্থে বীজদেহে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হেতু পরিবর্তন।

এই যোগাযোগগুলির ভিতর দিয়ে অঙ্কুরের প্রথম প্রকাশ ; কাহিনীতে যার নামকরণ হয়েছে মিথি। এরই অপর নাম জনক। অঙ্কুরের দু'টি স্তর ধরা যায়। প্রথমতঃ, বীজদেহে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হেতু বীজের আবরণের ভিতরেই অঙ্কুরের বিকাশ। দ্বিতীয় স্তরে আবরণ ভেদ করে অঙ্কুরের বহির্প্রকাশ।

প্রথমটিকে মিথি এবং দ্বিতীয়টিকে জনক বলা যায়। যেহেতু চেতনাহীন বীজ হতে পুনরায় চেতনার প্রকাশ, একারণে বৈদেহ।

বসিষ্ঠর শাপে যেমন নিমি কায়াহীন হয়েছিলেন ; তেমনি নিমির শাপেও বসিষ্ঠ কায়াহীন হন। নিমি-কাহিনীতে উভয়ের শাপ ও প্রত্যাভিশাপের পরই কায়াহীন বসিষ্ঠর পুনরায় কায়ালাভের উপাখ্যানটি ব্যক্ত করা হয়েছে।

শরীরহীন হয়ে বসিষ্ঠ শরীর লাভের আশায় পিতা ব্রহ্মার নিকট গিয়ে বায়ুরূপেই বললেন, 'ভগবান দেবর্ষিদেব মহাদেব, আমি রাজা নিমির শাপে অশরীরি হইয়া সম্প্রতি বায়ু হইয়া আছি, প্রভো, দেহহীন হইলে সকলেরই নিতান্ত দুঃখ হইয়া থাকে এবং দেহহীন ব্যক্তির সকল কার্যই বিলুপ্ত হয়, সুতরাং অন্য দেহ প্রদান করিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।'

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বললেন, 'তুমি মিত্রাবরুণ সম্ভূত তেজে প্রবিষ্ট হও। মিত্রাবরুণ তেজে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অযোনিজ হইবে এবং অশেষ ধর্ম উপার্জন করিয়া পুনরায় প্রজাপত্য লাভ করিবে।'

এই কথা শুনে ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করে বসিষ্ঠ বরুণালয়ে গেলেন। সে সময় মিত্রদেবও ক্ষিরোদরূপী বরুণের সঙ্গে মিলে রাজত্ব করছিলেন। এমন সময়ে অপ্সরা-প্রধানা উর্বশী সখীগণ-পরিবেষ্টিতা হয়ে সেচ্ছাক্রমে সেখানে এলো। বরুণ উর্বশীকে মৈথুন নিমিত্ত প্রার্থনা করলে উর্বশী জানাল, 'স্বয়ং মিত্রদেব পূর্বেই আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন।'

তখন বরুণ বললেন, 'সুশ্রোণি, এই দেবনির্মিত কুম্ভে আমি বীর্য্য পরিত্যাগ করিব, তুমি যদি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে এই রূপে বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব।'

উর্বশী বলল 'প্রভো, আমার হৃদয় তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত এবং আমার প্রতি তোমারও অধিক অনুরাগ, কিন্তু সম্প্রতি আমার দেহ মিত্র-দেবের অধীন।'

উর্বশীর এই কথা শুনে বরুণ প্রজ্বলিত অনলতুল্য স্বীয় মহৎ অদ্ভুত রেতঃ সেই কুম্ভে নিক্ষেপ করলেন।

এরপর উর্বশী মিত্রদেবের কাছে হাজির হলে, মিত্রদেব ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে বললেন, 'রে দুষ্টা, আমি পূর্বে তোমাকে অভিলাষ করিয়াছি। সুতরাং তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য পতিকে ভজনা করিলে? এই অপরাধে আমার কোপে পতিত হইয়াছ, এজন্য তুমি কিছুকাল নর-লোকে বসতি করিবে।'

মিত্রদেব আরও বললেন, 'তুমি বুধের পুত্র কাশিরাজ পুরূরবার নিকটে যাও, তিনি তোমার ভর্তা হইবেন।'

এইভাবে উর্বশী শাপগ্রস্তা হয়ে প্রতিষ্ঠান নগরে পুরূরবার নিকট হাজির হল। উর্বশী শাপবশতঃ বহু বৎসর নরলোকে বাস করে শাপমুক্ত হয়ে ইন্দ্রের সভায় ফিরে গিয়েছিল।

এদিকে মহাত্মা মিত্র ও বরুণের তেজঃপুঞ্জ সেই কুম্ভে পতিত হয়ে দুইজন তেজোন্ময় ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্ভূত হয়েছিলেন। যে কুম্ভে বরুণবীর্য পরিত্যক্ত হয়েছিল মিত্রদেব ঊর্বশীকে উদ্দেশ্য করে সেই কুম্ভে প্রথমতঃ যে তেজঃ নিকেষ করেন, তা'তে অগস্ত্য উৎপন্ন হয়ে মিত্রকে 'আমি তোমার পুত্র নহি' এই কথা বলে প্রস্থান করলেন। কিছুকাল পরে ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা তেজস্বী বসিষ্ঠ,—মিত্র এবং বরুণ উভয়ের তেজঃ প্রভাবে সেই কুম্ভ হতে উৎপন্ন হলেন।[৩]

নিমি প্রসঙ্গে এই উপাখ্যানটি জুড়ে দেওয়ায় ধরে নেওয়া যায় বীজের অঙ্কুরোদগম তথ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। এই উপাখ্যান মূলতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান তথ্যের রূপক।

শতভিষা নক্ষত্রে বৈদিক নাম বরুণ। মিত্র অর্থে সূর্য। কুম্ভ রাশির শতভিষা নক্ষত্রে উত্তরায়ণাদির ইংগিত এখানে রাখা হয়েছে। ঊর্বশী ছায়া-পথ তথা সুরগঙ্গার প্রতীক। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রর বৈদিক নাম ইন্দ্র।

ইন্দ্রযজ্ঞ অর্থে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শারদবিষুব। এক হাজার বছর পরে শারদবিষুব যখন অনুরাধা নক্ষত্রে, তখন উত্তরায়ণ শতভিষা নক্ষত্রে এবং বাসন্তবিষুব রোহিনী নক্ষত্রে, যার বৈদিক নাম বিধাতা (ব্রহ্মা)। অয়নচলন হেতু বিষুবস্থানের পরিবর্তনের ইংগিত দেওয়ার জন্য কাহিনীতে নিমির শাপে বসিষ্ঠর বিদেহ হওয়া। কায়ালাভের জন্য বসিষ্ঠ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন ; এই বক্তব্যর দ্বারা রোহিনী নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব ইংগিত করা হয়েছে।

অতঃপর বরুণালয়ে ; অর্থাৎ, শতভিষা নক্ষত্রে উত্তরায়ণের ইংগিত। এই নক্ষত্রটি ছায়াপথে নিমজ্জমান, এজন্য বলা হয়েছে ঊর্বশীর হৃদয় বরুণের প্রতি আসক্ত এবং বরুণেরও তার প্রতি অনুরাগ আছে। সেকালের উত্তরায়ণ দিনে সূর্য শতভিষা নক্ষত্রে অবস্থান করত। সূর্যর ক্রান্তিপথে শতভিষা নক্ষত্রে অবস্থান অল্প সময়ের জন্য, সুতরাং ছায়াপথে সূর্যর অবস্থান সাময়িক ; এই কারণে ঊর্বশী মিত্রদেবকে প্রাধান্য দেয়।

যে কুম্ভে বরুণবীর্য পরিত্যক্ত হয়েছিল মিত্রদেব ঊর্বশীর উদ্দেশ্যে সেই কুম্ভে প্রথমতঃ যে তেজঃ নিকেশ করেন তাতে অগস্ত্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রে সূর্য অস্ত গেলে (দিবাবসানে সূর্যতেজ থাকে না, যেন তেজ পরিত্যাগ করা হল) তখন অগস্ত্য তারার উদয় হয়। এই নক্ষত্রটি সূর্যর ক্রান্তিপথের অনেক দূরে এই কারণে কাহিনীতে বলা হয়েছে অগস্ত্য উৎপন্ন

হয়েই মিত্রকে বলেছিল, আমি তোমার পুত্র নই।

অনুরূপ, শতভিষানক্ষত্রে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে বসিষ্ঠ তারার উদয় হয়।

সুতরাং বাহ্যিকভাবে উপাখ্যানটি অলীক ও অশ্লীল মনে হলেও মূলতঃ একটি সময়কালের অয়নস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। মিত্রদেবের অভিশাপে উর্বশী কিছুকাল নরলোকে কাশিরাজ বুধের পুত্র পুরূরবার ভার্যা হয়েছিল।

এখানে 'কাশি' শব্দটিকে স্থানবাচক ধরা হলে পুরূরবার প্রতিষ্ঠান নগর অর্থে বর্তমানের গঙ্গাতীরবর্তী বারানসী, যা অতি প্রাচীনকাল হতেই প্রতিষ্ঠিত নগরী। উপাখ্যানের এই প্রসঙ্গে স্বর্গঙ্গার পরিবর্তে মর্তের গঙ্গানদীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বুধ অর্থে জ্ঞানী। এখানে বলা যায় কাশির রাজাগণ হয়ত প্রথম কৃষি সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ণ করেছিলেন। যেমনটি দেখা যায় অন্যান্য পুরাণে মিথিলার জনক রাজা স্বহস্তে হলকর্ষণ করছেন। নিমি প্রসঙ্গে উর্বশী পুরূরবা কাহিনীর অবতারণা করায় এই চরিত্র দুটিকে এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

বীজদেহে অংকুর উন্মেষের পরবর্তী পর্যায়ের নাম উদাবসু।

উদ্, (ঊর্দ্ধ্ব, উৎকর্ষ, প্রাকট্য, প্রকার, বিভাগ, শক্তি ভাব, প্রাধান্য, বন্ধন)—আ (বৈশিষ্ট্য অর্থে)—বসু (রত্ন, ধন, জল, বকবৃক্ষ, অনল, রশ্মি)। তাহলে উদাবসু শব্দের অর্থ দাঁড়ায় জল বা অনল বা রশ্মির বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ। অর্থাৎ, অঙ্কুরের বহিপ্র্রকাশ। এই অবস্থায় সকল বীজের অঙ্কুরের রং সাদা এবং পাতলা আবরণের মধ্যে খানিকটা জলীয় পদার্থ থাকে মাত্র।

অঙ্কুরের প্রথম প্রকাশিত অংশ পরবর্তীকালের শিকড়, দ্বিতীয় ধাপে কাণ্ডর আবির্ভাব ; অর্থাৎ, নন্দিবর্দ্ধন। নন্দি (দ্যুত্যঙ্গ, আনন্দ) বর্দ্ধন (বৃদ্ধি)। দ্যুত্যঙ্গ,—দ্যুৎ (কিরণ) + অঙ্গ ; অর্থাৎ, আনন্দে যে বৃদ্ধিলাভ করে, ভাবার্থে গাছের উপরাংশ—যা মাটি ভেদ করে প্রকাশ পায়। বিজ্ঞান পরিভাষায় উদাবসু এবং নন্দিবর্দ্ধন হল যথাক্রমে ভ্রূণ-মূল এবং ভ্রূণ-মুকুল (Protuding of radicle and then exposure of plumule)।

পরবর্তী পর্যায় সুকেতু,— সু (সুন্দর) কেতু (স্থান, চিহ্ন, ধ্বজ) যার। সুন্দর ধ্বজ ; অর্থাৎ, ভ্রূণ-মুকুলে পাতার বিকাশ। এ অবস্থায় তখনও পাতা সমেত অঙ্কুরের রং সাদা। তার কারণ ক্লোরোফিলের আবির্ভাব ঘটেনি। ভ্রূণ-মুকুল বা ভ্রূণ-কাণ্ডে সবেমাত্র পাতার বিকাশকে বলা হয়েছে সুকেতু।

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০-১৫

এই ক্ষীণ অবস্থার আরেক নাম দেবরাত। এই দেবরাত দেবতাগণের নিকট হতে হরধনু প্রাপ্ত হন। হর (শিব, অগ্নি, গর্দভ) ধনু (চাপ, পিয়াল বৃক্ষ, তৃণতা, ব্রণতা, তৃণত্ব, কাণ্ড)। অর্থাৎ, দেবরাত পর্যায়ে অগ্নিসংযুক্ত তৃণত্বলাভ,—ক্লোরোফিলের আবির্ভাব। দেবরাত,—চারার ক্ষীণাবস্থায় আপনার পরিচয় প্রকাশ অর্থাৎ কোন্ গোত্রিয়।

এবার বৃহদ্রথ,—বৃহৎ (মহান) যার রথ (দেহ); মহানদেহী। অন্য অর্থ ইন্দ্র (সূর্য)। এবার ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যকিরণ হতে আহার সংগ্রহ শুরু হওয়ায় রং সবুজ হয়ে চারাগাছে পরিণত হয়েছে।

পরের অবস্থা মহাবীর। মহাবীর অর্থ হনুমান (মরুতাত্মজ)। হনুমান জন্মগ্রহণ করেই উদিয়মান সূর্যকে ভক্ষ্যবস্তু মনে করে ঊর্ধ্বে ঝাঁপ দিয়েছিল। বৃক্ষশিশুও অনুরূপ উর্ধ্বগতি লাভ করে। এই তথ্য প্রকাশের কারণে এই পর্যায়কে মহাবীর আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

উদাবসু হতে সুকেতু, দেবরাত, বৃহদ্রথ ও মহাবীর পর্যন্ত বিজ্ঞান পরিভাষায় বলা যায় ভ্রূণ-মুকুল হতে চারার তিন বা চারটি পত্রের উন্মীলন পর্যায়।

সুধৃতি,—সু (সুন্দর) ধৃতি (ইষ্টি, তুষ্টি, ধৈর্য্য, কারণ, সুখ)। অতি সুখে মানুষ যেমন ডগমগ হয়, চারাগাছও এই অবস্থায় সুপুষ্ট। এই অবস্থায় চারাগাছের ডালপালা বা ঝাড়ের বিস্তার ঘটে। শস্যচাষে চলিত কথায় বলে 'বিয়েন ছাড়া।' অর্থাৎ, দেহজ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি চারাগাছের গায়ে কতিপয় নতুন চারার উদ্ভব। (Tillering phase)।

প্রগলভতা প্রকাশের নাম ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্ট (প্রগলভ, উদ্ধত, নির্লজ্জ) কেতু। ধৃষ্টকেতু হল চারার পরিপূর্ণতা লাভ হেতু মঞ্জরী ধারণের উপযুক্ত অবস্থা। (Panicle premordial stage)।

হর্যশ্ব অর্থ ইন্দ্র, হরিৎবর্ণ অশ্ব, ইন্দ্রাশ্ব। হরি অর্থ সিংহরাশি। পুষ্যা নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদিতে বর্ষাঋতুর শুরু হলে সূর্যর সিংহরাশিতে অবস্থানকালে পুরো বর্ষা। চাষের জমিতে তখন সবুজের মেলা। চারাগাছের এই যৌবনের রংএর সঙ্গে হরিৎ বর্ণ সূর্য-রশ্মির সামঞ্জস্য টেনে পর্যায়টিকে হর্যশ্ব বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মঞ্জরী উন্মোচন অবস্থা (Panicle initiation stage)।

এবার প্রতীন্ধক। প্রতি—(প্রতিনিধি, মুখ্যসদৃশ, লক্ষণ, স্বভাব) + ইন্ধ্ (প্রজ্জ্বলিত করা) + অক (চিহ্ন করণ)। অর্থাৎ, গাছের ভবিষ্যৎ

প্রতিনিধিকে উদ্ভাসিত করণ। বীজ (প্রতিনিধি)-এর আবির্ভাব ঘটানোর জন্য ফুল ফোটার পূর্বমুহূর্ত, যাকে বলে কুঁড়ি আসা, শস্যের ক্ষেত্রে 'থোর নামা'। এই পর্যায়ের পর ফুল ফোটে, নিজের রূপগন্ধ ছড়িয়ে গর্ভকোষের পুষ্টি-সাধনের ব্যবস্থা করে।

হর্যশ্ব এবং প্রতীন্ধক এই দুই পর্যায়ের মাঝে আরেকটি পর্যায় আছে। চাষীরা শস্যক্ষেতের গাছ দেখে পর্যায়ক্রমে মন্তব্য করে, 'থোর গিলবে' (হর্যশ্ব), 'থোর গিলেছে' (মরু) এবং 'ফুলাবার সময় হয়েছে', অর্থাৎ থোর বা শীষের বহিপ্রকাশ ঘটছে (প্রতীন্ধক)।

'থোর গিলেছে' পর্যায়ের নাম মরু। মরু অর্থ পর্বত। পর্বত,—পর্বন্ + ত (তপ্) অস্যার্থে। অর্থ পর্বযুক্ত, পর্ববান মেঘ। পর্বন্ শব্দের অর্থ লক্ষণভেদ, বৎসরের বিশেষকাল—বিষুবায়নকাল ইত্যাদি। অতএব 'মরু' শব্দ দ্বারা এখানে শস্যগুল্মের লক্ষণান্তর ইংগিত করা হয়েছে যা শারদবিষুব কালে ঘটে থাকে। ইক্ষ্বাকু বংশের 'মরু' শব্দটি বিশ্লেষণে অর্থ ধরা হয়েছিল জলশূন্য স্থান। একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের এটি সুন্দর উদাহরণ। মরু ও প্রতীন্ধক হল মঞ্জরীর উন্মেষ (Boot stage)।

প্রতীন্ধকের পর কীর্তিরথ। কীর্তি অর্থ যশ, সমজ্ঞা, প্রসাদ, শব্দ, দীপ্তি, বিস্তার। কীর্তিরথ অর্থে যে দেহ শব্দময় (স্পন্দনময়) বা দীপ্তিময়। এই তালিকায় পরবর্তী পর্যায়ে আরও একবার এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তখন অর্থ দাঁড়াবে বিস্তারিত দেহ, তাকেও অবশ্য দীপ্তিময় বলা যায়। কীর্তিরথ পর্যায়ে মঞ্জরী-পত্রের বৃদ্ধি (Panicle size is increasing and the flag leaf enlarges)।

গাছের বৃন্ত ভেদ করে শীষের আত্মপ্রকাশ মুহূর্ত, যার পরই শীষ দেখা যাবে। এই অবস্থার নাম দেবমীঢ়। দেব (মেঘ) + মীঢ় (মূত্রিত, কৃতমূত্র, মূতিয়াছে এরূপ)। শব্দটি অদ্ভুত, কিন্তু বক্তব্যটি সুন্দর। শস্য গাছের মূল হতে শীষের উদ্ভব ঘটে। শিকড় মাটি হতে জল টানে। সেই জলই যেন আগামী দিনের শীষ। শীর্ষটি গাছের প্রতিটি গুছির মধ্যভাগ দিয়ে উপরের দিকে উঠে একটা ডাঁটা (Stem) সৃষ্টি করে। শেষে বৃন্ত ভেদ করে আত্ম-প্রকাশ। গাছ যেন উপস্থি, মূত্রাশয় জলসিক্ত মৃত্তিকা, ডাঁটা (Stem) মূত্রনালী আর শীষ মূত্রাশয় হতে মূত্র নির্গমনের বহিপ্রকাশ। শীষের উদ্ভব ও পুষ্টি জলের উপর নির্ভরশীল। দেবমীঢ় শব্দে তাই সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে কলাগাছের উদাহরণ দেওয়া যায়। ফলন্ত কলাগাছের বাকল

ছাড়ালে ভিতরে দেখা যাবে মূল হতে মোচা পর্যন্ত খোরের বিস্তার। ধান, গম ইত্যাদি শস্যগাছেও এই প্রকারই ঘটে।

এবার শীষের পুষ্পিত হওয়ার পালা। এই প্রক্রিয়ায় থাকে চন্দ্রকিরণের প্রভাব। সুতরাং চন্দ্রকিরণের প্রতিক্রিয়া বুঝাতে এই পর্যায়ের নাম বিবুধ। শব্দটির অর্থ দেব, পণ্ডিত, চন্দ্র। বিবুধ ও দেবমীঢ় হল পুষ্পাবস্থা। শস্যগুল্ম যথা ধান স্বপরাগী; পুষ্পবিন্যাস পুষ্পবৃন্তের নিম্নাংশ হতে ঊর্ধ্বাংশে সজ্জিত হয় (Flowering stage—Paddy self pollinated crop. It starts from node portion i. e. from downward to upward)।

এবার মহীধ্রক। মহীধ্র অর্থ পর্বত; অর্থাৎ, পুনরায় লক্ষণান্তর বুঝাচ্ছে। লক্ষণের কি পরিবর্তন হয়? শীর্ণ শীর্ষে খুব ছোট ছোট ফুল ফোটে, ধীরে ধীরে পুষ্টল হয়, দানার আবির্ভাব ঘটে। ধানচাষের ক্ষেত্রে দানার তরল অবস্থাকে বলে 'দুধ', তার পরের অবস্থা 'চাল গেলা' (গলাধঃকরণ)। এই অবস্থা প্রকাশ করার জন্য পুনরায় 'কীর্তিরথ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। মহীধ্রক ও কীর্তিরথ শব্দ দুটিতে দুগ্ধাবস্থা (Milk stage) বুঝান হয়েছে।

ধান, গম ইত্যাদি শস্যদানা একাধারে খাদ্যবস্তু এবং বীজ। এই দানা বা বীজের তিনটি অংশ। উপরের আচ্ছাদনটি লম্বা কেশরযুক্ত, তার নীচে স্বর্ণাভ পাত্‌লা একটি খোসা এবং শেষে মূল দানা বা বীজ। ধানে প্রথমে কেশরযুক্ত তুঁষ, তার নীচে ভূষি বা কুঁড়ে এবং শেষে চাল (অর্থাৎ দানা)। গমেও তাই। শস্যদানার এই তিন অবস্থা বুঝাতে মহারোমা, স্বর্ণরোমা এবং হ্রস্বরোমা নাম করণ করা হয়েছে। রোম অর্থ লোম, তনুরুহ (দেহজাত)। শস্যের দুগ্ধাবস্থা ক্রমশঃ বাষ্পীভবণ প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন হয়ে পূর্ণ শস্য দানায় পরিণত হয়। মূল দানার উপরে ভূষি এবং তার উপরে তুঁষ (Hard grain with bran and husk—daugh stage)।

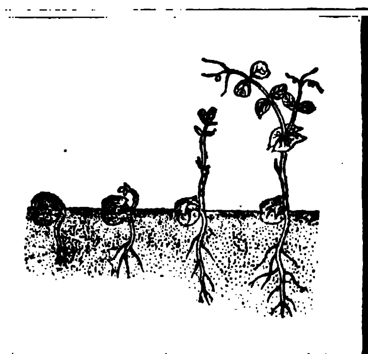
দানা বা বীজের (হ্রস্বরোমার) দুই পুত্র, সীরধ্বজ এবং কুশধ্বজ।

সীরধ্বজ = সীর (সূর্য, হল, অর্কবৃক্ষ) ধ্বজ (চিহ্ন)।

কুশধ্বজ = কুশ (জল) ধ্বজ (চিহ্ন)।

অর্থাৎ, বীজ বা দানার (হ্রস্বরোমা) পুষ্টি ও পরিপক্কতার জন্য জল এবং সূর্যতাপ উভয়ই প্রয়োজন। যেহেতু এর পরই শস্যজাতীয় উদ্ভিদের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়, সেকারণে জনক বংশের এখানেই অবলুপ্তি। সীরধ্বজের

কন্যা হিসাবে অযোনিসম্ভূতা সীতার আবির্ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধ্যায়। এখানে 'সীর' শব্দে 'হল' অর্থ ধরে ভূমিকর্ষণ ক্রিয়াকে ব্যক্ত করা হয়েছে। রামায়ণ এবং অন্যান্য পুরাণে জনকরাজ সীরধ্বজকে প্রথম হলকর্ষণ করতে দেখা যায়। জমি চাষের পর বীজবপন করে কৃত্রিম উপায়ে ফসল উৎপাদনের জন্য হল (লাঙ্গল)-কে যিনি নিজের কার্যক্রমের প্রতীক (ধ্বজ) হিসাবে গ্রহণ করেন, তিনি সীরধ্বজ ; অর্থাৎ কৃষক। এই কারণে তিনি বিশেষভাবে চিহ্নিত একজন জনক। যজ্ঞে অর্থাৎ যথাসময়ে ভূমিকর্ষণকালে সীতা প্রাপ্ত। জমিতে হলকর্ষণ করলে ফালের মুখে যে অগভীর নালা সৃষ্টি হয় তার নাম সীতা। অপর কন্যা ঊর্মিলার জন্ম সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এই সীতা-সমন্বিত জমিকে দেখায় যেন ঊর্মি(ঢেউ)ময়। সীতার পরে ঊর্মির প্রকাশ ঘটে, একারণে ঊর্মিলা কনিষ্ঠা।



একাদশ প্রকরণ

বায়স-মন্থরা-ত্রিশঙ্কু পরিচয়

বনবাসকালে রাম ভ্রাতা ও স্ত্রীসহ কিছুকাল চিত্রকুট পর্বতে বাস করেছিলেন। এখানে বসবাসকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যার বিবরণ অভিজ্ঞান হিসাবে রামকে জ্ঞাপন করানোর কারণে সীতা অশোকবনে বন্দিনী থাকাকালে হনুমানকে বলেছিলেন।

চিত্রকুট পর্বতের পাদদেশে উত্তর-পূর্বে অর্থাৎ ঈশাণকোণে প্রচুর ফলমূল ও জলপরিপূর্ণ পর্বতময় একটি স্থান আছে। মন্দাকিনী নদীর অতি দূরদেশস্থ সিদ্ধাশ্রিত সেই দেশে রাম যখন বাস করছিলেন, সেই সময় একদিন আর্দ্রগাত্র হয়ে রাম সীতার কোলে উপবেশন করেছিলেন। তখন এক বায়স মাংসাভিলাষী হয়ে সীতার স্তনাভ্যন্তরে চঞ্চুপুট দ্বারা আঘাত করে। সীতা ঢিল ছুঁড়ে বায়সকে তাড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই বলিভোজী বায়স বারংবার নিবারিত হয়েও তাঁর বক্ষস্থল বিদারণকরতঃ সেখানেই লীন হয়ে থাকল, কিছুতেই অন্যত্র গমণ করল না। তখন সীতা পাখির উপর রাগ করে বস্ত্রের গ্রন্থি দৃঢ় করার জন্য কাঞ্চিদাম আকর্ষণ করতে উদ্যত হলে, তাঁর বসন স্খলিত হল। সীতার সেই অবস্থা দেখে রাম হেসেছিলেন। সীতা রাগান্বিতা, লজ্জিতা ও ভক্ষ্যলোলুপ-বায়স কর্তৃক বিদারিত হয়ে রামের সমীপে গিয়ে স্বামীর কোলে বসে শ্রান্তিবশতঃ ঘুমিয়েছিলেন। এইভাবে উভয়ে পর্যায়ক্রমে উভয়ের কোলে ঘুমিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে বায়স পুনরায় এসে হাজির হল। সীতা জেগে গিয়ে স্বামীর কোল হতে উঠছেন এমন সময় কাক হঠাৎ এসে সীতার বক্ষঃস্থল নখর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করল। সীতার বক্ষঃস্থল হতে শোণিতবিন্দু ক্ষরিত হল, অতঃপর ক্ষরিত শোণিতবিন্দু শরীরে পতিত হওয়ায় রামের নিদ্রাভঙ্গ হলে সীতার স্তনমধ্যে ক্ষত দেখে এবং বায়সের কীর্তি অবগত হয়ে রাম সেই বায়সের বিনাশ বাসনা করলেন।

শক্র-পুত্র এই বায়স বিপদ অনুধাবন করে বায়ুবেগে ধরান্তরে দ্রুত পলায়ন করল। তখন ক্রুদ্ধ রাম দর্ভ-মুষ্ঠি হতে একটি দর্ভ নিয়ে মন্ত্রপুত করে ব্রহ্মাস্ত্রে যোজিত করলে সেই দর্ভ জ্বলন্ত কালাগ্নির ন্যায় বায়সের অভি-মুখে প্রজ্বলিত হল। নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত দর্ভ পশ্চাদ্‌ধাবন করলে বায়স কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শেষে রামের শরণাগত হল। রাম দয়াপরবশতঃ প্রাণরক্ষা করে বায়সকে বললেন, ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হওয়ার নয়। অতএব বল তোমার কি সংহার করব ?

বায়স বলল, আমার দক্ষিণচক্ষু ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সংহার্য হউক।

বায়সের দক্ষিণচক্ষু বিনষ্ট হল। তারপর সে রাম ও দশরথকে নমস্কার করে নিজের ঘরে প্রতিগমণ করল।[১]

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় বায়স অর্থাৎ কাক তার স্বভাববশে কোন ভক্ষ্যবস্তুর দিকে লক্ষ্য স্থির করার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে, যেন তার একটি চোখ অন্ধ। কিন্তু কাকের দুই চোখেই দৃষ্টিশক্তি আছে। কাকের এই স্বভাব অবলম্বন করে আদিকবি বায়স-কাহিনী রচনা করেছিলেন এই ধারণা হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে একটি কাক স্খলিতবসনা কোন প্রাণময়ী রমণীর স্তনাভ্যন্তরে ঠোকর দিতে পারে কি ? আর দিলেও নিবারণ করলে নিশ্চয় উড়ে যাবে, সেখানে লীন হয়ে থাকবে না। উপরন্তু এই ঘটনার কালে রাম সীতার কোলে বসেছিলেন। সুতরাং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঘটনা। অথচ এই অবাস্তব ঘটনাটি বন্দিনী সীতা অভিজ্ঞানস্বরূপ রামকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

আরও লক্ষ্যণীয় যে ঘটনাটি ঘটেছিল চিত্রকুট পর্বতের প্রত্যন্তদেশে অবস্থানকালে। কিন্তু ঘটনাটির উল্লেখ করা হল অনেক কাল পরে, যখন হনুমান লংকার অশোকবনে সীতার সন্ধান পেয়ে ফিরে আসার সময়ে রামের জন্য কোন অভিজ্ঞান প্রার্থনা করল। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে বন-বাসকালে রামসীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লক্ষ্মণ সকল সময়ে সচেতন থাকতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে সেই ভূমিকা পালন করতে দেখা গেল না। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে কাহিনীটি অলীক মনে হলেও যেহেতু এইটি অভিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেকারণে এর রহস্য-বক্তব্য মানতে হবে।

বলিভোজী মাংসাশী বায়স শক্র-পুত্র।

শক্র অর্থ ইন্দ্র, দ্বাদশাদিত্যের এক আদিত্য। আদিত্য অর্থে সূর্য।

ইন্দ্র অর্থ যিনি প্রভুত্ব করেন। সুতরাং শক্র-পুত্র শব্দটি ব্যবহার করে রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলতঃ শক্র-পুত্র অর্থে সূর্য-পুত্র অর্থাৎ শনিগ্রহ বুঝতে হবে। শনিগ্রহকে আরেকটি কারণেও শক্র-পুত্র বলা যায়। বৃহস্পতি গ্রহ যেমন পুষ্যা নক্ষত্রে প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ায় পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম বলা হয়, তেমনি শনিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছিল অনুরাধা নক্ষত্রে। জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রির আকাশে আবিষ্কৃত হওয়ায় শক্র-পুত্র, কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসের আদিত্যর নাম ইন্দ্র বা শক্র। এছাড়া কাক অর্থ খঞ্জ ; শনিগ্রহও পঙ্গু।

কাক যেমন ঘাড় বেঁকিয়ে শিকার সন্ধান করে, শনিগ্রহও তেমনি নিজ কক্ষপথে তির্যকভাবে অবস্থিত হয়ে পরিভ্রমণ করে। শনিগ্রহ প্রাচীন মতে কৃষ্ণবর্ণ। কাক দ্বিজ (পক্ষী), শনিও পুরাণ মতে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ)। এই সূত্রগুলির সুযোগে শনিগ্রহ নিয়ে আদিকবি রূপক সৃষ্টি করেছেন।

রামের জন্মকালে শনিগ্রহ সুউচ্চ স্থানে ছিল। তুলারাশির ০° হতে ২০° অংশ অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্রর দ্বিতীয় পাদ হতে স্বাতী নক্ষত্রর সম্পূর্ণ শনি-গ্রহর তুঙ্গস্থান।

অতএব রামের জন্মকালে শনিগ্রহ যদি তুলা রাশিতে চিত্রা নক্ষত্রে ১৮৪°৪০′ (একশত চুরাশি অংশ চল্লিশ কলায়) থাকে, তাহলে রামের বনগমন কালে অর্থাৎ রামের চব্বিশ বছর তিন মাস বয়সকালে শনিগ্রহর অবস্থান হয় কর্কট রাশিতে অশ্লেষা নক্ষত্রে ১১৫°৪০′ (একশত পনের অংশ চল্লিশ কলায়)। এই হিসাব মত শনিগ্রহর উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে ১৪৬°৪০′ (এক-শত ছিচল্লিশ অংশ চল্লিশ কলায়) সংক্রমণ হয় রামের বয়স যখন ছাব্বিশ বছর দশমাস এবং শনিগ্রহর এই নক্ষত্র অতিক্রম করার কালে রামের বয়স আন্দাজ সাতাশ বছর এগারো মাস দশদিন। এই দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায় রামের বনবাসকালে এক তিথিতে শনিগ্রহর উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে সংক্রমণ হয়েছিল এবং প্রায় তেরো মাস পরে পুনরায় ঐ নক্ষত্রকে বক্রীগতিতে স্পর্শ করে মার্গী হয়ে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিল। বায়স কাহিনীতে এই সময়কাল নির্দেশ করা হয়েছে।

চিত্র অর্থ আকাশ। কুট শব্দে ছেদক ধরা যায়, কুট অর্থে ছেদন ধরে নিয়ে। অতএব চিত্রকুট শব্দে আকাশ-ছেদক ; অর্থাৎ, রবিপথ ও পৃথিবীর আবর্তন পথ যে বিন্দুতে ছেদ করছে,—শারদ ও বাসন্ত বিষুব স্থানদ্বয়। অপরদিকে চিত্রকুট শব্দে চিত্রা নক্ষত্র-সমম্বিত গৃহ—এই অর্থও হয়। রামায়ণের কালে চিত্রা নক্ষত্রর শেষপাদে শারদ-বিষুব হত। একথা

রামায়ণের একাধিক উপাখ্যান বিশ্লেষণ করে প্রমাণ রেখেছি। সুতরাং চিত্রকুট শব্দের উপরোক্ত দুই অর্থভেদেই আকাশের চিত্রা নক্ষত্রকে ইংগিত করছে। চিত্রা নক্ষত্রর উত্তর-পূর্বে অর্থাৎ ঈশাণ কোণে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রর অবস্থান।

চিত্র অর্থ আকাশ ধরে, চিত্রকুট শব্দে আকাশের তুঙ্গস্থান অর্থাৎ দক্ষিণায়নাদি স্থানও ধরা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও রামায়ণের কালের দক্ষিণায়নাদি স্থান পুষ্যা নক্ষত্রর ঈশাণকোণে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রর অবস্থান।

উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র ছায়াপথ হতে অনেক দূরে অবস্থিত। কাহিনীতে মন্দাকিনী শব্দে ছায়াপথ বুঝানো হয়েছে।

এই কাহিনীতে রাম ও সীতা যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রর প্রতীক। সূর্য ও চন্দ্রর বিভিন্ন অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন মাস বা ঋতু নির্দেশ করে।

সুতরাং কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও সূর্য ও চন্দ্রর অবস্থান অনস্বীকার্য। অতএব মেঘদেবতা রাম ও কৃষিশ্রী সীতাকে যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা চলতে পারে।

বায়সের আক্রমণের পূর্বে রাম আর্দ্রগাত্রে সীতার কোলে উপবেশন করেছিলেন। এখানে আর্দ্রগাত্র শব্দে ছায়াপথে নিমগ্ন শতভিষা নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থান। চন্দ্রর দীপ্তি সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে। পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যর বিপরীতে চন্দ্রর অবস্থানহেতু পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্য। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বর রূপক বর্ণনা হল সীতার (চন্দ্রর) কোলে রামের (সূর্যর) উপবেশন। অনুরূপভাবে, অমাবস্যা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র একই অংশে থাকে. একারণে কাহিনীতে বলা হয়েছে রামের কোলে সীতার উপবেশন। বায়সের প্রথম আক্রমণের দিন চন্দ্র উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শনিগ্রহর ঐ নক্ষত্রে সংক্রমণ। শনিগ্রহ উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র স্পর্শ করে বক্রী হয়েছিল ধরা যায়, এই কারণে যে তাড়না সত্ত্বেও বায়স সীতার বুকে লীন হয়েছিল। শনি-গ্রহ বক্রী ও মার্গী হওয়ার প্রাক্কালে গতি এতই মন্দ হয় যে কয়েক দিন মনে হয় গ্রহটি যেন নিশ্চল হয়ে আছে।

সীতার বস্ত্রস্খলন অর্থে চন্দ্রর উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র ত্যাগ করে পরবর্তী নক্ষত্রে সংক্রমণ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন একদা বৈদিককালে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হত। সেই ইংগিত দেওয়ার জন্য কাহিনীতে ঘটনাস্থলকে বলা হয়েছে সিদ্ধাশ্রিত দেশ।

রামায়ণে রামের প্রসঙ্গে যেমন আছে, সেরকম সীতার জন্মকালের গ্রহনক্ষত্র সমাবেশের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্তী টিকাকারগণ নির্দেশ করেন যে মাধব মাসে অর্থাৎ বৈশাখ শুক্লা নবমী তিথিতে চন্দ্র উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে সীতার জন্ম হয়েছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার জন্ম নক্ষত্রে বিবাহদিন ধার্য করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে চন্দ্রর অবস্থান কালে সীতার বিবাহ হয়েছিল। এই সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায় উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রর সঙ্গে সীতার বিশেষ সম্পর্ক আছে। বায়স কাহিনীতে মূলতঃ উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে শনিগ্রহর সংক্রমণ ও নিষ্ক্রমণ ব্যক্ত করে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের প্রতি ইংগিত রাখা হয়েছে।

বায়সের আক্রমনে বিপর্যস্তা সীতা রামের কোলে ঘুমিয়েছিলেন। অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যা। এইভাবে পর্যায়ক্রমে উভয়ে উভয়ের কোলে ঘুমিয়েছিলেন, অর্থাৎ, অনেকগুলি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা অতিক্রান্ত হয়েছিল।

এরপর পুনরায় বায়সের আগমন ও আক্রমণ। তখন রামের ক্রোড় হতে সীতা গাত্রোত্থান করছিলেন ; অর্থাৎ, অমাবস্যার নিবৃত্তিকাল।

প্রথম ঘটনা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ঘটে থাকলে, প্রায় তেরো মাস পরে চৈত্র পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যার নিবৃত্তির কালে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটেছিল। এই সময়ে সূর্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে। তখন শনিগ্রহ বক্রীগতিতে পুনরায় উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র স্পর্শ করেছে। বৈশাখী শুক্লপক্ষে চন্দ্র যখন উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে, সূর্য তখন কৃত্তিকা নক্ষত্রর শেষ অংশে এবং শনিগ্রহ ইতিমধ্যে বক্রী-গতি ত্যাগ করে মার্গী হয়ে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র পরিত্যাগ করছে।

এই নৈসর্গিক ঘটনাটি কাহিনীতে বায়সের পুনরায় আক্রমণ হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

রাম প্রথমে কোন ভ্রূক্ষেপ করেননি। তারপর সীতার বক্ষস্থল হতে রক্ত ঝরে তার গায়ে পড়লে ক্রুদ্ধ হয়ে দেখলেন বায়স সীতার অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। তখন রাম দর্ভমুষ্ঠি হতে একটি দর্ভ নিয়ে মন্ত্রপূত করে ব্রহ্মাস্ত্রে সংযোজন করলে সেই দর্ভ কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে বায়সের অভিমুখে ধাবিত হল। বায়স ভয়ে ধরান্তরে পলায়ন করল।

ঘটনার সূত্রপাত কৃত্তিকা নক্ষত্রে অমাবস্যা তিথির নিবৃত্তির কালে বক্রী শনিগ্রহর উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র স্পর্শ। অতঃপর বৈশাখী শুক্লা নবমী তিথিতে চন্দ্রর উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থানকালে সূর্যর রোহিণী নক্ষত্রে সংক্রমণ।

ইতিমধ্যে শনিগ্রহ বক্রীগতি ত্যাগ করে মার্গী হয়ে হস্তা নক্ষত্রে উপনীত হয়েছে।

কৃত্তিকা নক্ষত্রই পুরাণে শরবন। এই কাহিনীতে এই নক্ষত্রটিকে দর্ভমুষ্ঠি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একটি মাত্র দর্ভ অর্থে কৃত্তিকা নক্ষত্রর শেষ কলা। ব্রহ্মাস্ত্র রোহিণী নক্ষত্রর রূপক। রোহিণী নক্ষত্রর বৈদিক নাম ব্রহ্মা। একটি দর্ভ ব্রহ্মাস্ত্রে সংযোজন শব্দে কৃত্তিকা নক্ষত্রর শেষ অংশ হতে রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ। একটি তিথিকালে কিছু সময়ের জন্য সূর্যর কৃত্তিকা নক্ষত্রর শেষকলা ও রোহিণী নক্ষত্রর প্রথম কলার সংযোগস্থলে অবস্থান ছিল। এই সময়কালে শনিগ্রহ মার্গী হয়ে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র ত্যাগ করে। অপরদিকে দ্রুতগতি হেতু চন্দ্র তখন পরবর্তী নক্ষত্রে; অর্থাৎ, শনির সম্মুখবর্তী। এই ঘটনাকে কাহিনীতে বায়সের সীতার পশ্চাদধাবন বলা হয়েছে।

পরিশেষে বায়স রামের শরণাপন্ন হল।

রোহিণী নক্ষত্রর প্রথম পাদ ৪০° (চল্লিশ অংশ) হতে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রর শেষ পাদ ১৬০° (একশত ষাট অংশ) এই দূরত্ব সূর্যর অতিক্রম করতে সময় লাগে চার মাস। এই চার মাসে শনিগ্রহ আন্দাজ ৪° (চার অংশ) অতিক্রম করে হস্তা নক্ষত্রেই অবস্থান করবে। অতএব একটা সময়ে শনিগ্রহ ও সূর্য হস্তা নক্ষত্রে একই অংশে উপনীত হবে। এই সমরেখায় অবস্থানকে কাহিনীতে রামের নিকট বায়সের শরণ নেওয়া বলা হয়েছে।

ব্রহ্মাস্ত্রে বায়সের দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট।

বাস্তবে দেখা যায় বায়স বামদিকে ঘাড় কাত করে শিকার সন্ধান করে। ব্রহ্মাণ্ডে শনিগ্রহর বলয়গুলি ক্রান্তিবৃত্তর দিকে ২৭° (সাতাশ অংশ) কোণ করে কাত হয়ে পরিভ্রমণ করে। এই তথ্যটি নির্দেশনার কারণে ব্রহ্মাস্ত্রে বায়সের ডান চক্ষু বিনষ্ট বলা হয়েছে।

প্রতি বৎসরই একবার সূর্য ও শনিগ্রহ একই অংশে মিলিত হয়। তত্রাচ এই ঘটনার এমন কি তাৎপর্য রয়েছে যার দরুণ এই ঘটনাকে অভিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা হল?

কাহিনীতে বলা হয়েছে বায়সের আক্রমণে সীতার ক্ষতবিক্ষত বক্ষস্থল হতে ক্ষরিত শোণিতবিন্দু রামের দেহে পড়েছিল। সীতা অর্থ হলরেখ। অনাবৃষ্টিহেতু কৃষিকাজ ব্যাহত হলে কর্ষিত জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। সীতার বক্ষস্থল হতে রক্তক্ষরণ অর্থে খরাজনিত পরিস্থিতি।

অশোকবনে বন্দিনী সীতা তাঁর আয়ুষ্কাল আর মাত্র এক মাস একথা হনুমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে রামকে জানানোর জন্য বারংবার অনুরোধ করেছিলেন।[২]

সীতার এই ব্যাকুলতা সেই বৎসরেও অনাবৃষ্টির ইংগিত করছে। সূর্য রোহিণী নক্ষত্র অতিক্রম করার পরও যদি মেঘের সমাগম ও বর্ষণ না হয় তাহলে অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। সীতার একমাসের আয়ুষ্কাল বলতে বর্ষাঋতুর শেষ মাস। এই সময়েও বর্ষণ দেবতার কৃপা না হলে কর্ষিত জমি সম্পূর্ণ বন্ধ্যা পড়ে থাকে।

এই অনাবৃষ্টি জনিত অবস্থা রামের চিত্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে একবার ঘটেছিল। সেই ঘটনার সূত্র ধরে অশোকবনে বন্দী থাকার সময়ের একটি বৎসরের অবস্থাও রূপকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

মহাকাব্যে রামের রাজ্যাভিষেকের সিদ্ধান্ত এবং পরিশেষে তাঁর বনবাসের সময়কাল মধ্যে শনিগ্রহর উল্লেখ আরও একবার রূপকে পাওয়া যায়। রামের চব্বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেদিন পুনর্বসু নক্ষত্রযোগ, চৈত্র মাস। রামের জন্ম সময়ের মাস ও তিথির সঙ্গে মিল রয়েছে এই ঘটনার। পুষ্যা নক্ষত্র-যোগে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বসিষ্ঠ প্রমুখ পুরোহিতগণকে তিনি নির্দেশ দিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তৎকালে একদিনের মধ্যে মহাসমারোহ পূর্ণ ঐ অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং 'পুষ্যা নক্ষত্রযোগ' শব্দ ব্যবহার করে রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই ঘোষণার কথা জেনে লক্ষ্মণ, সুমিত্রা ও সীতার সঙ্গে কৌশল্যা জনার্দনের ধ্যান করেছিলেন। জনার্দন,—জন (লোক)—অর্দ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ কর্ম ; জনগণ যাঁহাকে যাচ্ঞা করে। জনার্দন অর্থ বিষ্ণু। এই সূত্রে বসন্ত ঋতুর চৈত্র মাসের সূর্য। বরাহ মতে চৈত্র মাসের আদিত্যর নাম বিষ্ণু।

অতঃপর দশরথ পুনরায় রামকে ডেকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর জন্ম-নক্ষত্রে সূর্য, মঙ্গল ও রাহুর সমাবেশ হয়েছে, যা জাতক ও রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ইক্ষ্বাকু বংশের কুলনক্ষত্র বিশাখা যার বিপরীতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমায় একদা বিষুব হত। এই হিসাবে কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য মঙ্গল ও রাহুর সমাবেশ বিবেচনা করে বলা যায় তখন বৈশাখ মাস।

উৎসবের আয়োজন চলছে যখন সেই সময় কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা রামের ধাত্রীর কাছে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পেয়ে কৈকেয়ীকে জানাল। কৈকেয়ী এই সুসংবাদে আনন্দিত হয়ে মন্থরাকে গলার হার উপহার দিয়েছিলেন। বিনিময়ে মন্থরা কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রনা দিয়ে রামের চোদ্দ বৎসর বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভের ব্যবস্থা করল। অথচ রামের বনগমনের পরে ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় প্রত্যাগত হলে মন্থরাকে তাঁদের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

মন্থরার প্রচেষ্টায় মূলতঃ রামকথার বিস্তার লাভ ঘটেছে। অথচ ভরত রাজ্যলাভ করার পর সমগ্র রামায়ণে মন্থরার আর কোন উল্লেখ নাই। আদিকবি মন্থরাকে কুব্জা বলে উল্লেখ করেছেন : এমন কি বক্রা ও পরম-পাপিকা (অশুভদর্শনা) বলতেও দ্বিধা করেননি। অথচ তিনিই মন্থরার যে রূপবর্ণনা করেছেন সেই অনুসারে একটি রূপসী নারী কল্পনায় ভেসে ওঠে।

"পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ অশুভদর্শনা অনেক কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি বায়ুভরে অবনত কমলিনীর ন্যায় অতি প্রিয়দর্শনা। মন্থরে! তোমার বদন বিমল চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর ; তোমার বক্ষস্থল স্কন্ধ হইতে উন্নত হইয়া ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে ; তোমার স্তন-দুটী অতি স্থূল, তোমার উত্তম-নাভিবিশিষ্ট উদর লজ্জিতের ন্যায় সন্নত হইয়াছে, তোমার জঘন একে ত অতিবিস্তীর্ণ ও নির্দ্দোষ, তাহাতে মনোহর কাঞ্চীদামে বিভূষিত হইয়া আরও মনোহর হইয়াছে ; তোমার জঙ্ঘা দুটী অতি প্রশংসনীয় এবং তোমার উভয় পদতলই সম্যক্ প্রশস্ত ; আহা ! তোমার কি শোভা। মন্থরে ! তোমার জঙ্ঘা সম্যক্ আয়তা, এজন্য যখন তুমি ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর, তখন তোমার অতীব শোভা হয়।"[১]

এত সুন্দর সুগঠিত দেহসৌষ্ঠব যার সেই মন্থরাকে কুব্জা, বিকলাঙ্গ (বক্রা) ও অশুভদর্শনা (পরমপাপিকা) কিভাবে বলা যায় ? পরবর্তী একটি শ্লোকে মন্থরা সম্পর্কে আদিকবি বলছেন, —

হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্ ॥ ৪৬

২.৯.৪৬

এই শ্লোকের রথঘোণ অর্থাৎ রথনাভি (রথচক্র মধ্যস্থ দারুপিণ্ডিকা) সদৃশ্য স্থগু অর্থাৎ মাংসপিণ্ড শব্দটির সূত্র ধরে আমরা কুব্জা শব্দের সমর্থন খুঁজেছি। মূলতঃ রথঘোণ শব্দটি প্রয়োগ করে এখানে স্থগু অর্থে মন্থরার

যুগ্ম পয়োধরের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হৃদয়ে যার সহস্র মায়া, সেই প্রসঙ্গে পিঠের কুঁজের কথা উঠতেই পারে না। এই দৃষ্টিকোণ হতে মন্থরার ভূমিকা চিন্তা করতে হবে।

মন্থরা,—মন্থর শব্দ + আপ্ ; মন্দগামিনী, ধীরা ইত্যাদি।

মন্থর,—মন্থ্ (মন্থন করা ইত্যাদি) + অরন্ কর্তৃ : মন্দগামী, ধীর, পৃথু, বক্র, বৃহৎ, নত ইত্যাদি।

মন্থরাকে কুব্জা বলা হয়েছে। কুব্জ,—কু (অশুভ, কুটিল) উব্জ (ঋজুতা) যার ; অর্থাৎ, যে অশুভঘটনপারদর্শী অথবা কুটিলতায় যে দৃঢ়।

শনিগ্রহর অনেক নামের মধ্যে দুটি নাম হল মন্দ এবং পঙ্গু। প্রাচীন সাহিত্যে শনিগ্রহকে মন্থীন বলা হয়েছে।[৪] মন্থরার প্রতি আরোপিত বিশেষণগুলি শনিগ্রহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং রহস্য সৃষ্টির কারণে শনিগ্রহকে স্ত্রী-রূপে কল্পনা করে 'মন্থরা' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রাম কাহিনীতে মানবী মন্থরার যে ভূমিকাই থাক, বর্তমান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চরিত্রটি শনিগ্রহর রূপক। রামের চব্বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কালে শনিগ্রহর অবস্থান ছিল কর্কট রাশিতে অশ্লেষা নক্ষত্রে ১০৬°৪০' (একশত ছয় অংশ চল্লিশ কলায়) ; এই সময় বক্রী থাকলে পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থান হবে।

'রাম জন্ম কথা' প্রকরণে প্রমাণ রেখেছি মিথুন রাশি পর্যন্ত কৌসল্যা (গ্রীষ্মঋতু) এবং কর্কট রাশি হতে চার রাশি পর্যন্ত কৈকেয়ী (বর্ষাঋতু)। রামায়ণের কালে দক্ষিণায়নাদি ছিল পুষ্যা নক্ষত্রর প্রথম পাদে।

মন্থরা কৈলাস শিখর সদৃশ প্রাসাদশীর্ষে উঠে অপর প্রাসাদে অবস্থিত রামধাত্রীর নিকট রামের রাজ্যাভিষেকের কথা জেনেছিল। কৈলাস মেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং কৈলাস শিখর সদৃশ অর্থে দক্ষিণায়নাদির পূর্ব প্রান্তে পুষ্যা নক্ষত্রর পরে অশ্লেষা নক্ষত্র ধরা যায়।

ধাত্রী অর্থ জননী। রাম সূর্যবংশীয় মেঘদেবতা। তাহলে তাঁকে আদিত্য হিসাবে গণ্য করা যায়। আদিত্যগণকে ধারণ করেছেন অদিতি, অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্র।

ধাত্রী শব্দের অপর অর্থ গঙ্গা। ধাত্রী ছিল পাণ্ডুর ক্ষৌম বসন পরিহিতা। এখানে গঙ্গা শব্দে ছায়াপথ, যেখানে মিথুন রাশি নিমজ্জ। এই সূত্রেও পুনর্বসু নক্ষত্রর ইংগিত গ্রহণ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে অভিষেকের প্রস্তুতির নির্দেশ দিতে

বসিষ্ঠ রামের পাণ্ডুরবর্ণ মেঘতুল্যানিবিড়-প্রভাশালী বাসভবনে গিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য অশ্বযুক্ত উপযুক্ত রথে চেপে তৃতীয় কক্ষায় প্রবেশ করার পরে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল।[৫]

রথ সমেত বাসভবনের তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করা অবশ্যই বাস্তবোচিত ঘটনা নয়। সুতরাং এই বিবরণে সূর্যর কক্ষপথের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ মিথুন রাশি ইংগিত করা হয়েছে মনে করি। এক্ষেত্রে সূর্যর অবস্থান পুনর্বসু নক্ষত্রর শেষপাদে ধরে নেওয়া যায়। তখন গ্রীষ্মঋতুর শেষ অধ্যায়; একারণে রামের বাসভবনের বিবরণে পাণ্ডুরবর্ণ মেঘতুল্যানিবিড়-প্রভাশালী বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

মন্থরা প্রসঙ্গে শেষ পর্যায়ে শত্রুঘ্ন কর্তৃক লাঞ্ছনা। তারপর রামায়ণে মন্থরার আর কোন উল্লেখ নাই। এই ঘটনা শনিগ্রহর কর্কট রাশি ত্যাগ করাকে নির্দেশ করছে।

পরিশেষে রামায়ণের আরেকটি বিবরণের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়।

লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রাম বনগমনের উদ্দেশ্যে অযোধ্যা ত্যাগ করলে সেদিন সূর্যাস্তের পর ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এই সমস্ত দারুণ গ্রহ চন্দ্রের নিকটে অবস্থিত ছিল।[৬]

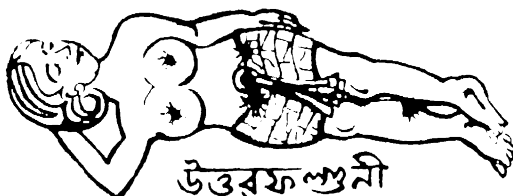
রামের জন্মকালে বৃহস্পতি পুনর্বসু নক্ষত্রে ছিল: সম্ভবতঃ কর্কট রাশির প্রথম পাদে। তাহলে রামের বয়স যখন চব্বিশ বৎসর কয়েক মাস তখনও বৃহস্পতির অবস্থান হবে কর্কট রাশিতে। সুতরাং অন্যান্য গ্রহগুলিও সেই সময় ঐ রাশিতে ছিল। বুধগ্রহ কখনও সূর্য হতে বেশী দূরে অবস্থান করে না। সুতরাং সূর্যর কাছাকাছি থাকাই স্বাভাবিক। অতএব সময়কালটি কৃষ্ণ পক্ষ! এখানে 'ত্রিশঙ্কু' শব্দটি রহস্যর সৃষ্টি করছে। পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় এই শব্দ দ্বারা শনিগ্রহ বুঝানো হয়েছে। শনিগ্রহর তিনটি বলয়ের তথ্যকে ভিত্তি করে 'ত্রিশঙ্কু' নামকরণ হয়েছে।

ত্রিশঙ্কুর প্রচলিত কাহিনী হল বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যাফলে তাঁকে সশরীরে স্বর্গে পাঠালে ইন্দ্র বললেন, ত্রিশঙ্কু, 'তুমি গুরুশাপহত, অতএব অবাকশিরা হইয়া ভূপতিত হও'। ত্রিশঙ্কুকে পতনোম্মুখ দেখে বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে তাকে অন্তরালে অবস্থিত করলেন।

অবাকশিরা অর্থ অবনতমস্তক। নভঃমণ্ডলে একমাত্র শনিগ্রহর

অবস্থান দেখে মনে হয় যেন আনতমুখে নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে। সুতরাং 'অবাকশিরাস্ত্রিশঙ্কু'·শব্দে শনিগ্রহর ইংগিত মানতে হয়।

রাম-কথার ঘটনা কালে শনিগ্রহর বিভিন্ন অবস্থানকে ভিত্তি করে দুইটি রূপক কাহিনী ও একটি রূপক নামের অবতারণা করে কালনির্দেশ করা হয়েছে।



পাদটীকা

১। বাল্মীকি রামায়ণ; সুন্দরকাণ্ড ৩৮ এবং ৬৭ সর্গ।

২। ঐ ; ৫. ৩৮. ৬৪; ৫. ৪০. ১০

৩। ঐ ; ২. ৯. ৪০-৪৫

৪। "..........…there is also a convention of taking Manthin to mean Saturn" ---Sankar Balakrishna Dikshit in 'English Translation of Bharatiya Jyotish Sastra', Part—I, Page—61. Published by the Manager of Publications, Civil lines, Delhi, 1969

৫। বাল্মীকি রামায়ণ, ২. ৫. ৪-৫

৬। ঐ ; ২. ৫১. ১০

দ্বাদশ প্রকরণ

সিদ্ধাশ্রমের অন্তরালে

রাম প্রমুখ চার ভাই সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুগণের সঙ্গে পুত্রদের দারক্রিয়া বিষয়ে চিন্তা করছিলেন; এমন সময় অযোধ্যায় বিশ্বামিত্রর আগমন। দশরথকে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

বিশ্বামিত্র যাগকরণাভিলাষী হয়েছেন। কিন্তু সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু অনেকবার নিয়ম সমাপ্ত হলেও যজ্ঞ সমাপনকালে বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং মারীচ ও সুবাহুকে দমন করে যাতে যজ্ঞ সম্পন্ন করা যায় সেকারণে বিশ্বামিত্র দশরাত্রর জন্য রামকে তাঁর হাতে প্রদান করার জন্য দশরথকে অনুরোধ জানালেন। রামের বয়স তখন ঊনষোড়শ বৎসর মাত্র। এজন্য দশরথ প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন; অবশেষে বসিষ্ঠ প্রমুখর অনুরোধে সম্মত হন। বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র রামকে প্রার্থনা করলেও লক্ষ্মণ রামের অনুগামী হয়েছিলেন। তিনজনে অযোধ্যা ত্যাগ করার কালে,—

তেতো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।
বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্‌॥ ৪

১.২২.৪

অর্থাৎ, রাজীবলোচন রাম বিশ্বামিত্রর অনুগমন করবার উদ্যোগী হয়েছেন দেখে আরামদায়ক সুখস্পর্শশালী বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল।

এবং

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥৭
অনুজগ্মতুরক্ষুদ্রৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়ন্তাবনিন্দিতৌ ॥ ৮

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০-১৭

স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকী।
অধ্যৰ্দ্ধযোজনং গত্বা সরয্‌ৱা দাক্ষিণে তটে ॥ ১১

১.২২.৭-৮, ১১

অর্থাৎ, যেমন ধনুষ্পাণীকে কলাপী শোভান্বিত করে এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুসরণ করে, তেমনি পৃষ্ঠদেশে সমুন্নত তৃণীর যুগ্মধারী হয়ে ত্রিশীর্ষ সর্পের ন্যায় রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রর অনুগমন করলেন।·········পাবকী অগ্নিনন্দন কুমার অচিন্ত্য স্থাণুকে যেমন অনুগমন করে তেমনিভাবে রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করে অধ্যৰ্দ্ধযোজন পথ অতিক্রমণের পর সরযূর দক্ষিণতটে উপনীত হলেন।

এখানে বিশ্বামিত্র রামকে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্র গ্রহণ করে,—

সহস্ররশ্মির্ভাগবান্ শরদীব দিবাকরঃ।
গুরুকার্য্যাণি সর্ব্বাণি নিযুজ্য কুশিকাত্মজে।
উষুস্তাং রজনীং তত্র সরষাং সসুখং ত্রয়ঃ ॥ ২৩

১.২২.২৩

অর্থাৎ, রাম শরৎকালীন সহস্রকিরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করলেন। রাম, বিশ্বামিত্রের প্রতি, 'যেরূপ গুরুর প্রতি কার্য্য করতে হয়' সেরূপ সকল কার্য সম্পন্ন করার পর তাঁরা তিনজনে সেই রজনী সরযূর দক্ষিণতীরে অতিবাহিত করলেন। অযোধ্যা ত্যাগের পর এটি প্রথম রাত্রি।

রাত্রি প্রভাত হলে বিশ্বামিত্র পর্ণ-শয্যায় শয়ান রাম ও লক্ষ্মণকে শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃসন্ধ্যাকালের দৈবকর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর অগ্রসর হয়ে সরযূ ও দিব্যা ত্রিপথগার সঙ্গমস্থল দর্শন করলেন। স্থানটি সম্পর্কে রাম কৌতূহল প্রকাশ করলে বিশ্বামিত্র জানালেন কন্দর্প পূর্বে মূর্তিমান ছিলেন। বুধগণ (পণ্ডিতগণ) তাকে কাম (মনোহর) বলে অভিহিত করতেন। বহুদিন গত হল, স্থাণু এই স্থানে তপস্যার কারণে সমাধিস্থ ছিলেন। একদা সমাধি ভঙ্গ হলে মরুদ্‌গণসহ রুদ্র যখন পরিভ্রমণ করছিলেন তখন মদন রুদ্রকে ধর্ষণ করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র রৌদ্র-নয়নে অবলোকন করা মাত্র মদনের সমস্ত অবয়ব বিশীর্ণ হয়ে যায়। কায়াহীন হওয়ায় কন্দর্প 'অনঙ্গ' নামে এবং এই স্থানটি 'কামাশ্রম' নামে বিখ্যাত হয়। এই কামাশ্রমে বিশ্বামিত্র প্রমুখ দ্বিতীয় রাত্রি অবস্থান করেন।

অনন্তর সুবিমল প্রভাতকালে তাঁরা নদীতীরে উপস্থিত হলে মুনিগণ নৌকা নিয়ে এসে সত্বর সাগরগামী ঐ নদী অতিক্রম করতে অনুরোধ জানালেন। নৌকাযোগে তাঁরা জাহ্নবীর দক্ষিণতীরে উত্তীর্ণ হয়ে অগ্রসর হওয়াব কালে পথে ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জুন, পাটলী, বদরী, তিন্দুক ও বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষে পূর্ণ দুর্গম বন দেখে রাম কৌতূহলী হলে বিশ্বামিত্র বললেন,— পূর্বে এস্থানে মলদ ও করূষ নামে দুটি জনপদ ছিল। এর পূর্বে সহস্রাক্ষ বৃত্রবধ করে ব্রহ্মহত্যার কারণে মলিন ও ক্ষুধাক্রান্ত হয়েছিলেন। দেবগণ এই স্থানে মহেন্দ্রকে স্নান করালে ইন্দ্র মল ও করূষ (ক্ষুধা) মুক্ত হন। এই কারণে মলদ ও করূষ নামকরণ। ইন্দ্রর প্রসাদে এই দুই জনপদ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। কিছুকাল পরে সুন্দের সহস্র-হস্তিনী-বলধারিণী তাড়কানাম্নী এক যক্ষিণী ভার্যা হল। তার গর্ভে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মারীচ নামে এক পুত্র জন্মায়।

অগস্ত্যশাপে সুন্দ নিহত হওয়ায় পুত্রসহ তাড়কা অগস্ত্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে অগস্ত্যর অভিশাপে মাতা পুত্র উভয়ে রাক্ষসে পরিণত হয়। অভিশপ্তা রাক্ষসরূপিণী তাড়কা সেই অগস্ত্যাশ্রম উৎসন্ন করেছে। রাক্ষস মারীচ নিয়ত লোকগণকে বিত্রস্ত করে। দুষ্টচারিণী তাড়কা মলদ ও করূষ নামক জনপদদ্বয়ে নিয়ত উৎপীড়ন করছে। সে এস্থান হতে অর্ধযোজন দূরে পথ আগলে আছে। যে বনে তাড়কা বাস করছে সেখান দিয়ে তাঁদের যেতে হবে এবং রাক্ষসীকে বিনাশ করতে হবে।

যেহেতু সন্ধ্যাকালে রাক্ষসগণ অত্যধিক বল লাভ করে, সেকারণে বিশ্বামিত্রর নির্দেশে রাম সন্ধ্যার পূর্বেই তাড়কাকে বধ করেছিলেন। তাড়কা-বনে বিশ্বামিত্র প্রমুখ তৃতীয় রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে রামকে বহুবিধ অস্ত্র সম্প্রদান করেন। দান গ্রহণ করে পথে যেতে যেতে আরেকটি আশ্রম দেখে রাম পুনরায় কৌতূহল প্রকাশ করলেন। ঐ আশ্রমই গন্তব্যস্থল একথা জানিয়ে বিশ্বামিত্র সেই আশ্রমের পুরা-কাহিনী শোনালেন।

বামনের উৎপত্তির পূর্বে এখানে বিষ্ণু যুগ-শত-পরিমিত কাল তপস্যা করে তপঃ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই সময়ে বিরোচন-পুত্র বলি ইন্দ্র ও মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতাগণকে পরাজিত করে ত্রিলোকে রাজত্ব করছিল। বলি যজ্ঞ উপলক্ষে যে যা প্রার্থনা করছে তাই দান করছিল। তখন অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সকলে বিষ্ণুকে অনুরোধ জানাল যে দেবগণের মঙ্গলের জন্য

বিষ্ণু যেন বামনরূপ ধারণ করে বলিকে পর্যুদস্ত করে ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য ফিরিয়ে দেয়।

এই একই সময়ে কশ্যপ অদিতির সঙ্গে সহস্র দিব্য-বর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত সমাপনপূর্বক মধুসূদনকে তার পুত্র এবং ইন্দ্রর কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে প্রার্থনা করল।

দেবগণের অনুরোধে এবং কশ্যপের প্রার্থনামত বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বামনরূপে উৎপন্ন হয়ে ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করে বলিকে বলপূর্বক পাতালে বন্দী করে ত্রিলোককে ইন্দ্রের অধীন করে দিল, বর্তমানে বিশ্বামিত্র এই আশ্রম উপভোগ করছেন।

বিষ্ণু সিদ্ধিলাভ করায় স্থানটি 'সিদ্ধাশ্রম' নামে খ্যাত হয়। বামনের আশ্রম হিসাবে 'শ্রমনাশন' নামে পরিচিত।

শশীব গতনীহারঃ পুনর্ব্বসুসমন্বিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্॥ ২৬

১. ২৯. ২৬

অর্থাৎ, বিশ্বামিত্রদের আগমনে তৎকালে পুনর্বসু নক্ষত্রদ্বয়ে মিলিত হিমানীমুক্ত নির্মল শশধরের ন্যায় আশ্রমের শোভা হল। সিদ্ধাশ্রমবাসীগণ বিশ্বামিত্রকে সমাগত দেখে সহসা উত্থানপূর্বক তাঁকে অর্চনা করলেন।

মুহূর্তকাল বিশ্রাম করেই বিশ্বামিত্র যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হলেন। অযোধ্যা ত্যাগের পর রাম লক্ষ্মণের এখানে চতুর্থ রাত্রিবাস।

পরদিন প্রভাতে রাম কোন্ সময়ে দুই রাক্ষসের অত্যাচার হতে যজ্ঞ রক্ষা করতে হবে জানতে চাইলে মুনিগণ বললেন যে আজ হতে ছয় অহোরাত্র বিশ্বামিত্র মৌনী থাকবেন। এই কয়দিন তাঁকে রক্ষা করতে হবে।

পঞ্চম অহোরাত্র গত হয়ে ষষ্ঠ দিবস উপনীত হলে মারীচ ও সুবাহু যজ্ঞনাশ-কারণে উপস্থিত হল। রাম শীতেষু নামক অস্ত্রে মারীচকে বিঘূর্ণিত ও অচেতন করে একশত-যোজন-ব্যাপ্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। আগ্নেয় অস্ত্রে সুবাহুকে বধ এবং বায়ব্য অস্ত্রে অন্যান্য রাক্ষসগণকে হনন করলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রর যজ্ঞ সমাপ্ত হল।

যজ্ঞান্তে পরদিন বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে না গিয়ে জনকযজ্ঞ দর্শনার্থে উত্তরদিকে রওনা হয়েছিলেন, যদিও যজ্ঞ সমাপনের দিন দশরথের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মত দশরাত্র অতিবাহিত হয়ে যায়।

সিদ্ধাশ্রম কাহিনীতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। অযোধ্যা ত্যাগ করার পর পথে নানা গল্প হল ; কিন্তু মারীচ ও সুবাহুর কীর্তি ও বলাবল সম্পর্কে কোন আলোচনা নাই। এমন কি বিশ্বামিত্র দশরথকে রাবণের প্রসঙ্গ জ্ঞাত করালেও রামকে এ বিষয়ে কোন কথা বলেননি।

সিদ্ধাশ্রমে পৌঁছানোর পরদিন প্রভাতে রাম জানতে চাইছেন রাক্ষসদ্বয় কখন আসবে ? বিশ্বামিত্র এ বিষয়ে রামকে কোন নির্দেশ দেননি।

এই কাহিনীতে লক্ষ্মণ রামের অনুগমন করলেও তার ভূমিকা খুবই নগন্য।

পুত্রদের জন্মক্রিয়া সকল সম্পন্ন করার পর রামের ঊনষোড়শ বৎসর বয়সে দশরথ পুত্রদের দারক্রিয়া বিষয়ে চিন্তা করছিলেন।[১]

অথচ রামায়ণের অন্যত্র দেখা যায় যে রাবণ সীতাহরণ জন্য মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করলে মারীচ জানায় ঊনদ্বাদশবর্ষীয় রাম কি ভাবে বিশ্বামিত্রর আশ্রমে তাকে পর্যুদস্ত করেছিলেন।[২] আবার মুনির ছদ্মবেশী রাবণকে সীতা বলেছিলেন বিবাহের পর ইক্ষ্বাকুকুলে বারো বৎসর অতিবাহিত হলে ত্রয়োদশবর্ষে তাঁর বয়স যখন আঠারো ও রামের পঁচিশ বৎসর বয়স, তখন রাম বনগমন করেছিলেন।[৩]

মারীচের বক্তব্যমত ঊনদ্বাদশ বৎসরে বিশ্বামিত্রর আশ্রমের ঘটনা এবং সীতার বিবাহের পর শ্বশুরকুলে বারো বৎসর কাটানোর হিসাব মেলে। কারণ রাম পঁচিশ বৎসর বয়সে বনগমন করলে বারো বৎসর বয়সে সীতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান কাহিনীতে বলা হচ্ছে রামের বয়স ঊনষোড়শ বৎসর ; এর কারণ কি ?

কারণ রহস্য সৃষ্টি।

'ঊন' শব্দটি দুইটি ক্ষেত্রে দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ঊনদ্বাদশ শব্দের ক্ষেত্রে রামের জন্মের পর এগার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু বারো বৎসর পূর্ণ হয়নি এই ইংগিত গ্রহণ করতে হবে।

ঊনষোড়শ শব্দের ক্ষেত্রে রামের ষোড়শতম বর্ষটিতে একটি মলমাস এবং একটি ক্ষয়মাস পড়ায় চান্দ্রমাস সংখ্যা ঊন হয়েছে ; অর্থাৎ সৌর-মাসের চেয়ে কম হয়েছে।

প্রাচীনকালে পাঁচ বৎসরে যুগ ধরা হত। সেকালে প্রতি পাঁচ

বৎসর অন্তর একটি মাস বাদ দিয়ে সৌর ও চান্দ্র বৎসরে সামঞ্জস্য আনা হত।

স্থূল হিসাবে প্রতি তৃতীয় বৎসরে মলমাস গণনা করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দুইটি মলমাসের মধ্যে সমান সময়ের ব্যবধান থাকে না। সাধারণতঃ দুই বৎসর চার মাস হতে দুই বৎসর এগারো মাসের ব্যবধানে মলমাস অনুষ্ঠিত হয়। ফলে কোন বিশেষ বৎসরে মলমাস ছিল কিনা হিসাব করা বিশেষ দুরূহ। অনুরূপভাবে, ১৪১, ১২২, ৭৬, ৬৫, ৪৬ এবং ১৯ বৎসর অন্তর ক্ষয়মাস পড়ে। তবে ১৯ এবং ১৪১ বৎসরের পৌনঃপুনিকতার আধিক্য। এক্ষেত্রেও হিসাবের জটিলতা খুব বেশী।

একাদশ এবং ষোড়শ বৎসরের মধ্যে পাঁচ বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং উভয় বৎসরে মলমাস পড়া স্বাভাবিক।

বিশ্বামিত্র দশরাত্রর জন্য রামকে প্রার্থনা করেছিলেন। সাধারণ হিসাবে অযোধ্যা ত্যাগ করার পর বিশ্বামিত্রর সিদ্ধিলাভের দিন পর্যন্ত দশ রজনী অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধাশ্রম হতে অযোধ্যা ফিরতে হিসাব মত আরও তিনটি রজনী পথে কাট'তে হয়। সুতরাং বিশ্বামিত্র ত্রয়োদশ রাত্র না বলে দশরাত্র বললেন কেন ?

'রাত্র' শব্দ দ্বারা অন্ধকার রজনী অর্থাৎ অমাবস্যা বুঝানো হয়েছে ধরা যেতে পারে।[8] রামের ষোড়শ বৎসরটিতে মনে হয় একটি ক্ষয়মাস ও একটি মলমাস পড়ায় দুইটি মাসের অমাবস্যা বাদ ধরলে দশটি শুদ্ধ অমাবস্যা হয়। তাড়কা নিধন ঘটনাটি মূলতঃ ক্ষয়মাসের ইংগিত বহন করছে। অপরদিকে, যে মাসে রামকে নিয়ে বিশ্বামিত্র অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন সেই মাসের অমাবস্যা এবং একটি মলমাসের অমাবস্যা এই দুই অমাবস্যা বাদ দিলে দশটি অমাবস্যা তথা মাসে বৎসরটি পূর্ণ হয়। সুতরাং বিশ্বামিত্রর ত্রয়োদশ রাত্রর বদলে দশরাত্র বক্তব্য ঠিকই আছে। যেহেতু বিশ্বামিত্র দশরাত্র তথা দশ মাসের জন্য রামকে দশরথের নিকট হতে চেয়ে নিয়েছিলেন, সেকারণে বিশ্বামিত্রর সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধিলাভের পর উত্তরদিকে জনকের যজ্ঞে যাওয়া অসংগত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্যের অবতারণা করতে হয়। সীতা ও মারীচের বক্তব্যমত রাম বারো বৎসর বয়সে ষষ্ঠ-বর্ষীয়া সীতাকে বিবাহ করেছিলেন। প্রাচীনকালে অনেক জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহর প্রচলন ছিল। সেক্ষেত্রে বালিকার প্রথম ঋতু দর্শনের পর পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের

রীতি ছিল। এই পুনর্বিবাহ কালে বালিকা যৌনসঙ্গম-সক্ষমা হয়। মনে হয়, রামের ষোল বছর বয়সে মানবী সীতার প্রথম ঋতুদর্শনের পর যে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিল তার ইংগিত দেওয়া হয়েছে 'দারক্রিয়া' শব্দটি ব্যবহার করে।

দার (বিদারণ, ভেদন) + অ (ঘঞ)-ক (পাণিনি ৩.৩.২০)। অতএব 'দার' শব্দের মধ্যে যৌনসম্পর্কের আভাস আছে। এছাড়া রাম সীতার বিবাহ প্রস্তাবনা কালেও যৌনসম্পর্ক-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল।[৫] মনে করি পুনর্বিবাহ বিষয়টির প্রতি নির্দেশ করার জন্য আদিকবি বিবাহ শব্দের পরিবর্তে এক্ষেত্রে 'দারক্রিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং রামের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর সীতার সঙ্গে বিবাহ হয়। ষোড়শ বর্ষে মলমাস ও ক্ষয়মাস ছিল এবং ঐ বছর পুনর্বিবাহ হয়।

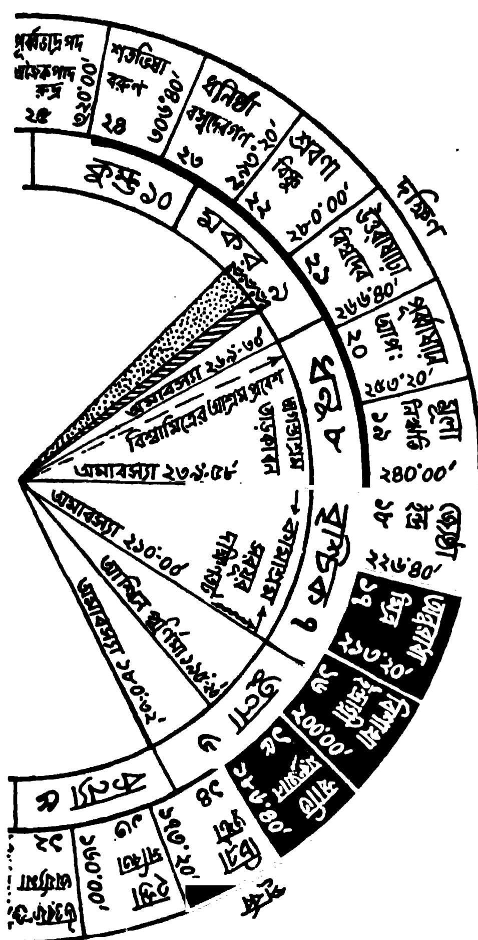
এই দুই বৎসরের উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে দুই রকমের প্রস্তাবনা করে আদিকবি দুরূহ রহস্যর সৃষ্টি করেছেন।

পুষ্যা নক্ষত্রর একটি নাম সিধ্য। এই নক্ষত্রটি নক্ষত্রমণ্ডলের ৯৩°২০′ (তিরানব্বই অংশ কুড়ি কলা) হতে ১০৬°৪০′ (একশত ছয় অংশ চাল্লিশ কলা) পর্যন্ত বিস্তৃত। একদা এই নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদি হত। সেক্ষেত্রে শ্রবণা নক্ষত্রর ২৮৬°৪০′ (দুইশত ছিয়াশী অংশ চাল্লিশ কলা) হতে ২৮০° (দুইশত আশি অংশ) পর্যন্ত ৬°৪০′ (ছয় অংশ চাল্লিশ কলা) এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রর ২৮০° (দুইশত আশি অংশ) হতে ২৭৩°২০′ (দুইশত তিয়াত্তর অংশ কুড়ি কলা) পর্যন্ত ৬°৪০′ (ছয় অংশ চাল্লিশ কলা) এই মোট ১৩°২০′ (তেরো অংশ কুড়ি কলায়) উত্তরায়ণাদি ছিল।

শ্রবণা নক্ষত্রর বৈদিক নাম বিষ্ণু।

বছরে ৪৮″ (আটচাল্লিশ বিকলা) হিসাবে অয়নচলন ধরলে শ্রবণা নক্ষত্রর উপরোক্ত ৬°৪০′ (ছয় অংশ চাল্লিশ কলা) উত্তরায়ণের পশ্চাদ্‌গামী হতে পাঁচশত বৎসর লাগে। এই তথ্যটিকে নির্দেশ করার জন্যই উপাখ্যানে বলা হয়েছে বিষ্ণু যুগ-শত পরিমিত কাল অর্থাৎ পাঁচশত বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করায় স্থানটি 'সিদ্ধাশ্রম' নামে খ্যাত হয়েছিল। অতএব সিধ্য অর্থাৎ পুষ্যা নক্ষত্র সংশ্লিষ্ট মকর রাশির অংশ বিশেষকে 'সিদ্ধাশ্রম' আখ্যা দিয়ে অতীতের কোনও এক কালের উত্তরায়ণাদিস্থান ইংগিত করা হয়েছে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

এবার বামনের উৎপত্তি।



বিষ্ণুর তপস্যা কাল; ৫০০ বছর।
২৮৬°.৪০' হতে ২৮০°-০০'

বামনের তপস্যা কাল; ২৫০ বছর।
২৮০°-০০' হতে ২৭৬°-৪০'

সিদ্ধাশ্রম।

বরাহ মতে আষাঢ় মাসের আদিত্যর নাম বামন। বৈশাখ মাসের

আদিত্যর নাম মধুসূদন। একদা চান্দ্র-বৈশাখ মাসে বাসন্ত-বিষুব হত।

অদিতি পুনর্বসু নক্ষত্র এবং কশ্যপ কালপুরুষ নক্ষত্র। কশ্যপ ও অদিতির এক-সহস্রবর্ষব্যাপী-অনুষ্ঠিত ব্রত অর্থে অয়ণের এক নক্ষত্র পশ্চাদ্‌গামী হওয়া। মিথুন রাশিতে সাধারণতঃ পুনর্বসু নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে চান্দ্র-আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য অদিতি অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্রে বামনের উৎপত্তি বলা হয়েছে।

বিষ্ণুর তপস্যা সমাপ্ত কালে উত্তরায়ণ ছিল উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ২৮০° (দুই শত আশি অংশে)। তাহলে শারদ-বিষুব ১৯০° (একশত নব্বই অংশে) স্বাতি নক্ষত্রে, দক্ষিণায়ন ১০০° (একশত অংশে) পুষ্যা নক্ষত্রে এবং বাসন্ত বিষুব ১০° (দশ অংশে) অশ্বিনী নক্ষত্রে।

সূর্য মেষ রাশিতে ১০° (দশ অংশে) অবস্থানকালে কোনক্রমেই চান্দ্র-বৈশাখ মাস হবে না। বাসন্ত-বিষুবর এই অবস্থানকে ইংগিত করার জন্য অদিতি ও কশ্যপের! মধুসূদনের অর্থাৎ চান্দ্র-বৈশাখ মাস হতে চান্দ্র-চৈত্র মাসে বাসন্ত-বিষুবর পশ্চাদ্‌গামী হওয়ার প্রার্থনা।

বামন ইন্দ্রর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের আদিত্য ইন্দ্রর পরে আষাঢ় মাসের আদিত্য বামন। বামন বিষ্ণুর আশ্রমে অবস্থানকালে একটি মাত্র কাজ করেছিল, তা হল বলিকে পর্যুদস্ত করে ইন্দ্রকে ত্রিলোকের ভার অর্পণ করা।

বামনের উদ্ভবকালে শারদ-বিষুব ছিল স্বাতি নক্ষত্রে ১৯০° (একশত নব্বই অংশে)। স্বাতি নক্ষত্রকে 'বলি' বলা হয়েছে। এই নক্ষত্রটিকে 'স্বাতি' নামে উল্লেখ করলে পুংলিঙ্গ হয়; যার বৈদিক নাম মরুত্বান, অথর্বসংহিতায় এই ব্যবহার আছে। স্বাতি নক্ষত্রর তিনটি উজ্জল তারা বলি অর্থাৎ নৈবেদ্য-সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট। তাছাড়া অতীতে শারদ-বিষুব কালে রুদ্র তথা পশুযাগ অনুষ্ঠিত হত। এই যজ্ঞের সূত্র ধরে স্বাতি নক্ষত্রকে রূপকে বলি কল্পনা করা হয়েছে।

বল (শক্তি, প্রভাব) শব্দজাত বলি অর্থে বলবান, প্রভাববান। বলি বিরোচনপুত্র। বিরোচন অর্থ দীপ্ত, উজ্জ্বল, উদ্ভাসক, সূর্য। সুতরাং বলি শব্দ দ্বারা নক্ষত্রবিশেষকে ইংগিত করা যায়; বিশেষতঃ যে নক্ষত্রে শারদ-বিষুব অনুষ্ঠিত হয়। কারণ এই সময় সূর্যর পরাক্রম অর্থাৎ গতি বৃদ্ধি পায়। স্বাতি নক্ষত্রে এই অবস্থা ঘটায় বলিকে বিরোচন পুত্র বলা হয়েছে।

দেবতারা অগ্নিকে পুরোধা করে বিষ্ণুকে বামনরূপে জন্ম নিতে

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬--১৮

অনুরোধ করেন। অগ্নি অর্থে কৃত্তিকা নক্ষত্র। বিষ্ণুর তপস্যার সমাপ্তিকালে স্বাতি নক্ষত্রর দ্বিতীয় পাদে ১৯০° (একশত নব্বই অংশে) শারদ-বিষুব হলে বাসন্ত-বিষুব হয় অশ্বিনী নক্ষত্রে ; মেষ রাশির ১০° (দশ অংশে)। ভরণী নক্ষত্রর সম্মুখে কৃত্তিকা নক্ষত্র। এজন্য কাহিনীতে অগ্নি পুরোধা।

কালক্রমে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) বছরে বিষুব ৩°২০′ (তিন অংশ কুড়ি কলা) পশ্চাদ্‌গামী হওয়ায় শারদ-বিষুব স্বাতি নক্ষত্রর পরিবর্তে চিত্রা নক্ষত্রর ১৮৬°৪০′ (একশত ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়) অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাতি নক্ষত্র হতে শারদ-বিষুবর এই পশ্চাদ্‌গামী হওয়ার তথ্য রূপকে বামন বলিকে পর্যুদস্ত করে ইন্দ্রকে ত্রিলোকের দায়িত্ব প্রদান করেছিল বলা হয়েছে। বলি ইন্দ্রকে পরাস্ত করে ত্রিলোক জয় করেছিল। বিশাখা নক্ষত্রে প্রথম অংশের নাম ইন্দ্র। আবার চিত্রা নক্ষত্রেও এক নাম ইন্দ্র। একারণে একবার বলির নিকট ইন্দ্রর পরাজয় অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্র হতে শারদ-বিষুবর পশ্চাদ্‌গামী হয়ে স্বাতি নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং ইন্দ্রর পুনরায় ত্রিলোকের দায়িত্ব লাভ অর্থাৎ শারদ-বিষুব স্বাতি নক্ষত্রর বদলে চিত্রা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হওয়া। বলিকে পাতালে বন্দী করা অর্থে শারদ-বিষুবর পরে স্বাতি নক্ষত্রর অবস্থান ; অর্থাৎ, পিতৃযান পর্যায়ভুক্ত।

বামনের পর বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে নিয়মমাফিক তপস্যা করছিলেন। বিশ্ব (উত্তরাষাঢ়া) নক্ষত্রে মিত্র (সূর্য)র অবস্থানে উত্তরায়ণাদি অনুষ্ঠানকে 'বিশ্বামিত্র' বলা হয়েছে। তখন উত্তরায়ণ ছিল ২৭৬°৪০′ (দুইশত ছিয়াত্তর অংশ চল্লিশ কলায়) মকর রাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে, শারদ-বিষুব ১৮৬°৪০′ (একশত ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়) তুলা রাশিতে চিত্রা নক্ষত্রে, দক্ষিণায়ন ৯৬°৪০′ (ছিয়ানব্বই অংশ চল্লিশ কলায়) কর্কট রাশিতে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং বাসন্ত-বিষুব ৬°৪০′ (ছয় অংশ চল্লিশ কলায়) মেষ রাশিতে অশ্বিনী নক্ষত্রে।

বিশ্বামিত্রর আশ্রম প্রবেশকালে পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র ও নীহারমুক্ত রজনীর তুলনা আছে।

রামায়ণকালে পৌষ মাস হেমন্ত ঋতুর অন্তর্গত ছিল। এই ঋতুতে মেঘ জলশূন্য থাকে, এজন্য নীহারমুক্ত বলা হয়েছে। আশ্রমে প্রবেশ অর্থে সূর্যর মকররাশিতে সংক্রমণ। পুনর্বসু নক্ষত্রর উল্লেখ করে পূর্ণিমা নয়, পৌষ মাসের ইংগিত দেওয়া হয়েছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টিই এর কারণ। স্থূল

হিসাবে ঐ দিনটিতে সূর্যর মকররাশি সংক্রমণকালে অমাবস্যার নিবৃত্তি হয়ে শুক্লা প্রতিপদ তিথির প্রবৃত্তি হয়েছিল। ধনুরাশিতে সূর্যর অবস্থানকালে সৌর পৌষমাস ক্ষয়মাস হলে সূর্যর মকররাশির সংক্রমণের দিন শুক্লা প্রতিপদ তিথি শুদ্ধ পৌষ শুক্ল পক্ষের অন্তর্গত হবে। এই তথ্য নির্দেশনার জন্য বিশ্বামিত্র আশ্রমে প্রবেশ করার পরই দীক্ষিত হয়ে পরবর্তী ছয় অহোরাত্র মৌন থাকেন। পাঁচ অহোরাত্র গত হওয়ার পর ষষ্ঠ অহঃতে মারীচ ও সুবাহুর আগমন।

আগ্নেয় অস্ত্রে সুবাহুকে নিধন। সূর্যর মকরক্রান্তিতে অবস্থানকালে বায়ু প্রবাহেরও দিক পরিবর্তন ঘটে। এখানে সুবাহু অর্থাৎ বিস্তৃত বাহু যার এই শব্দটির দ্বারা বায়ু প্রবাহ এবং আগ্নেয় অস্ত্র অর্থে মকরক্রান্তি রেখায় সূর্যতাপ বিকীরণ ইংগিত করে। সুবাহুকে হনন অর্থে বায়ু প্রবাহর দিক পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে।

শীতেষু অস্ত্রে মারীচকে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে নিক্ষেপ। শীত নামক ইষু (তীর, বাণ) এই সূত্রে শীতেষু শব্দের মধ্যে হিমঋতুর প্রস্তাবনা গ্রহণ করা যায়। মারীচ শব্দটি মরীচি-সম্বন্ধীয়। মরীচি অর্থ কিরণ, রশ্মি। সুতরাং এই শব্দে প্রখর সূর্যতাপকে নির্দেশ করছে, যা শীতকালে প্রখরতা হারায় এবং পুনরায় গ্রীষ্মকালে প্রকাশিত হয়। রামায়ণকালে সৌর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় দুই মাস গ্রীষ্মঋতুর অন্তর্গত ছিল। বৃষ ও মিথুন রাশিদ্বয় ছায়াপথে নিমজ্জিত। বৈদিক সাহিত্যে ছায়াপথ সমুদ্র নামে চিহ্নিত। একশত-যোজন-বিস্তৃত শব্দে ছায়াপথের বিশালতা প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব শীতেষু অস্ত্রে মারীচকে সমুদ্রে নিক্ষেপ অর্থে উত্তরায়ণকালে শীত ও বসন্তঋতুর পর সূর্য বৃষ রাশিতে এলে তখন সূর্যতাপের প্রখরতা বাড়বে। সুতরাং বিশ্বামিত্র ও সিদ্ধাশ্রম উপাখ্যানে উত্তরায়ণাদির স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রামের জন্মকাহিনী বিশ্লেষণ করেও অনুরূপ তথ্যই পাওয়া গিয়েছে।

অযোধ্যা ত্যাগ করে সিদ্ধাশ্রমে পৌঁছানোর বিবরণ এবং এই উপাখ্যানের ঊনষোড়শ এবং দশরাত্র শব্দ দুইটির প্রদত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি স্থূল রূপরেখা টানা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য প্রকরণের আলোচনার সূত্রে রামায়ণের কালে শারদ-বিষুব অনুষ্ঠিত হত ১৮৬°৪০′ (একশত ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়)

এই তথ্যকে অবলম্বন করে বক্তব্যের অবতারণা করা হচ্ছে।

অযোধ্যা ত্যাগকালে রাম লক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্রর সঙ্গে কয়েকটি নক্ষত্রর তুলনা আছে।

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী। কলাপী অর্থ চন্দ্র, ধনুষ্পাণী ধনুরাশি। আশ্বিন পূর্ণিমার পূর্ববর্তী অমাবস্যা আন্দাজ ১৮০°৩২′ (একশত আশি অংশ বত্রিশ কলায়) অনুষ্ঠিত হলে চন্দ্রর ধনুরাশিতে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থানকালে আশ্বিন শুক্লা ষষ্ঠী তিথি হওয়ার সম্ভাবনা।

ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ। পন্নগ অর্থে যা পতিত হয়ে গমন করে। তিন তারা বিশিষ্ট ভরণী নক্ষত্রকে ত্রিশীর্ষ পন্নগ বলা যায়। পন্নগ অর্থে সর্প ধরে অশ্লেষা নক্ষত্রকেও সাধারণভাবে নির্দেশ করা চলে।

পিতামহ রোহিণী নক্ষত্র ; যার বৈদিক নাম ব্রহ্মা।

কালপুরুষ নক্ষত্রর দক্ষিণ পদের উজ্জ্বল তারাটির নাম স্থাণু।

কৃত্তিকা নক্ষত্রর বৈদিক নাম অগ্নি, পাবক। কুমারাবিব পাবকী অর্থে কৃত্তিকা নক্ষত্র। সূর্যর তুলা রাশিতে অবস্থানকালে রাত্রির আকাশে ধনুরাশি, স্থাণু, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী নক্ষত্রগুলি দেখা যায়। অযোধ্যা ত্যাগ করে রাম বলা ও অতিবলা মন্ত্র গ্রহণ করার পর শরৎকালীন সহস্রকিরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করেন। বরাহ মতে কার্তিক মাসের আদিত্যর নাম দিবাকর। অতএব রামের এই শোভাধারণ শরৎ-ঋতুর ইংগিত।

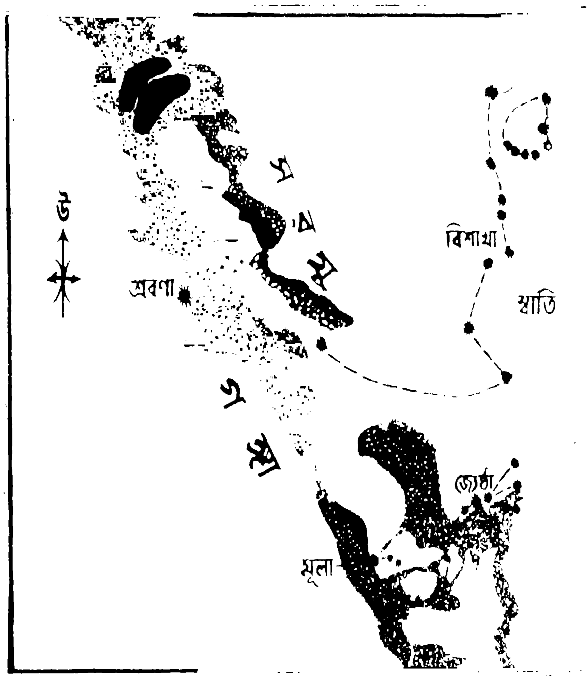
সুতরাং সিদ্ধাশ্রম প্রসঙ্গর অনুসরণে বলা যায় আশ্বিন শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্যর চিত্রা নক্ষত্রে ১৮৬°৪০′ (একশত ছিয়াশি অংশ চল্লিশ কলায়) রামায়ণকালে শারদ-বিষুব ছিল।

এখন বিশ্বামিত্র প্রমুখর সিদ্ধাশ্রম প্রবেশের পূর্বে বিভিন্ন স্থানে রাত্রিবাস গুলির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথম রাত্রিবাস সরযূর দক্ষিণতীরে। সেখানে রাম পর্ণশয্যায় শয়ন করেছিলেন। যে জ্যোতিষ্ক প্রবহটি তুলা ও বৃশ্চিক রাশিকে আচ্ছন্ন করে ছায়াপথে মিলিত হয়েছে সেই প্রবহটিকে সরযূ বলা হয়েছে। এই প্রবহের দক্ষিণতীরে বিশাখা নক্ষত্র। পৃথিবী হতে দর্শকের দৃষ্টিতে ছায়াপথের ডানদিকে বিশাখা নক্ষত্র দৃশ্য হয়, একারণে সরযূর দক্ষিণতীর বলা হয়েছে। বিশাখা নক্ষত্র চ্যুত পত্রমালা সদৃশ আকৃতির। বিশাখা নক্ষত্রর বৈদিক নাম ইন্দ্রাগ্নী ; প্রথম ভাগ 'ইন্দ্র' পত্রাকৃতি এবং পরবর্তীভাগ 'অগ্নি' লতাসদৃশ।

সুতরাং সরযূর দক্ষিণতটে রামের পর্ণশয্যায় শয়ন অর্থে বৃশ্চিক রাশিতে বিশাখা নক্ষত্রর শেষ পাদে অমাবস্যা তিথি।

সূর্যর মকররাশি সংক্রমণের প্রাক্কালে অমাবস্যা হলে স্বাতি নক্ষত্রে কার্তিক পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যা হয় বিশাখা নক্ষত্রর আন্দাজ ২১০° (দুইশত দশ অংশে)।



বিশ্বামিত্ররা অযোধ্যা ত্যাগ করে অধ্যর্দ্ধযোজন পথ অতিক্রম করে সরযূর দক্ষিণতটে উপনীত হয়েছিলেন। যা যুক্ত করে তাকে যোজন বলা যায়। সাতাশটি নক্ষত্র পরস্পর যুক্ত হয়ে সূর্যক্রান্তিপথ তৈরি করেছে। সুতরাং অধ্যর্দ্ধযোজন অর্থে দেড় নক্ষত্র। স্বাতি নক্ষত্রর প্রথম পাদ হতে বিশাখা নক্ষত্রর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত সূর্য অগ্রসর হয়ে বিশাখা নক্ষত্রর যে অংশটি সরযূ নামধেয় জ্যোতিষ্ক প্রবহের কাছে, সেখানে উপনীত হওয়ার পর বিশ্বামিত্র রামকে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করেছিলেন। শারদ-বিষুবর

পর হতে সূর্যর গতি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি দক্ষিণ-পূর্বমুখী বায়ুপ্রবাহ প্রবল হতে প্রবলতর হয়। বলা ও অতিবলা মন্ত্র অর্থে সূর্যর এবং বায়ু-প্রবাহর উভয়ের গতি বৃদ্ধি ইংগিত করা হয়েছে মনে করি।

দ্বিতীয় রাত্রিবাস কামাশ্রমে।

বিশাখা নক্ষত্রর ২১০° (দুইশত দশ অংশে) অমাবস্যা হলে পরবর্তী অমাবস্যা হয় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রর শেষপাদে অর্থাৎ আন্দাজ ২৩৯°৫৮′ (দুইশত উনচল্লিশ অংশ আটান্ন কলায়) সূর্যর অবস্থানকালে। ব্যোমমণ্ডলে ছায়া-পথ ও সরযূ নামধেয় জ্যোতিষ্ক প্রবহর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রর অবস্থান। ত্রিপথগা শব্দে ছায়াপথ বুঝানো হয়েছে। এখানে সুদূরতম অতীতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। বৈদিককালে সূর্য মৃগাশিরা নক্ষত্রে চন্দ্র জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় বাসন্ত-বিষুব সময়ে জন-সমাজে মদনোৎসব অনুষ্ঠিত হত।

স্থাণুর সমাধিস্থ হওয়া অর্থে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব ও মদনোৎসব। অয়নচলন হেতু বাসন্ত-বিষুব পশ্চাদ্‌গামী হয়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে এলে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শারদ-বিষুব অনুষ্ঠিত হয়। ফলে মদনোৎসবের মাসের পরিবর্তন ঘটে; অর্থাৎ অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষর বদলে জ্যৈষ্ঠ মাস। স্থাণু শব্দে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব এবং রুদ্র শব্দে ঐ নক্ষত্রে শারদ-বিষুব ইংগিত করা হয়েছে। রুদ্রর মরুদ্‌গণের সঙ্গে বিচরণ অর্থে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হতে অয়ন-চলনের পশ্চাদ্‌গমন। মরুদ্‌গণ স্বাতি নক্ষত্র। এই পরিবর্তন নির্দেশ করার কারণে কামের অঙ্গত্যাগের স্থান হিসাবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানটিকে 'কামাশ্রম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ-কালে অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত ঋতুর অন্তর্গত; মনোহর কাল।

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে প্রত্যুষে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় হয়। বেদে অগস্ত্য নক্ষত্র দিব্যনৌকা। মুনিগণের নৌকা আনয়ন এবং এই নৌকায় ত্বরায় নদী উত্তরণ অর্থে সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কালে খুব অল্প সময়ের জন্য অগস্ত্য নক্ষত্র দেখা যায়, তারপরই সূর্যালোকে অদৃশ্য হয়। ব্যোমমণ্ডলে যেখানে অগস্ত্য নক্ষত্রর অবস্থান সেখানে ছায়াপথ ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং ছায়াপথের এই স্থানটিকে জাহ্নবী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় রাত্রিবাস অগস্ত্যাশ্রমে তথা তাড়কাবনে।

মূলা নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে সৌর পৌষ মাস, রামায়ণ-কালে হেমন্তঋতুর অন্তর্গত ছিল। এই ঋতুতে ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জুন, পাটলী,

বদরী, তিন্দুক, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ ফল-পুষ্পে সুশোভিত হয়। এই বৃক্ষাদির উল্লেখ করে হেমন্তঋতুর ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

বৃত্রহত্যার পর এখানে ইন্দ্রকে দেবতারা স্নান করিয়েছিলেন। মলদ ও করূষ দুই জনপদ অর্থে ছায়াপথে নিমগ্ন মূলা ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রদ্বয়কে ইংগিত করা হয়েছে মনে করি।

জোষ্ঠা নক্ষত্রে শারদ-বিষুবর কালে সৌর পৌষ মাস শরৎঋতুর অন্তর্গত থাকায় তখন মানবসমাজে বর্ষান্তে এই মাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ অবশ্যই আকর্ষণীয় ছিল। প্রত্যূষে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয় দেখে অনুষ্ঠানাদি হত। কিন্তু পরবর্তী কালে অয়ন পশ্চাদ্‌গামী হওয়ায় সৌর পৌষ মাসের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়। একারণে কাহিনীতে তাড়কা কর্তৃক অগস্ত্যাশ্রম বিনাশ বলা হয়েছে।

মূলা রাক্ষস-নক্ষত্র, বৈদিক নাম নির্ঋতি। এই সুবাদে স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থ অলক্ষ্মী। এই সূত্র ধরে তাড়কা চরিত্রের অবতারণা। পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রর বৈদিক নাম অপাংনপাৎ। নপাতের এক অর্থ স্রোত বা সন্তান। একারণে নির্ঋতির পরবর্তী নক্ষত্র অপাংনপাৎ তাড়কার পুত্র মারীচ হিসাবে কল্পিত হয়েছে। পুত্রসহ তাড়কাকে রাক্ষসত্বের অভিশাপ দিয়ে অগস্ত্যর আশ্রম ত্যাগ অর্থে শারদ-বিষুবর পশ্চাদ্‌গমন এবং অগস্ত্য নক্ষত্রর বিশেষ ভূমিকার লোপ।

যক্ষিণী তাড়কার রাক্ষসীতে রূপান্তর।

যক্ষ ও রক্ষর উৎপত্তির পুরাণ কাহিনী অনুসরণে বলা যায় শরৎ ঋতুতে শস্যসম্ভার পরিপুষ্ট হয় অর্থাৎ ভাল ফলনের জন্য বৃদ্ধি লাভ করায় পূজিত হয় এবং হেমন্তঋতুতে পরিপক্ক ফসল ঘরে ওঠে অর্থাৎ বীজের মধ্যে আগতদিনের শস্যচারা রক্ষিত হয়। সুতরাং তাড়কার রূপান্তর ঋতু পরিবর্তনের তথ্য।

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রর ২৪০° (দুইশত চল্লিশ অংশে) সূর্যর ধনুরাশিতে সংক্রমণের পর অমাবস্যার নিবৃত্তি ঘটলে পরবর্তী অমাবস্যা হয় ধনুরাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রর প্রথম পাদে।

তাড়কার 'বসত্যত্যর্দ্ধযোজন' শব্দে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রর এই অংশটি নির্দেশ করা হয়েছে। ধনুরাশিতে সূর্যর অবস্থানকালে দুইটি অমাবস্যা হওয়ায় এই মাসটি ক্ষয়মাস হয়। ক্ষয়মাস বর্ষচক্রের মধ্যে চোরের মত অথবা জোর করে প্রবেশ করেছে গণ্য করা যায়। সুতরাং মাসটিকে

উচ্ছেদ বা হনন করা স্বাভাবিক। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে ক্ষয়মাস ও মলমাস সংশ্লিষ্ট চারটি শব্দ পাওয়া যায়। সংসর্প, অহংস্পতি, ভানু-লঙ্ঘিত এবং মলিম্লুচ। মলিম্লুচ শব্দের অর্থ চোর-স্বরূপ। সুতরাং এই শব্দে ক্ষয়মাস বুঝাতো মনে হয়।

এই তথ্য প্রকাশের কারণে রাক্ষসী তাড়কার পরাক্রমশীলতা এবং নারী হওয়া সত্ত্বেও নিধন করার জন্য বিশ্বামিত্রর রামকে নির্দেশদান।

তাড়কা নিধন কাহিনীর মধ্যে আরও একটি তথ্যের ইংগিত পাওয়া যায়।

রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার সংকল্প ঘোষণার পর সীতার বক্তব্যমত রামের তখন চব্বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। তারপর দশরথের জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করেছিল রাহু। রাহুর এই অবস্থান বিচার করলে দেখা যায় রামের ষোল বছর বয়সে রাহু ছিল ধনুরাশির শেষাংশে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রর প্রথম পাদে। রামায়ণের ঘটনাকালে এই বিশেষ বৎসরে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রর ঐ অংশে সূর্যগ্রহণ হতে পারে, হয়ত পূর্ণগ্রাস হওয়ায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। সূর্যগ্রহণ অনুমান করা হচ্ছে এই কারণে যে বিশ্বামিত্র রামকে নিশাকালের পূর্বেই রাক্ষসী তাড়কাকে বধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

সূর্যগ্রহণের কালে সূর্য অস্তমিত হলে রজনীর অন্ধকার ও গ্রহণের অন্ধকার একীভূত হয়ে যাওয়ার দরুণ গ্রহণকালের ব্যাপ্তি স্পষ্ট হয় না। কিন্তু অপরাহ্নে সূর্যগ্রহণ হয়ে সন্ধ্যার পূর্বে মোক্ষ হলে পুনরায় সূর্যদর্শন ঘটে। তাড়কা নিধনের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। ক্ষয়মাসের অমাবস্যা তিথিতে সূর্যগ্রহণ হয় এবং অমাবস্যা তিথিতেই সূর্যর মকররাশি সংক্রমণের পরেই শুক্লা প্রতিপদ তিথির প্রবৃত্তি।

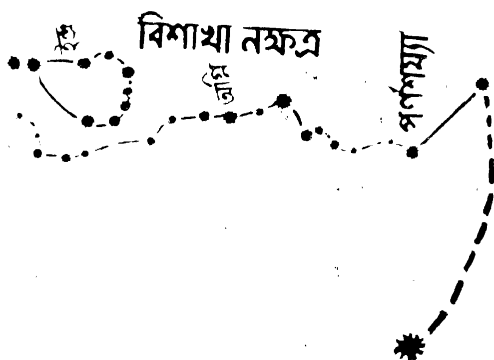
এই উপাখ্যানে লক্ষণীয় যে তাড়কা-নিধন কালে মারীচ উপস্থিত ছিল না। সীতাহরণ বিষয়ে মারীচের সঙ্গে রাবণের দুই দফার কথোপ-কথনকালে এবং সিদ্ধাশ্রমে মারীচ আগমন করে তার মাতৃহত্যা বিষয়ে কোন উল্লেখ করে নাই। সুতরাং তাড়কা ও মারীচের মাতা-পুত্র সম্বন্ধটি নিছক রহস্য সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

চতুর্থ দিবসে সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ এবং রাত্রিবাস।

যদি ধনুরাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ২৬৯°৩০′ (দুইশত উনসত্তর অংশ ত্রিশ কলায়) অমাবস্যা তিথির প্রবৃত্তি হয় রাত্রি আন্দাজ দশটায়

তাহলে সূর্যর মকররাশিতে সংক্রমণের পর রাত্রি প্রায় বারোটায় অমাবস্যা তিথির নিবৃত্তি হবে। এই দিনের পর পাঁচ অহোরাত্র গতে ষষ্ঠ দিবসে শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে সূর্যর অবস্থান আন্দাজ ২৭৬°৪০′ (দুইশত ছিয়াত্তর অংশ চল্লিশ কলায়)। এই দিন উত্তরায়ণাদি ছিল।[৬]

এই অভূতপূর্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান তথ্য ভিত্তি করে আদিকবি তাড়কা নিধন কাহিনীর মধ্যে রামায়ণের কাল তথা ঘটনার সময়কালের সুন্দর সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়েছেন।



কথা-অবশেষ

শুরুতে যে কথা বলেছি, গ্রন্থের শেষে আবার সেই কথাটি স্মরণ করি। একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির কারণে বাল্মীকি ছদ্মনামের আড়ালে কোন সর্বশাস্ত্র বিশারদ এই মহাকাব্য রচনা করেছিলেন মনে করি। রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কারণে কোন নৃপতির পরিত্যক্তা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠা করাই এই মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্য। চারণবেশী লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র সত্য উপলব্ধি করে নির্বাসিতা পত্নী সীতার সন্তানদ্বয়কে পুত্ররূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে রামচন্দ্রর ভ্রাতা শত্রুঘ্ন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে মথুরায় পূর্ণ মর্যদার সঙ্গে রাজত্ব করা সত্ত্বেও এই মহাকাব্যর সূত্র ধরে নিঃশব্দে বিনা রক্তপাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্থির হয়েছিল। এজন্য দেখা যায় রামচন্দ্র কুশকে রাজ্যের মূল অংশ কোশল এবং লবকে উত্তর কোশলের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।

মহাপণ্ডিত আদিকবি তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের স্বার্থে মহাকাব্যে নিপুণ-ভাবে কৃষিভিত্তিক লোকসঙ্গীতের আধারে ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত করে রহস্য সৃষ্টি করেছেন।

সংস্কারমুক্ত মনে রামায়ণ পাঠ করলে সহজেই অনুধাবন করা যায় একদা সুদুর অতীতে কোশল নামক রাজ্যের রাজধানী তথাকথিত অযোধ্যার রাজঅন্তঃপুরে কোন এক সময়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এর ফলে যুবরাজ-ঘোষিত রাজপুত্রকে রাজধানী ত্যাগ করতে হয়। কিছুকাল পরে, আপাততঃ মহাকাব্য অনুসরণে চৌদ্দ বৎসর সময়কাল ধরা যেতে পারে, সেই নির্বাসিত রাজপুত্র হৃত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ব্যক্তি-জীবনে এই রাজপুত্রকে কখনই সুখী বলা যায় না। কারণ নির্বাসনকালে তিনি বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন ; যেমন মহাকাব্যে

দেখা যায় চিত্রকূট ত্যাগের পর বালিবধ পর্যন্ত সকল ঘটনার মধ্যে ইংগিতে রাজ্যবিস্তার তথা ক্ষমতা হস্তগত করার রাজনৈতিক কার্যকারকতা প্রকাশ পাচ্ছে। অপরদিকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের পর বিভিন্ন ঘটনা যথা লবণ বধ, শম্বুক বধ ইত্যাদি ঘটনা রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের সাক্ষ্য বহন করে।

মহাকাব্যটিকে স্থূলভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ হতে রামচন্দ্রর নির্বাসন, (২) কিষ্কিন্ধ্যা প্রসঙ্গ এবং (৩) লংকার ঘটনাবলী। একটি ক্ষীণ যোগসূত্র তিনটি ভাগকে বেঁধে রেখেছে। লক্ষণীয় যে রাবণের অস্তিত্ব অযোধ্যার রাজা দশরথের অজানা ছিল না। বিশ্বামিত্র দশরথের রাজ-দরবারে রাবণের দুর্ধর্ষতার কথা জানিয়েছিলেন। সুতরাং অযোধ্যাবাসীগণ পরাক্রান্ত রাবণ ও তার অত্যাচার বিষয়ে সম্যক অবগত ছিল। কিন্তু এতবড় লংকা যুদ্ধের কোন প্রতিফলন বা প্রতিক্রিয়া অযোধ্যা তথা কোশলরাজ্যে হয়নি, অন্ততঃ তার কোন উল্লেখ আদিকবি করেননি। দেখা যায় চিত্রকূটে রাম ও ভরতের সাক্ষাৎকারের পর রাবণ-বধের ঘটনা পর্যন্ত অযোধ্যা রাজ্যের কোনই উল্লেখ নাই।

বালি বধের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। রাবণের সঙ্গে বালির সখ্যতা ছিল। রাম বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে দিলেন, কিন্তু তার কোন ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া লংকায় হয়নি ; এই প্রসঙ্গর কোন উল্লেখ মহাকাব্যে নাই।

এমত বিভিন্ন ঘটনা অনুধাবন করলে মনে হয় অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা এবং লংকা এই তিন রাজ্য যেন একান্তভাবে স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগ-হীন ; যেন তিন গ্রহে অবস্থিত। একমাত্র রাম ও লক্ষ্মণ এই তিন রাজ্যের যোগসূত্র। মহাকাব্যে আপাতঃদৃষ্টিতে এই যে অসংগতি লক্ষিত হয়, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই অসংগতির মধ্যে অবশ্যই রহস্য আছে। রহস্য অনুভূত হয় যখন দেখা যায় কিষ্কিন্ধ্যার বানর রাজ্যে একটি মাত্র হনুমান আছে। বানর শব্দে বনচর ধরে কিষ্কিন্ধ্যাকে অন্-আর্য আদিবাসী (কিন্তু অশিক্ষিত ও অসভ্য মনে করার কারণ নাই) অধ্যুষিত রাজ্য বলা যায়। হনুমানকে সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, রণকুশলী অথচ বহিরাগত ব্যক্তি হিসাবে চেনা যায়। এক্ষেত্রে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হনুমানের জন্মকাহিনী এবং

হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন নিছক নৈসর্গিক ঘটনা। কিন্তু রাম ও সুগ্রীবের সখ্যতা, হনুমানের সঙ্গে লংকার অশোকবনে সীতার সাক্ষাৎকার ইত্যাদি ঘটনার ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা যায় না। তখন হনুমান একটি ব্যক্তিবিশেষ। অতএব হনুমান নামধেয় চরিত্রটির মধ্যে ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক তত্ত্বের সমাবেশ এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে সত্য উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান গ্রন্থে কয়েকটি মূল চরিত্রের একাধিক সত্তা উন্মোচন করা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন ঘটনা প্রভৃতির বর্ণনার মর্মে উপনীত হতে পারলে দেখা যাবে অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা ও লংকা একই মহাদেশে পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কযুক্ত।

প্রথমেই বলেছি রামায়ণের দুইটি সত্তা আছে ; ব্যাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত। এই গ্রন্থের অল্প পরিসরে মহাকাব্যের বাহ্যিক স্বরূপটি উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্র ও চরিত্রকে অবলম্বন করে রাম-কথার কৃষিসত্তাকে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কৃষির সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য বিভিন্ন উপাখ্যানে প্রকাশ্যে অথবা রহস্যে পাওয়া যায়।

রাম ও সীতার মেঘ ও কৃষিদৈবত সত্তা অবলম্বনে কালক্রমে রাম-কথাকে ধর্মগ্রন্থে রূপায়িত করা হয়েছে। তবু এই কৃষিসত্তার সূত্রে প্রদত্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান তথ্য অতীতের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার সময়কালের নির্দেশ করছে। পূর্বোক্ত প্রকরণগুলিতে সেই সময়কালের অয়ন ও বিষুব স্থান চিহ্নিত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছি। সেই তথ্যের সঙ্গে বর্তমান কালের সূক্ষ্ম হিসাব সম্বলিত ১৯০০ শকাব্দের 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যাদির তুলনামূলক বিচার করা যেতে পারে।

	উত্তরায়ণ	বাসন্ত-বিষুব	দক্ষিণায়ন	শারদ-বিষুব
সিদ্ধাশ্রম কাহিনী অনুসারে	২৭৬।৪০।০০	৬।৪০।০০	৯৬।৪০।০০	১৮৬।৪০।০০
রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ অনু-সারে (১৯০০শকাব্দ)	২৪৬।১২।৩৭	৩৩৬।১৩।৪৫	৬৫।৪৩।১৯	১৫৬।০৩।২২
কালের ব্যবধান	৩০।২৭।২৩	৩০।২৬।১৫	৩০।৫৬।৪১	৩০।৩৬।৩৮

দুই সময়কালের অয়ন ও বিষুবর ব্যবধান গড় হিসাবে
(৩০।২৭।২৩ + ৩০।২৬।১৫ + ৩০।৫৬।৪১ + ৩০।৩৬।৩৮) = ১২২।২৬।৫৭
÷ ৪ = ৩০।৩৬।৪৪ (ত্রিশ অংশ ছত্রিশ কলা চুয়াল্লিশ বিকলা)।

বাৎসরিক ৪৮″ (আটচল্লিশ) বিকলা অয়নবেগ হিসাবে ৩০।৩৬।৪৪ (ত্রিশ অংশ ছত্রিশ কলা চুয়াল্লিশ বিকলা) বিষুব পশ্চাদ্‌গামী হতে প্রায় ২২৯৫ (দুই হাজার দুইশত পঁচানব্বই) বৎসর লাগে।

সুতরাং ২২৯৫ হতে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ (১৯০০ শকাব্দ) বাদ দিলে খৃঃ পূঃ ৩১৭ অব্দে উত্তরায়ণ ছিল ২৭৬°৪০′ (দুইশত ছিয়াত্তর অংশ চল্লিশ কলায়)। অতএব ঐতিহাসিক রামচন্দ্রর জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৩৩৩ অব্দ দাবী করা যায়। এই অনুসারে

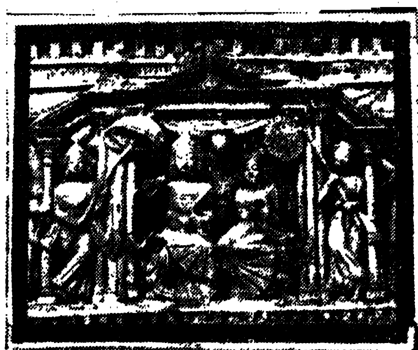
রামচন্দ্রর জন্ম	খৃঃ পূঃ	৩৩৩ অব্দ
মারীচ ও সীতার হিসাবমত বারো বৎসরে বিবাহ	খৃঃ পূঃ	৩২১ অব্দ
ষোল বৎসরে সিদ্ধাশ্রম ঘটনা	খৃঃ পূঃ	৩১৭ অব্দ
জামদগ্ন্যর দর্পচূর্ণ	খৃঃ পূঃ	৩১৬ অব্দ
চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর বনগমন	খৃঃ পূঃ	৩০৮ অব্দ
লংকাযুদ্ধে রাবণকে বধ করার পর ১৪ (চোদ্দ) বৎসর বনবাসকাল পূর্ণ এবং তারপরে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ	খৃঃ পূঃ	২৯৫ অব্দ

রামায়ণের দুইটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাবণ এবং হনুমান সম্পর্কে

এই গ্রন্থে কোন বিশ্লেষণ সংযোজিত না হওয়ায় আপাতঃদৃষ্টিতে ত্রুটি মনে হতে পারে। রাম-কথার কৃষিসত্তা প্রমাণের ক্ষেত্রে রাবণ অনাবৃষ্টির প্রতীক একথা বলেছি। যে কথা বলা হয়নি, তা হল হনুমান সেই বায়ুপ্রবাহ যা গ্রীষ্মঋতুর শেষ পর্যায়ে মেঘকে আকর্ষণ করে এনে বর্ষাঋতুতে বারিবর্ষণে সহায়তা করে। হনুমানের এই নৈসর্গিক সত্তা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে তার জন্ম ও বাল্যকাহিনীতে স্পষ্ট হয়।

হরধনু ভঙ্গ করে অযোধ্যায় ফেরার পথে জামদগ্ন্যর ঔদ্ধত্যর উচিত শিক্ষা কম আকর্ষণীয় নয়। জামদগ্ন্য মূলতঃ পৃথিবী হতে খালি চোখে দৃশ্যমান একটি ধূমকেতু; যেটিকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে আতঙ্ক জড়িয়ে আছে। এই ধূমকেতুটি, বর্তমানে 'হ্যালীর ধূমকেতু' নামে পরিচিত, প্রামাণ্য তথ্যানুসারে খৃঃ পূঃ ২৪০ অব্দে দেখা গিয়েছিল। হিসাব অনুসারে খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দেও এটির আবির্ভাব ঘটেছিল; অর্থাৎ রামায়ণ কাহিনীতে যে বৎসরে দাশরথি রাম জামদগ্ন্যর দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

এই গ্রন্থের অল্প পরিসরে এই সকল প্রসঙ্গর বিচার করা সম্ভব হল না, আগামীতে এই গ্রন্থের উত্তর-ভাগে রামায়ণের অন্যান্য চরিত্র ও উপাখ্যানের বিশ্লেষণ দেওয়ার বাসনা আছে। সংকল্প আছে রামায়ণের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তথ্যর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।



সংযোজন

"রামায়ণের উৎস কৃষি" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

'বাল্মীকি-রামায়ণ' সাধারণভাবে একটি ধর্মগ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত। পূর্বে এবং ইদানীন্তন কালেও রামায়ণ-পারায়ণ অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পাঠ সমাপনই রামায়ণ-পারায়ণের অর্থ। একজন পাঠক ও দুইজন ধারক ব্রতী হইয়া এই ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এজন্য আমার বাল্যকালে আমাদের গৃহেও রামায়ণ-পারায়ণ অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল এবং আমাকে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে রামায়ণের উপর কথকতা ভঙ্গিতে ব্যাখ্যান দিতে হইয়াছিল, সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণের বহুলাংশ আমার পঠিত ও আলোচিত।

এই গ্রন্থকার যাহা মনে করিয়াছেন, আমিও তাহাই মনে করি যে, রামায়ণের রূপকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিলে রামায়ণের মাহাত্ম্য—অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থস্বরূপতা বা ঐতিহাসিকতা নষ্ট হইবে—তাহা নহে।

কারণ ইহা ভারতীয় ভাবধারার পরম্পরা সিদ্ধ।

(১) ঋগ্বেদের ১ মণ্ডল ১৬৪ সূক্তের ২০ সংখ্যক মন্ত্রটি—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি, একটি রূপক। সংসার—একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। জীব ও ঈশ্বর যেন দুই পক্ষী—একজন কর্মফল ভোজন করে, আর একজন সাক্ষী, অথচ ইহা একটি মন্ত্র।

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনে ৩৭০ নং সিলে ইহার একটি চিত্রও পাওয়া গিয়াছে। সেই চিত্রে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আর তাহাতে দুইটি পক্ষী মুখোমুখী বসিয়া আছে।

এই প্রমাণ দৃষ্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৺বেণীমাধব বড়ুয়া এই চিত্রটি আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন ইহা বৈদিক সভ্যতারই

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০-২০

প্রতীক। স্যর্ জন মার্শ্যাল সিন্ধুসভ্যতা অনার্য্য-সভ্যতার নিদর্শন—যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ সিদ্ধ নহে। ইহা ব্যতীত শবদাহ চিত্র (দগ্ধ বংশখণ্ড, একটি কলস প্রভৃতি) আরও অনেক নিদর্শন পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আর্য্য-সভ্যতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শবদাহ প্রথা—আর্য্যদেরই, 'ভস্মান্তং শরীরম্' (ঈশোপনিষৎ-যজুর্বেদ)। অনার্য্যদের কবর দেওয়াই প্রথা—রামায়ণে (অরণ্যকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ ২২ শ্লোক) প্রমাণ পাওয়া যায়—রাক্ষসাং গতসত্ত্বানামেষ ধর্ম্মা সনাতনঃ। অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ॥ ভূগর্ভে যাহাদের দেহ প্রোথিত হয়, তাহাদের নিত্যলোক প্রাপ্তি হয়, গতপ্রাণ রাক্ষসদের (অনার্য্যদের) ইহাই চিরন্তন ধর্ম।

এই গ্রন্থকার সিন্ধু সভ্যতা প্রসঙ্গে আর্য্য-অনার্য্যের সংমিশ্রণ কথার উল্লেখ করিয়াছেন—রামায়ণ-আলোচনার মধ্যে ইহা অপ্রাসঙ্গিক ও সন্দিগ্ধ বিষয়।

(২) ঋগ্বেদের (১০ মণ্ডলের ১০ম সূক্ত) যম-যমী বিষয়ক মন্ত্রগুলি দিন-রাত্রির রূপকরূপে প্রকাশিত।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে ২৭-২৯ অধ্যায়ে পুরঞ্জন উপাখ্যান বর্ণনার পর উপসংহারে ইহা যে রূপক, তাহা বলা হইয়াছে, এরূপ বহু রূপক চিন্তার দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। সুতরাং গ্রন্থকারের রূপকবাদ দোষাবহ নহে।

গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, ওয়েবার সাহেবের লেখা হইতে এই রূপকবাদের প্রেরণা পাইয়াছেন, তাহাও আমি দোষের মনে করি না। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতায় (জ্যোতিষ গ্রন্থ) লিখিত হইয়াছে যে,—

ম্লেচ্ছা হি যবনা স্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রং ব্যবস্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পুজ্যন্তে কিমন্যে ব্রাহ্মণ ব্রুবাঃ॥

ম্লেচ্ছ (বর্ণহীন) যবন (গ্রীক, রোমক)দের নিকটে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্যগ্-ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহারাও ঋষিবৎ সম্মানের পাত্র, অন্য যাহারা ব্রাহ্মণতুল্য তাহাদের ত' কথাই নাই। সুতরাং বিদেশীয় মনীষীর প্রেরণাও দোষাবহ নহে; যদি তাহা সত্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি সংস্কারমুক্ত চিত্তে নিরপেক্ষভাবে এই গবেষণা গ্রন্থের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

(ক) সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গল পদ্ধতি—হলরেখা, ইহা অভিধান সম্মত, এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না।

ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন—সীতা = furrow of plough, সীতার

সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে রামকে এজন্য হলধর রাম সহ অভিন্ন কল্পনা করিতে হইয়াছে। সেই কারণে রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ বলা ব্যতীত উপায় ছিল না। নতুবা 'হলধর রাম' রামায়ণে অজ্ঞাত পুরুষ। সুতরাং সঙ্গতি থাকে না। আমাদের গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাম অর্থে 'মেঘ' কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনার মূলে আবেস্তার 'রামাহুর' ও আরবী ভাষায় 'রামা' শব্দ 'সহ 'রাম' শব্দের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া 'মেঘ' অর্থ সঙ্গতির চেষ্টা করিয়াছেন। (ইংরাজী Ram এবং Rum শব্দ দুইটি সহ কোন অর্থগত সাদৃশ্য না থাকায় তাহা উল্লিখিত হয় নাই।)

এই গবেষণা গ্রন্থে দশটি পরিচ্ছেদ আছে—(১) প্রাক্‌কথা (২) আদি শ্লোক—মা নিষাদ (৩) প্রথম নাম—পৌলস্ত্য বধ (৪) রাম জন্ম-কথা (৫) রাম নামের উৎস (৬) সম্পাতি রহস্য (৭) কৃষিশ্রী সীতা (৮) ইক্ষ্বাকু বংশ (৯) কুশ বংশ (১০) জনক বংশ।

(খ) প্রাক্-কথা প্রসঙ্গে গ্রন্থাকারের মন্তব্য—"মূল কাহিনীর সঙ্গে উত্তরকাণ্ড প্রায় সম্পর্কহীন।" ইহার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝা যায় না। কারণ সীতার বনবাস, রামায়ণ বক্তা বাল্মীকির আশ্রমে সীতার গমন, লবকুশের উৎপত্তি—উত্তরকাণ্ডেই বর্ণিত।

মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি উত্তরকাণ্ডের ঘটনা লইয়া রঘুবংশ, উত্তর রামচরিত এবং আরও অনেক কবি উত্তরকাণ্ডকে পূর্ববর্তী ছয় কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থকারও উত্তরকাণ্ডের বর্ণিত বেদবতীর উপাখ্যান (৭১ পৃঃ) সীতার পূর্ব-জন্ম-কথার আলোচনা করিয়াছেন।

(গ) "অনুরূপভাবে বালকাণ্ডের অধিকাংশ উপাখ্যানগুলির সঙ্গে মূল কাহিনীর সম্পর্ক বিশেষ নাই। ঐ কাহিনীগুলির জন্য রাম কাহিনীর দেবত্ব মানিতে হয়।" (২য় পৃষ্ঠা) ·······"রাম কাহিনীর মানবিক সত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত"।

এই উক্তির সহিত লঙ্কাকাণ্ডের দুইটি শ্লোকার্থ তুলনা করিলে রাম নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে আমি মানব।

আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্‌ব্রবীতু মে॥

আমি নিজেকে দশরথতনয় মানুষ রাম বলিয়াই জানি। আমি কে বা কোথা হইতে আগত, সে কথা ভগবান্ আপনিই বলুন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন—

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেব কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্ ॥

সীতা লক্ষ্মী, আপনি বিষ্ণু দেব কৃষ্ণ ও প্রজাপতি।

সুতরাং এবিষয়ে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের সহিত লঙ্কাকাণ্ডের পূর্ণ সঙ্গতি (১১৯ সর্গ ১১, ২৭ ও ২৮ শ্লোক) দেখা যায়।

(ঘ) "বাল্মীকি নারদের মুখে রাম কাহিনী প্রথম শুনেছিলেন, সুতরাং বাল্মীকি রাম কাহিনীর স্রষ্টা ন'ন। প্রচলিত একটি কাহিনী" ইত্যাদি এ মন্তব্যও লেখকের সমীচীন নহে। কারণ, বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন— "কোন্বিহ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্" ইত্যাদি। সাম্প্রতম্— বর্তমান সময়ে, ইহলোকে এই ভূখণ্ডে কে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি গুণবান্ বীর্য্যবান্ ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ?

নারদ তপঃ স্বাধ্যায়রত, বাল্মীকিও তপস্বী—উভয়ই জ্ঞানী। যেরূপ প্রশ্ন—তাহারই অনুরূপ উত্তর কি হইবে ? একটি "প্রচলিত কাহিনী" ? ইহা কি বর্তমান ব্যক্তি না কল্পিত ব্যক্তি ? দশরথ তনয় রাম যে বাল্মীকির সমসাময়িক—ইহা পূর্বাপর ঘটনাবলির দ্বারাই প্রমাণিত।

রাম-কাহিনীর স্রষ্টা রাম নিজেই। বাল্মীকি বা নারদ কেহই নহেন। পর্য্যটক নারদ তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিয়াছেন, বাল্মীকি তাঁহার মুখে শুনিতে চাহিলেন। মনে হয় বাল্মীকি লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা সত্য কিনা জানিবার জন্য (verify করিবার জন্য) সর্বজ্ঞ যোগী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা কল্পিত কোন কাহিনী নহে। এই বৃত্তান্ত জানার পর তমসা নদীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে কলশ রাখিয়া বল্কল (পরিধেয় বস্ত্র) গ্রহণ করিলেন।

(ঙ) গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কলশ ও বল্কল শব্দে দুইটি বাদ্যযন্ত্র একটিকে রাখিয়া অপরটিকে গ্রহণ করিলেন, এইরূপ অর্থ করেন। স্নানের সময়ে বাল্মীকি যদি একজন কৃষক ও অথচ সঙ্গীতবিশারদ হন, তাহা হইলেও স্নানকালে দুইটি বাদ্যযন্ত্র স্কন্ধে লইয়া বা শিষ্যের স্কন্ধে চাপাইয়া লইয়া যাওয়ার কল্পনা কি স্থান কাল বিরুদ্ধ নহে ? কলশ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও সমীচীন নহে। 'কলম্' অব্যক্ত মধুরং শব্দং শ্যতি (শো + ড), সো ও শো ধাতুর অর্থ বিনাশ করা। বাদ্যের বিপরীতার্থ প্রকাশক হইতেছে। বল্কল শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাও কোন ব্যাকরণ বা অভিধান সম্মত নহে।

(চ) এখন দেখা যাউক, "আদি শ্লোক—মা নিষাদ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—(লেখকের অভিপ্রেত) সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে কি না ?

মা অর্থে 'লক্ষ্মী', নিষদ এবং নিষাদ সমার্থক যার অর্থ পতি (ইহা কোন অভিধানে পাওয়া যায় না) ; সুতরাং 'মা নিষাদ' শব্দে লক্ষ্মীপতি অর্থাৎ নারায়ণ। নার (জল) এ যার অয়ন (শয়ন, আশ্রয়) সহজ কথায় 'মেঘ' (১৩পৃঃ)।

'ক্রৌঞ্চ অর্থে রাক্ষস বিশেষ'। রক্ষ (রক্ষা করা) ধাতু নিষ্পন্ন রাক্ষস শব্দের অর্থ যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয় (রাক্ষস শব্দের এরূপ অর্থ কোন অভিধানে বা প্রয়োগে দেখা যায় না)। 'প্রাণ জগতের সৃষ্টি এবং স্থিতির মূলে দ্যাবাপৃথ্বী ; এই দ্যোঃ এবং পৃথ্বী আদিম পিতা ও মাতা। স্থূলভাবে দ্যোঃ অর্থে অন্তরীক্ষের সূর্য্য এবং পৃথ্বী অর্থে কর্ষণযোগ্য ভূখণ্ড, এই দুই এর সংযোগ মূলতঃ মানবসমাজের অগ্রগতির উৎস'। 'সূর্য্য এবং পৃথিবী সকল সময়েই মিথুনাবদ্ধ থাকিলেও'—(ইহা লেখকের কল্পনামাত্র। কোথায় সূর্য্য আর কোথায় পৃথিবী ?) "দক্ষিণায়নাদির প্রাক্‌কালে গ্রীষ্মঋতুতে ধরিত্রী উত্তপ্ত হয়ে উঠে—এই তপ্ত অবস্থাকে মহাকাব্যে কামমোহিত বলা হইয়াছে।" ইহাও কি কল্পনা-মাত্র নহে ? পৃথিবীকে সূর্য্যের সহিত মিথুনরূপে গ্রহণ অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত। দ্যাবাপৃথ্বীকে মিথুনপদে বরং গ্রহণ করা যায়।

(ছ) কামমোহিত শব্দে—'গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত' ইহাও কষ্টকল্পিত।

মেঘবন্দনার মধ্যে বলা হইয়াছে—'হে মেঘ ! শাশ্বতকালের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ কর'—মেঘ যদি পর্জন্যদেবও হয়, তাহা হইলেও কেহ মেঘের চিরস্থায়ি প্রতিষ্ঠার কামনা করে না। 'কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ' ইহাই বলা হয়। শশ্বদ্ বর্ষতু পর্জন্যঃ ইহা চিন্তার অতীত।

যেমন মেঘ না থাকিলে কৃষি হয় না, ধরিত্রী বন্ধ্যা থাকে, তেমনই মেঘের চিরস্থিতিও বাঞ্ছনীয় নহে। অতিবৃষ্টি অথবা বহুদিনব্যাপী মেঘের আচ্ছাদানবশতঃ কৃষিশ্রী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এরূপ অসঙ্গতি চিন্তনীয়।

দ্বিতীয় অসঙ্গতি এই যে,—পৃথিবী গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত হইবার পর মেঘ আবির্ভূত হইলে বা বর্ষণ হইলে বাল্মীকি কেন সর্বজীবই আনন্দ বা শান্তি লাভ করে। গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন—"প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর মেঘের আবির্ভাব শান্তি বা আরাম প্রদান করে।" (৪২ পৃঃ) কিন্তু ঐ দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে—ঋষের্ধর্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত। শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে

শ্লোকো ভবতু নান্যথা। 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ'।

অর্থাৎ 'মহর্ষির করুণরসের উদ্ভব হইল'—'শোকার্ত্ত আমার এই বাণী শ্লোকরূপে পরিণত হউক'—শোকই শ্লোক হইল—ইত্যাদি মূল বাক্যের সহিত গ্রন্থকারের রূপকবাদ অত্যন্ত অসঙ্গত হইতেছে না কি ? রূপকবাদ স্বীকার করিলেও পূর্বাপর সামঞ্জস্য অবশ্য চিন্তনীয় মনে করি।

(জ) 'মূল কাহিনীর সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে ক্রৌঞ্চবধের কোন সম্পর্ক নাই।' ইহাও লেখকের অমূলক আশংকা। কারণ সংস্কৃত ভাষায় তখনও কোন ছন্দোবদ্ধ বাণীর উৎপত্তি হয় নাই। সেই উৎপত্তির কারণরূপে বলা হইয়াছে—বাল্মীকি হৃদয়ের শোকময় ভাবোচ্ছ্বাস। ক্রৌঞ্চবধ ঘটনা দর্শন—ভাবোচ্ছ্বাসের কারণ। ইতিপূর্বে নারদের মুখে রামবৃত্তান্ত শুনিয়াছেন, সেই বিষয়বস্তু (Plot) অবলম্বন করিয়া শ্লোকময় রামায়ণ রচনা করা হইয়াছে—ইহাতে অসঙ্গতি কি আছে ? বরং লক্ষ্মী (সীতা)পতি রাম যে ক্রৌঞ্চমিথুন রাক্ষসদম্পতি রাবণ ও মন্দোদরীর একটি (পুরুষ) রাবণকে বধ করিয়া চিরন্তন গৌরব লাভ কর—এই অর্থটিই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা পরবর্তীকালে টীকাকারদের উদ্ভাবিত অর্থান্তর ; রূপকবাদে কল্পিত অর্থ অপেক্ষা এই ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না কি ?

ঋষিমুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত এই ছন্দোবদ্ধ বাণী যে বহুলার্থদ্যোতক তাহাই পরবর্তী মণীষীরা প্রমাণিত করিয়াছেন।

(ঝ) গবেষণা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে—"ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেদ রচনা শুরু হয়"—এই রচনা ঋষি নামধারী মানবগোষ্ঠী দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল—ইহাই লেখকের অভিপ্রায় মনে হয়, কিন্তু রামায়ণের আদিশ্লোক বাল্মীকির মুখ হইতে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বিস্ময়ের কারণ, ছন্দোবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমন্বিত এই বাণী। অথচ বেদ যদি মনুষ্যরচিত হয়—তাহাতে শত শত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক থাকিতে বাল্মীকির বিস্ময়ের কারণ কি ? বস্তুতঃ বেদ যে অপৌরষের—ইহা নির্ণয়ের পক্ষে আদিকবি বাল্মীকির এই বিস্ময় অন্যতম কারণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(ঞ) লেখকের একটি উদ্ভট মন্তব্য—যথা (৪ পৃঃ) "নাসাকর্ণচ্ছেদন হিন্দু সমাজে প্রাচীনকাল হতে বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি রীতি। সেই রীতি শূর্পণখার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'ল কেন ?"

কন্যাকালে (বিবাহের বহু পূর্বে) মেয়েদের নাক-কান বিঁধান হয়

অলঙ্কার পরিধানের জন্য। আর তাড়কা ও শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন বিরূপ করিবার জন্য, উভয় কার্য্যকে এক পর্য্যায়ে ফেলার অর্থ আমাদের অবোধ্য।

(ট) "শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদকালে 'সত্যবাদী রাম' লক্ষ্মণকে অবিবাহিত বলিয়াছিলেন—অথচ উভয়ের এক সময়ে বিবাহ হইয়াছিল।" ইহা লেখকের মন্তব্য।

রাম সত্যবাদী এবং ধর্মজ্ঞ; ধর্মশাস্ত্রে আছে যেমন, 'ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি' অর্থাৎ পরিহাস করিয়া মিথ্যা বলিলে দোষ হয় না। তেমনই 'ন স্ত্রীষু' 'ন বিবাহকালে' 'প্রাণাত্যয়'—স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহসময়ে, প্রাণবিনাশ কালেও মিথ্যাভাষণ দোষাবহ নহে। সুতরাং রাম চরিত্রের কোন অসঙ্গতি হয় নাই।

(ঠ) ঊর্মিলা, মন্থরা, শূর্পণখা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি এবং বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কতকগুলি প্রাসঙ্গিক চরিত্রের পরবর্তী বৃত্তান্তের মধ্যে উল্লেখ না থাকায় রামায়ণ গ্রন্থের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন লেখক মহাশয়।

অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে কাব্যে বা নাটকে দ্বিবিধ চরিত্র অঙ্কিত করা হয়। (১) আধিকারিক (২) প্রাসঙ্গিক। আধিকারিক অর্থাৎ প্রধান নায়ক নায়িকাদের চরিত্র শেষ পর্য্যন্ত বর্ণনীয়। আর প্রাসঙ্গিক চরিত্রগুলি যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই বর্ণনীয়। ইহাকে ত্রুটি বলা যায় না। (সাহিত্য দর্পণ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

(ড) "বলা হয়েছে যে রাম অযোধ্যার রাজপথে লবকুশকে গান গাইতে দেখে রাজপ্রাসাদে ডেকে এনেছিল। উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞে লবকুশকে এনেছিল—ইহা বলা হয়েছে।"

রাজপ্রাসাদে লবকুশকে ডেকে আনার পর তারা যে আর বাল্মীকির আশ্রমে ফিরে যাওয়ার প্রমাণ না থাকিলে—ইহা একটি অসঙ্গতি বা ত্রুটি বলা যাইতে পারে।

(ঢ) আদি নামকরণ--পৌলস্ত্যবধ—ইহা হইতে অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয় ও দক্ষিণায়ন সূর্য্যগতির সঙ্কেত—যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা উপাদেয়, তবে বধ শব্দের অর্থটি পরিস্ফুট হয় নি।

(ণ) রাম জন্ম কথা—এই প্রকরণটি লেখকের অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। দুই একটি শব্দের অর্থ কষ্ট কল্পিত—যথা ঋষ্যশৃঙ্গ—মৃগশিরা নক্ষত্র। ঋষ্য শব্দের অর্থ মৃগ, ইহা কল্পিত। অঙ্গনা অর্থে কন্যারাশি—

ইহা সহজবোধ্য। অঙ্গনা শব্দে বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকর রাশি বুঝায়—ইহার প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। তথাপি এই প্রকরণে রূপক—রামও যে 'উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে—মেষং গতে পুষণি—লগ্নে কর্কটকে' ইহার সহিত সামঞ্জস্য করা হইয়াছে—ইহাই প্রতিভার পরিচায়ক। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা শব্দেরও রূপকার্থ গ্রহণীয়।

(ত) 'রাম নামের উৎস'। এই গ্রন্থকারের মতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা অতি প্রাচীন, এবং রাম শব্দটি ঐ ভাষা হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। অথচ ইউরোপীয় সভ্যতা যে ৪০০০ চার হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নহে, ইহা সর্বস্বীকৃত। ডঃ হারম্যান জ্যাকবি সাহেবও প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'কৃত্তিকাঃ প্রাব্যা ন চ্যবন্তে'—শতপথব্রাহ্মণের এই কৃত্তিকানক্ষত্রের তাৎকালিক অবস্থান এবং বর্ত্তমান অবস্থান দ্বারা জ্যোতিষ-গণনার ফলে অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর পাওয়া যায়। এবং বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় তাঁহার 'Orion' নামক প্রবন্ধেও ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 'রাম নামের উৎস' প্রকরণটি তেমন ভাল লাগিল না।

ভারতবর্ষের বৈদিক মন্ত্রগুলিকে কৃষকসঙ্গীত (চাষার গান) বলিয়া ইউরোপীয় মনীষিগণ অনেকদিন পূর্বেই উদ্‌ঘোষিত করিয়াছিলেন। সমগ্র বেদে যেমন ইন্দ্র, পর্জন্য, বরুণ প্রভৃতি মেঘবাহন দেবতার উল্লেখ আছে—তেমনিই অগি, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেব, সরস্বতী, ঋভুগণ, সবিতা, দ্যাবাপৃথিবী, বিষ্ণু, বায়ু, মরুৎ, রুদ্র, সোম, ঊষা, সূর্য্য প্রভৃতি বহু মেঘসম্বন্ধ-হীন দেবতারও স্তুতি আছে। বস্তুতঃ বৈদিক মন্ত্রগুলি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইত। কৃষিকার্য্যের অঙ্গীভূত গীতি নহে। এই যজ্ঞের পরম্পরা রামায়ণেও আসিয়াছে—অশ্বমেধ, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞের কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে।

(থ) সম্পাতি রহস্য প্রকরণে বলা হইয়াছে যে,—'হনুমানরা জানত যে সীতাকে রাবণ হরণ ক'রে লঙ্কায় রেখেছে, সুতরাং সম্পাতির ব্যাপারটি উদ্দেশ্যবিহীন, এজন্য ইহা রহস্যময় এবং রূপক কল্পনার ইঙ্গিত রয়েছে' (৪৮ পৃঃ)। লেখক মহোদয়ের এটি প্রমাদপূর্ণ মন্তব্য। কেননা, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪২ সর্গ হইতে ৫৫ সর্গ পর্য্যন্ত সীতার অন্বেষণ বৃত্তান্ত হনুমান ও বানরগণের দ্বারা কিরূপভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আছে, সম্পাতি পক্ষী আসিয়া সীতার হরণের পর লঙ্কায় অবস্থানের কথা জানাইয়া দেয়। হনুমানরা যে জানিত না, ইহা স্পষ্ট বলা আছে।

(দ) 'কৃষিশ্রী সীতা' এই প্রকরণে—বৈদিক মন্ত্রে সীতার উল্লেখ (ঋগ্বেদ ৪ মণ্ডল ৫ অঃ ৫৭ সূক্তে ৬।৭ মন্ত্র) আছে। সীতা শব্দে লাঙ্গল পদ্ধতি বা 'সীতাধার কাষ্ঠ' অর্থাৎ লাঙ্গল বলা হইয়াছে। ইহা অভিধানেও উক্ত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। 'সীতা' শব্দের রূপক অর্থ সর্বস্বীকৃত। কৃষিশ্রী অর্থটি তাহা হইতে টানিয়া আনিতে হইবে।

(ধ) ইক্ষ্বাকুবংশ, কুশবংশ ও জনকবংশ—এই তিন অধ্যায়ে বহু কষ্টকল্পনা করা হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই—জনক শব্দে 'বীজ' গ্রহণ করা হইয়াছে। জনক যদি 'বীজ' হয়, আর সীতা যদি লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে উৎপন্ন কৃষিশ্রী হয়, তাহা হইলে জনকের লাঙ্গল কর্ষণের ফলে বসুন্ধরা হইতে সীতার উৎপত্তি—এ অংশটি সঙ্গত হয় কি ?

(ন) অশ্বত্থ শব্দে অশ্বিনীনক্ষত্র ইঙ্গিত করা হয়েছে (৪৯ পৃঃ), ইহাও কষ্টকল্পনা।

(প) নিশা শব্দের অর্থ—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনুঃ ও মকর রাশি। কর অর্থ হস্তপ্রান্ত।

'সুতরাং নিশাকর শব্দে কর্কট ও মেষরাশির প্রান্তদ্বয় ইঙ্গিত করেছে।' এখানে বক্তব্য এই যে,—এরূপ প্রান্তদ্বয় পাইবার কোন যুক্তি দেখান হয় নাই।

(ফ) 'রামায়ণের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। বর্তমানে ঐ প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে রামায়ণের কৃষিভিত্তিক সত্তা নিয়ে আপাততঃ আলোচনা হচ্ছে।' (১১ পৃঃ)

"বাল্মীকি তার মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্যমূলকভাবে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন পুরোপুরি।" "সুতরাং ব্যক্তি ও স্থান নামগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই রূপক মানতে হ'বে, নতুবা রামায়ণের বিবিধার্থবোধক বিশেষণটি ব্যর্থ হয়" ইত্যাদি।

এখানে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে,—ব্যক্তি ও স্থান নামগুলির রূপক মানতে হ'বে, রামায়ণে যে কয়টি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা এই রূপক বাদে উচিত কি না চিন্তনীয়।

(১) পৌলস্ত্যবধ (২) রাম ও সীতার চৌদ্দবৎসর বনবাস বা নির্বাসন (৩) বনবাসকালে সীতা হরণ (৪) সীতার বনবাস (৫) বাল্মীকির আশ্রমবর্ণনায় কোন কৃষির উল্লেখ আছে কি না ?

(১) পৌলস্ত্যবধের রূপক ব্যাখ্যা ভালই হইয়াছে, তবে বধ শব্দের অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই।

(২) রাম ও সীতার চৌদ্দ বৎসর বনবাসকালে অর্থাৎ মেঘ ও কৃষিশ্রী

বর্জিত অযোধ্যা বা যে কোন ভূখণ্ড কি দশায় উপস্থিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা রামায়ণে দেখা যায় না। রামায়ণে, চৌদ্দবৎসর অনাবৃষ্টি বা কৃষি উৎপন্ন হয় নাই এরূপ উল্লেখ নাই।

(৩) বনবাসকালে সীতাহরণ—ওয়েবার সাহেব লিখিয়াছেন যে,—দাক্ষিণাত্যে তখন কৃষিকার্য্য ছিল না, তাই হলধর সহ লাঙ্গল পদ্ধতির প্রচলনই সীতার বনবাসের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু লিখেন নাই।

(৪) সীতার পুনঃ বনবাস রূপকবাদে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

(৫) বাল্মীকির আশ্রমবর্ণনায় কোথাও দেখা গেল না যে,—বাল্মীকির আশ্রমে কৃষিক্ষেত্র ছিল, এমনকি বাল্মীকির একখানা লাঙ্গল ছিল, একথারও উল্লেখ নাই। জনকের লাঙ্গল ছিল, কিন্তু তিনি ত রামায়ণ রচয়িতা নহেন। রূপকবাদে তিনি ত 'বীজ' মাত্র। বাল্মীকি যে সঙ্গীতজ্ঞ কবি ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু তিনি যে কৃষক বা কৃষিক্ষেত্রের পরিচালক, ইহার প্রমাণ নাই।

শুধু নামগুলির অর্থান্তর অনুসন্ধান করিলেই কি সমগ্র রামায়ণের রূপকবাদ স্থাপিত হইবে? ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য বিধান কি আবশ্যক নহে?

আমি যতদুর পারি, পরিশ্রম করিয়া নিরপেক্ষভাবে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত এই গবেষণা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি এবং আমার মনে যে প্রশ্নগুলি জাগিয়াছে তাহা অন্তে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

আমার শেষকথা এই যে, 'রামায়ণের উৎস কৃষি' এই রামায়ণ শব্দের অর্থ যদি রামায়ণ গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে বাল্মীকিকে কোন না কোন সময়ে 'কৃষিশ্রী' দর্শনের ঘটনা উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। যেমন ক্রৌঞ্চ মিথুনের অন্যতমকে বধ করার ঘটনা হইতে রামায়ণের রচনার প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। রামায়ণে বর্ষাবর্ণনায় বা শরৎকাল বর্ণনায় বহু শ্লোকের মধ্যে দুই একটি শ্লোকে কৃষির বর্ণনা আছে মাত্র। আর যদি রামায়ণের অর্থ হয় 'মেঘের আগমন' তাহা হইলে 'কৃষির উৎস রামায়ণ'— এইরূপ বিপরীত নামকরণ হওয়া উচিত।

আমি যদি ভ্রমবশতঃ কিছু ত্রুটিপুর্ণ উক্তি করিয়া থাকি, তাহা বার্ধক্যবশতঃ মার্জনীয়। ইতি—

সবিনয় নিবেদন

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও (নব্বই ঊর্ধ্বে) অশেষ ধৈর্য সহকারে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তা পাঠকগণের অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত করা হল। এই সুযোগ ঘটায় গবেষণা বস্তুর গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, এজন্য আমি গর্বিত। তাঁর মন্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমার রামায়ণ সম্পর্কীয় রহস্যভেদ তথা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতর করার অভিলাষে এই 'সবিনয় নিবেদন'।

আমার এই গ্রন্থ রচনার মূলে প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ওয়েবার প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীগণ রামায়ণ মহাকাব্যে কৃষি বিষয়ক ইংগিত লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু রাম-কথা অনুসরণে ধারাবাহিক আলোচনা করেননি। বিষয়টি আমাকে কৌতূহলী করেছিল। পুরানের অনেক কাহিনী যে জ্যোতির্মণ্ডল এবং নৈসর্গিক ঘটনার রূপক এই বিষয়ে পথিকৃত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির রচনাবলী আমাকে শুধু অনুপ্রেরণা দেয় নাই, অনেক বিষয়ে তাঁকে অনুসরণও করেছি। শ্রীমতী বেলাবাসিনী গুহ ও শ্রীমতী অহনা গুহ রচিত 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' বইটিও আমার গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান সহায়ক ছিল।

'প্রাক কথা' অধ্যায়ে সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য উক্ত সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শন এবং ভৌগলিক অবস্থান হতে বলা যায় এই সভ্যতা বাণিজ্য ও কৃষিভিত্তিক ছিল। খৃঃ পূঃ প্রায় পাঁচহাজার বছর আগেকার এই সভ্যতায় কৃষিকাজের যে সম্প্রসারণ ঘটেছিল তার প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যত্র বিস্তার লাভ করা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে কৃষিকাজের ব্যাপকতা কতকাল আগে ছিল তার একটি ইংগিত রাখার জন্যই এই প্রসঙ্গর উত্থাপন করা হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা আর্যকৃষ্টি অথবা-অনৃ-আর্যকৃষ্টি এই তর্ক এড়িয়েও

বলা যায় আর্যরা যদি বহিরাগত (অনেক পণ্ডিত এই অনুমান করেন) হয়ে থাকে তাহলে সিন্ধু সভ্যতার এলাকায় তৎপূর্বে অন্-আর্য গোষ্ঠীর বসতি নিশ্চয় ছিল। আর্যগণের এই অঞ্চলে আগমনের পূর্বে স্থানটি জনহীন ছিল এমন কোন তথ্য নাই বা এমন চিন্তা করার কোন কারণ নাই। সুতরাং উক্ত বাণিজ্য ও কৃষিভিত্তিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটার আগে বা পরে অথবা সমকালে আর্য ও অন্-আর্য গোষ্ঠীর ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান এবং রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে সহাবস্থান পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল এই চিন্তা খুব কষ্টকল্পনা হয় না।

সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনে আর্য ভাবধারার পরিচয় যেমন আছে, তেমনি লিঙ্গ প্রতীক নিদর্শনগুলি অন্-আর্য কৃষ্টির প্রতি ইংগিত রাখে।

রাক্ষস বিরাধকে কবর দেওয়া হলেও রাক্ষসরাজ রাবণের মরদেহ আনুষ্ঠানিক ভাবে দাহ করা হয়েছিল (৬. ১১৩. ১২০)। রামায়ণে উভয় প্রথার নির্দেশ পাওয়া যায়।

রামায়ণের বিভিন্ন উপাখ্যান বিশ্লেষণ করে রাম-কথার সূত্র যখন কৃষিভিত্তিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি, তখন ইতিহাস স্বীকৃত প্রাচীনতম কালে ভারতবর্ষের যে স্থানে বা সভ্যতায় কৃষিকাজের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল সেই সভ্যতার সামান্যতম উল্লেখ করে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রথম বিকাশ ক্ষেত্রটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়েছি মাত্র।

ভাষা-বিশারদগণের অভিমত বালকাণ্ডের কোন কোন অংশ এবং প্রায় সমগ্র উত্তরকাণ্ডের রচনা পদ্ধতি অযোধ্যা হতে লঙ্কা এই পাঁচটি কাণ্ড হতে স্বতন্ত্র। একারণে ঐ অংশগুলি প্রক্ষীপ্ত বা পরবর্তী সংযোজন হিসাবে চিন্তা করা হয়।

বালকাণ্ডের অনেক উপাখ্যান ও ঘটনা যথা গঙ্গোৎপত্তি ও কার্তিকেয় জন্ম, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র দ্বন্দ্ব, অহল্যা উদ্ধার, ইন্দ্র কর্তৃক দিতির গর্ভ-ছেদন ইত্যাদি—এগুলি বাদ দিলেও রামায়ণে রাম-কথার মূল কাহিনী বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হত না। অথচ এই সকল উপাখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে রাম চরিত্রটি দৈবত্ব লাভ করেছে।

উপরোক্ত কারণগুলি বিবেচনা করেই মূল পাণ্ডুলিপিতে বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। অবশ্য এই মন্তব্যে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু আমার মূল বক্তব্য তথা বিশ্লেষণ কোন ভাবে ব্যাহত হয় না।

বৈদিক শাস্ত্রে সীতা নামের যে প্রাচীনত্ব আছে, সেই তুলনায় রাম নামটি অনেক অর্বাচীন কালের। অনুমিত হয় আবেস্তার 'রামাহুর' বৈদিক শাস্ত্রে তথা বেদপন্থীদের নিকট 'রামাসুর' নামে গৃহীত হয়েছিল। এই 'রামাহুর' অথবা 'রামাসুর' শব্দের সূত্র ধরে 'রাম' শব্দের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। পণ্ডিতগণের মতে আবেস্তা ও বেদপন্থীগণ পূর্বে এক ছিল। পরবর্তীকালে দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। যে ভূখণ্ডে আবেস্তাপন্থীদের প্রাধান্য ছিল তার সংলগ্ন ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে কোন প্রমাণ না থাকলেও সিন্ধু সভ্যতার মানবগোষ্ঠীর উপর আবেস্তাপন্থীদের বিশেষ প্রভাব বর্তমান থাকা কষ্ট-কল্পনা বলে মনে হয় না। সিন্ধু সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্য। সেই সভ্যতার কালে গঙ্গাযমুনা বিধৌত অঞ্চল শুধু অনগ্রসরই ছিল না, ভূতত্ত্বের দিক হতে ঐ এলাকা সম্ভবতঃ মনুষ্যবাসের প্রায় অনুপযোগী ছিল।

The greater part of the Indo-Gangetic plains is built up of very late alluvial flood deposits of the rivers of the Indus-Ganges systems, borne down from the Himalayas and deposited at their foot. But most of this terrain became firm and dry enough to be habitable for man only some 5,000—7,000 years ago. (The Vedic Age, The Bharatiya Itihasa Samiti's History and Culture of the Indian People, Volume I, 1952, Page 82).

সুতরাং স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য উত্তর, পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর দেশের সঙ্গে নিবিড় হওয়াই স্বাভাবিক। এই সূত্র ধরে সিন্ধু সভ্যতায় আবেস্তাপন্থীদের প্রভাব মেনে নেওয়া খুব দোষাবহ হয় না। এই কারণে আবেস্তার 'রামাহুর' এবং আরবি ভাষার 'রামা' শব্দটির সঙ্গে 'রাম' শব্দের সামঞ্জস্য এনে রাম বাচক বর্ষণ-দেবতার প্রাচীন অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস নিয়েছি। 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা অতি প্রাচীন'—মূল পাণ্ডু-লিপিতে এই ধরণের বক্তব্য আমি রাখিনি।

একথা মানতে হবে 'রাম' শব্দটি পরবর্তীকালে বেদের (১০ম মণ্ডল) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবেস্তাও সাম্প্রতিক কালের নয়। মূল পাণ্ডুলিপি রচনার কালে বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ গুণীজনের বেদের কাল নির্ধারণ

সম্পর্কীয় বক্তব্যগুলি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ রেখে বিভিন্ন উপাখ্যান বিশ্লেষণ করে মোটামুটি একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেটি হল রামায়ণের কালে অশ্বিনী নক্ষত্রে ছয় অংশ চল্লিশ কলায় বাসন্ত-বিষুব হত। এই তথ্য সামনে রেখে 'রাম' শব্দটির উদ্ভব-সূত্র অনুসন্ধান করার কালে 'রাম নামের উৎস' প্রকরণে 'রাম' নামটি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য আমি গ্রহণ করেছি। 'রাম' শব্দটির যত অর্থ বা ব্যাখ্যা আছে তারও উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য 'রাম' শব্দটি সম্পর্কে সকল প্রকার ভাবনা চিন্তাকে একটি পরিসরে সংকলিত করা। এই প্রকরণে 'রাম' শব্দের অর্থ মেঘ গ্রহণ করার যথাযথ যুক্তি গ্রন্থে রাখা হয়েছে।

নারদ বাল্মীকিকে যে রাম-কথা শুনিয়েছিলেন (বালকাণ্ড, ১ম সর্গ), সেই রাম-কথা রামের রাজ্যলাভেই ইতি হয়েছে। এরপর এগারো হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর রাম ব্রহ্মলোকে গমন করবেন এবং রাজত্বকালে রাম শত সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ, বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর সংখ্যক গো ও পর্যাপ্ত ধনাদি দান করবেন—নারদ এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন মাত্র। কিন্তু নারদের ভবিষ্যৎবাণীতে সীতার বনবাস, শত্রুঘ্নর যৌবরাজ্যে অভিষেক, লবকুশের জন্ম, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে পিতাপুত্রে মিলন, সীতার পাতাল প্রবেশ, কুশকে কোশলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা, রামের পরিশেষে লক্ষ্মণকে বর্জন এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন—এই সব উল্লেখ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ নাই।

'আদি শ্লোক' প্রকরণে নারদ ও বাল্মীকি শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তিগত ও সাদৃশগত অর্থভেদ করে বলা হয়েছে বাল্মীক (পালালিক ভূ-খণ্ড, যেখানে হলকর্ষণ করলে সীতার উদ্ভব হয়) নারদ (অন্তরীক্ষ, যেখান হতে বৃষ্টিপাত হয়)এর নিকট জানতে চেয়েছিল বর্তমান লোকে শ্রেষ্ঠ কে যিনি সর্বগুণে বিভূষিত। তখন নারদ (অন্তরীক্ষ) বর্ষণ-দেবতার গুণকীর্তন করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। নর অর্থ নায়ক (ঋগ্বেদ ১.৫৩.২)। নায়ক অর্থে অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। সুতরাং এই শ্লোকে 'নর' শব্দটি ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি বিশেষকে ইংগিত করা হয়েছে মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে তিনটি জড় বস্তুতে মানবিক সত্তা আরোপ করে রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখানে বর্ষণদেবতা অর্থে শুধু বর্ষাঋতু তথা বৃষ্টিপাতের চিন্তা করলে ভুল হয়। কারণ সকল ঋতুর কার্যকারক সূর্য। বর্ষচক্রের বিভিন্ন মাসে

সূর্যর কার্যকারকতা ভিন্ন ভিন্ন, এজন্য শাস্ত্রে এক আদিত্যকে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যে ভাগ করা হয়েছে। ঋতুচক্রের এই আবর্তন না থাকলে এক আদিত্য যেমন দ্বাদশাদিত্যে প্রকাশিত হত না, তেমনি প্রাণ-জগতেরও বিকাশ ঘটত না। কারণ শুধু বর্ষা, শুধু শীত অথবা শুধু গ্রীষ্ম পরিবেশ নিশ্চয়ই প্রাণ বিকাশের উপযোগী নয়। সুতরাং বর্ষণদেবতাকে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভের বন্দনা করার অর্থ বর্ষাঋতুর চিরস্থায়ীত্ব কামনা করা নয়। বরং বর্ষাঋতুর কল্যাণে যেহেতু প্রাণ বিকাশের সূচনা, সে কারণে বর্ষা-মাসের আদিত্যর বন্দনার মধ্য দিয়ে দ্বাদশাদিত্যরই বন্দনা করা হচ্ছে। অতএব মূলকথা দ্বাদশাদিত্যর শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভের বন্দনা। দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মঋতুর শেষ পর্যায়ে তৃষিত জীব-জগতের বর্ষণ কামনা কখনই যুগ যুগ পরিমাণ কালের জন্য বর্ষাঋতুর প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করা নয়। রামকে মেঘ-দেবতা হিসাবে উল্লেখ করলেও রাম মূলতঃ সূর্যর একটি স্বরূপ। যেমন পর্জন্য বর্ষণ-দেবতা, ইন্দ্রকেও বর্ষণ-দেবতা বলা হয়, বরুণ বর্ষণ-দেবতা। কিন্তু মূলে এরা সকলেই আদিত্য, একই সূর্যর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অতএব, যেখানেই 'ইন্দ্র' শব্দটি পাওয়া যাবে সেখানেই ইন্দ্রকে শুধু মাত্র বর্ষণ-দেবতা রূপে চিন্তা করলে অবশ্যই বিভ্রান্তি ঘটবে।

যাইহোক, কর্ষণযোগ্য ভূ-খণ্ড অর্থাৎ বাল্মীকি হয়ত মনে মনে গর্ব পোষণ করছিল সে জীবজগতকে (বিশেষ করে মানব সমাজকে) ধারণ করে আছে। কিন্তু অন্তরীক্ষ অর্থাৎ নারদের 'রাম-কথা'য় ভুলের নিরসন হওয়ায় বাল্মীকি সত্য উপলব্ধি করে চিন্তান্বিত হতে পারে। কেননা মেঘদেবতার করুণাবর্ষণ ছাড়া আবাদি জমি বন্ধ্যা, সৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন।

এছাড়াও নারদ, ব্রহ্মা এবং বাল্মীকির সাঙ্গীতীক-স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে নারদীয় লোকসঙ্গীতের সূত্র অনু-সরণে বাল্মীকি সেই লোকসঙ্গীতের কথা ও সুর পরিমার্জিত করে বৈদিক সঙ্গীতধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। নারদের 'রাম-কথা'কে আমি নারদীয় লোকসঙ্গীত অর্থাৎ কৃষিজীবি মানুষের মেঘবন্দনা গীতি মনে করি।

সুদুর অতীতে, বেদের কাল হতে দেখা যায় মানুষ সুফলপ্রদায়ী নৈসর্গিক ঘটনা, বৃক্ষাদি প্রভৃতিতে দেবত্ব আরোপ করেছে। দুঃখপ্রদায়ী ঘটনা বা বস্তুতে অদৈবিক সত্তা আরোপ করতেও ভুল করেনি। সুতরাং আমরা কি আশা করতে পারি না মানুষ যখন কৃষি নির্ভরশীল হয়ে সমাজ বন্ধন দৃঢ়

করে জনপদের পত্তন করল; তখন ভূমি ও মেঘকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করে ঘরে ফসল তোলার পর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লোকসঙ্গীতের বিকাশ ঘটাবে না? যেমন আজও শোনা যায়, খরাক্লিষ্ট মানুষের শোকবিধুর লোকসঙ্গীত— 'আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে'। এই আকুতি মেঘ বা বর্ষণের শাশ্বত প্রতিষ্ঠার জন্য নয়; বরং প্রাণজগতের চিরস্থায়ীত্বের কারণে। কাজের ধরণ এবং পরিবেশ মনের মধ্যে যে ভাবাবেগের সৃষ্টি করে সেই ভাব, সেই কাজ ও সেই পরিবেশের সঙ্গে সমতা রেখে উদ্‌গীত হয় লোকসঙ্গীত। পরবর্তীকালে সেই সহজাত লোকসঙ্গীতের সুর ও কথার পরি র্জন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে সঙ্গীতশাস্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত রাগ রাগিণীর। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়; বর্তমান কালের টোড়ী (টোডী) রাগের আদিম রূপের আমরা পরিচয় পাই উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের মেষ পালকদের কণ্ঠে। 'আদি শ্লোক' প্রকরণে আমি প্রচলিত কাহিনী বলতে নারদীয় কৃষিভিত্তিক লোকসঙ্গীতের ইংগিত করেছি। এই প্রকরণে আমি নারদ-বাল্মীকি কথোপকথনের পরবর্তী ঘটনার জ্যোতির্বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে ঋতু-কালের বর্ণনা দিতে প্রয়াসী হয়েছি। আমি একাধিকবার বলেছি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের দুইটি স্বরূপ আছে। বাহ্য-স্বরূপ মেঘ-দেবতার (অর্থাৎ ঋতু চক্রর কার্যকারক সূর্য) বন্দনা! অন্তঃস্বরূপ বাল্মীকির সমসাময়িক জনৈক ঐতিহাসিক ব্যক্তির পিতৃরাজ্য হতে বঞ্চিত হওয়া এবং পুনরায় সেই পিতৃরাজ্য উদ্ধার করার কাহিনী। কেন রামায়ণের এই দুই স্বরূপ তা' সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। সুতরাং বাল্মীকি রামায়ণের রাম একাধারে মেঘদেবতা, অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষ। বাল্মীকি ঐতিহাসিক রাম-চন্দ্রর শুধু সমসাময়িক নয়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই প্রমাণ রামায়ণে পাওয়া যায়।

কিন্তু বর্তমানে বক্তব্য এই যে বাল্মীকি রামচন্দ্রর যেহেতু সমসাময়িক, সেকারণে তাঁর জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। তাছাড়া সীতার শেষ জীবন কেটেছিল বাল্মীকির আশ্রমে। সুতরাং ধ্যান করার প্রয়োজন নাই, সীতার মুখে বাল্মীকি অবশ্যই রামচন্দ্রের বনবাস জীবনের সকল ঘটনা জেনেছেন একথা চিন্তা করা যায়। গর্ভবতী অবস্থায় সীতার নির্বাসন ও বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয়লাভ হয়েছিল। সেখানে লবকুশের জন্ম ও কিশোরকাল অতিবাহিত হয়। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত শত্রুঘ্ন লবণবধের উদ্দেশ্যে মধুপুরী যাওয়ার কালে শ্রাবণ মাসে লবকুশের জন্ম।

মথুরায় (মধুপুরী) শাসন প্রতিষ্ঠিত করে দশবৎসর পরে শত্রুঘ্ন যখন রামচন্দ্রকে দর্শনের উদ্দেশ্যে অযোধ্যা যান তখন একরাত্রি বাল্মীকির আশ্রমে বাস করার কালে রামায়ণ গান শুনেছিলেন।

সুতরাং বাল্মীকি নিজেই ঐতিহাসিক রামচন্দ্রর সকল ঘটনার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন। এরপর আর কি প্রয়োজন দেখা দেবে নারদের নিকট হতে 'রাম-কথা' শুনে যাচাই করে নেওয়ার ?

তবু যদি তাই ঘটে থাকে, তাহলে কখন নারদের সঙ্গে বাল্মীকির কথোপকথন হয়েছিল ? রামচন্দ্র যখন রাজত্ব করছিলেন, সেই সময়ের তৎকালীন ঘটনা ত বাল্মীকির জানা ছিল। রামচন্দ্রর রাজত্বকালে তিনিই ত একমাত্র রাজচক্রবর্তী ছিলেন, তবে যাচাই করে নেওয়ার পর বাল্মীকি চিন্তিত হলেন কেন ?

বাল্মীকি চিন্তিত হলেন ; সেই চিন্তার অপনোদন কারণেরও কোন উল্লেখ পাই না রামায়ণে।

সুতরাং ঐতিহাসিক রামচন্দ্রর জীবনের ঘটনা নিয়ে একটি রূপক কাব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য যখন বাল্মীকি স্থির করলেন, তখন সেই রূপক কাব্যর বহির্স্বরূপ হিসাবে নারদীয় কৃষিভিত্তিক লোকসঙ্গীতটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই লোকসঙ্গীতের কথা ও সুর কিভাবে পরিমার্জন করে ঐতিহাসিক তথ্যগুলির সন্নিবেশ ঘটানো হবে সেই কারণে বাল্মীকির চিন্তা হয়ত হয়েছিল।

আমি জ্যোতিষ তথ্যর দ্বারা প্রমাণ দিয়েছি বাল্মীকি আদৌ তমসা নামক কোন নদীতে স্নান করতে যাননি। রহস্য সৃষ্টির কারণে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যেন আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে নিয়ে স্নানে গিয়েছিলেন। এই স্নানের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কলশ, বল্কল, কর্দমহীন তীর্থ প্রভৃতি শব্দ শ্লোকে ব্যবহার করা হয়েছে।

বাদ্যযন্ত্রর ক্ষেত্রে মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, খোল, ডুগি এগুলি সবই কলশের রূপান্তর মাত্র। দাক্ষিণাত্যর ঘটবাদ্যম্ মূলতঃ কলশ। কলশ(স);—কল (মধুরাস্ফুটধ্বনি) + √শু গতি + অ(ড)-ক। সুতরাং কলশ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রুতিমধুর শব্দের সামঞ্জস্য বিধান করছে।

বল্কল শব্দের অর্থ তারযন্ত্র হয় না একথা স্বীকার করি। এজন্যই বল্লকী (বীণা) এবং বল্কল উভয় শব্দ বল্ (আবরণ করা) ধাতু নিষ্পন্ন বিধায় বল্কল শব্দটি তারযন্ত্রের রূপক হিসাবে প্রয়োগ করে আদিকবি রহস্য সৃষ্টি

ব. ৱি./রামায়ণের উৎস/৬০-২২

করেছেন একথা আমি বলতে চেয়েছি। কোন প্রাচীন গ্রন্থের মূল বক্তব্যে পৌঁছাতে হলে বহু অপ্রচলিত শব্দের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। যেমন অহংস্পতি, মলিম্লুচ শব্দের বর্তমান অর্থ মলমাস। কিন্তু বৈদিককালে এই শব্দগুলি ঠিক কি কি অর্থে ব্যবহৃত হত আজও তা সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থে কোথাও বাল্মীকিকে আমি কৃষক হিসাবে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হইনি। সুতরাং বাল্মীকির কৃষকত্ব, তার আশ্রমে কৃষিক্ষেত্র অথবা একটি লাঙ্গল থাকার প্রশ্ন অনিবার্য কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। জাহ্নবীর অদূরে তমসা প্রসঙ্গের আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি সেক্ষেত্রে কোন স্থানকাল-বিরুদ্ধতা ঘটেছে বলে মনে করি না।

আদি শ্লোকের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'মা' অর্থ লক্ষ্মী এবং 'নিষাদ' অর্থ পতি ধরা হয়েছে। রামায়ণের সুপণ্ডিত টিকাকারগণ যখন 'মা নিষাদ' শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপতি করেছেন এবং 'মা' অর্থ যখন লক্ষ্মী, তখন 'নিষাদ' অর্থ পতি হওয়ায় স্বাভাবিক ; নতুবা লক্ষ্মীপতি শব্দ পাওয়া যেতে পারে না। এই ভিত্তিতে নিষাদ অর্থে পতি গ্রহণ করেছি। শব্দটির অর্থগত ভুল হলেও 'মা নিষাদ' শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপতি পণ্ডিত মহলেই গ্রাহ্য হয়েছে। অতএব আদি শ্লোকে অর্থভেদ যা করেছি তা অক্ষুণ্ণ থাকছে।

সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'এ আছে রাক্ষস অর্থ 'যা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয়'। এই ছত্রটির দুইটি অর্থ করা যায়। ১। যার দ্বারা ধনাদি রক্ষিত হয়। এই অর্থে কুবেরের ধনরক্ষক রাক্ষস এবং মুদ্রারাক্ষসের প্রধানমন্ত্রী রাক্ষসের নামকরণ সার্থক হয়। ২। যার কবল হতে ধনাদি রক্ষা করতে হয়। আমি প্রথম অর্থে 'রাক্ষস' শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলাম। ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের অভিমত অনুসারে 'রাক্ষস' শব্দটি প্রত্যাহার করে নিয়ে ক্রৌঞ্চ শব্দের অন্য অর্থ 'অসুর' শব্দটি গ্রহণ করা যায় (A Sanskrit-English Dictionary by M M. Williams)।

অসুর অর্থ সূর্য্যঃ। ইতি মেদিনী॥ ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দের অর্থ 'শত্রুগণের নিরসিতা'; 'প্রাণবান'; 'বলবান' (১.৫৪.৩) (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অতএব ক্রৌঞ্চ-মিথুন শব্দের ব্যাখ্যা করে দ্যাবাপৃথিবীর যে স্বরূপতা

প্রকাশ করা হয়েছে তা অক্ষুণ্ণ থাকছে। দ্যাবাপৃথ্বী প্রাণবান বলেই তারা প্রাণ সৃষ্টি করছে।

দ্যাবাপৃথ্বীকে যদি মিথুন রূপে গণ্য করা হয় তাহলে মহাকাশে অবস্থিত সূর্য এবং পৃথিবীকে মিথুনরূপে গ্রহণ করতে বাধা কোথায় ?

সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে বহু ব্যবধান সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এই ঘূর্ণনে উভয়ের অবস্থান অনুসারে ঋতুর আবর্তনে পৃথিবী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। সূর্য এবং কর্ষিত জমিকে মিথুন বলতে দোষ নেই এই কারণে যে সূর্যরশ্মি দ্বারা উভয়ে মিথুনাবদ্ধ। অতএব, সূর্য ও পৃথিবীর এই বন্ধন কি মিথুনের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা অসংগত হয় ?

দৌঃ ও পৃথ্বী অথবা সূর্য ও পৃথিবীকে কাব্যে মানবিক সত্তায় প্রকাশ করা হলে ঋতুচক্রের মধ্যে গ্রীষ্মঋতুর উত্তাপকেই কেবলমাত্র দেহীর কামাতুর অবস্থার দৈহিক উত্তাপের সঙ্গে তুলনা করা যায়, অন্য কোন ঋতুর সঙ্গে নয়। এজন্য কাব্যর 'কামমোহিত' শব্দে গ্রীষ্মঋতুর ইংগিত গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপে বাল্মীকির হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব হয়েছিল। এখানে শোক হতে করুণ রসের বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং বাল্মীকির শোকের অর্থাৎ চিত্তপীড়ার কারণ প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দাবদাহ। যদি সত্যই বাল্মীকি কোন ব্যাধ কর্তৃক সুরতাসক্ত পক্ষী-মিথুনের পুরুষটির নিধনে উদ্বেলিত হয়ে অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করতেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ক্রোধের অভিব্যক্তি থাকত। কিন্তু রামায়ণে ক্রৌঞ্চ-বধ ঘটনার বিবরণে সেই ভাবের কোন প্রকাশ নাই। এই ঘটনায় ব্যাধের সাক্ষাৎ আবির্ভাবও ঘটেনি।

অতএব, গ্রন্থে ব্যাধ অর্থে লুব্ধক নক্ষত্রকে (মৃগব্যাধ নামে পরিচিত) ইংগিত করা অসংগত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ক্রৌঞ্চ-বধ ঘটনায় ব্যাধের সাক্ষাৎ আবির্ভাব কখনই ঘটেনি। সূর্যর মিথুন রাশিতে অবস্থান কালে রাত্রির আকাশে লুব্ধক নক্ষত্র দৃশ্য হয় না। ক্রৌঞ্চ-বধের পর শ্লোকের আবির্ভাব। উদ্‌গীত শ্লোকে বাল্মীকির বিস্ময়।

বাল্মীকির বিস্ময়ের কারণ কি ?

ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের অভিমত, "বস্তুত বেদ যে অপৌরুষেয়—ইহা

নির্ণয়ের পক্ষে আদিকবি বাল্মীকির এই বিস্ময় অন্যতম কারণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

শোকবিহ্বল বাল্মীকির কণ্ঠ হতে শ্লোক উদ্‌গীত হওয়ার পরক্ষণেই ছন্দোবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমন্বিত অভিশাপ বাণীর মধ্যে বাল্মীকি 'বেদ অপৌরুষেয়' এই নির্ণয় করে বিস্মিত হলেন ভেবে নিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। কেন না অভিশাপকালে কি কেউ অভিশাপ বাণীটি ছন্দোবদ্ধ ও তন্ত্রীলয়সমন্বিত করে তোলার জন্য সচেতন থাকেন ? এও যদি সম্ভব হয় তাহলে বাণীটি উদ্‌গীত হওয়ার পরক্ষণেই তাৎক্ষণিক পরিবেশ ও ঘটনা ভুলে বাণীটির ছন্দ ও সুর নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন ?

আমি বলেছি কৃষিভিত্তিক লোকসঙ্গীতের পরিমার্জিত কথা ও সুর নিয়ে চিন্তাভাবনা করার কালে বাল্মীকি শিষ্য কর্তৃক বাদিত মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রর সহযোগিতা বাতিল করে স্বহস্তে তার-যন্ত্র গ্রহণ করে সেই বাদ্য সহযোগে ছন্দোবদ্ধ ও তন্ত্রীলয়সমন্বিত নতুন রীতির মেঘবন্দনা উদ্ভাবন করেছিলেন। বাল্মীকি চিন্তিত বা বিস্মিত হননি,; আত্মহারা হয়ে এই মেঘবন্দনাটিকে শ্লোক বলে অভিহিত করেন। শ্লোক অর্থ স্তুতিলক্ষণা বাক্ (ঋগ্বেদ ১.১১৮.৩ সায়ণ)।

শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ। (রামায়ণ, ১.২.৪০)।

শোক বা চিত্তপীড়া ভাব হতে করুণ রসের বিকাশ ঘটে। করুণ রসের আশ্রিত স্বর নি (নিষাদ) এবং পা (পঞ্চম)।

বাল্মীকির ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন শৃঙ্গার রসের ইংগিত দেয়। পরে দ্যাবাপৃথিবীর গ্রীষ্মকালীন এই পরিবেশে চিত্তবিকার হেতু শোক তথা করুণ রসের বিকাশ ঘটে। ছন্দোবদ্ধ ও তন্ত্রীলয়সমন্বিত শ্লোকটি রচিত হয়েছিল শৃঙ্গার ও করুণরসের প্রাধান্য দিয়ে, যে কারণে মা (মধ্যম—শৃঙ্গার ভাব) বাদী এবং সা (ষড়্‌জ—করুণভাব) সম্বাদী ধরা হয়েছে। প্রচণ্ড দাবদাহে বিশ্বচরাচর যখন ধ্বংসের মুখে, সেই দৃশ্যে শোকাভিভূত অবস্থায় মেঘদর্শনে শ্লোকের আবির্ভাব। সুতরাং গ্রন্থে পূর্বাপর সামঞ্জস্য ব্যহত হয়েছে বলে মনে করি না।

ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের অভিমত—"বরং লক্ষ্মী (সীতা) পতি রাম যে ক্রৌঞ্চ-মিথুন রাক্ষসদম্পতি রাবণ ও মন্দোদরীর একটি (পুরুষ) রাবণকে বধ করিয়া চিরন্তন গৌরব লাভ কর—এই অর্থটিই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা পরবর্তীকালে টীকাকারদের উদ্ভাবিত অর্থান্তর, রূপকবাদে কল্পিত অর্থ

অপেক্ষা এই ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না কি?”

এই বক্তব্য মানতে হলে বলতে হয় রাবণকে বধ করার কারণেই আদিকবি রামকে চিরন্তন গৌরবে ভূষিত করছেন। তাহলে ক্রৌঞ্চর (রাবণ) মৃত্যুতে ও ক্রৌঞ্চীর (মন্দোদরী) করুণ বিলাপে আদিকবির হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত হয়েছিল একথা মানা যায় না। রামায়ণে রাবণের মৃত্যুতে এবং মন্দোদরীর বিলাপের কালে আদিকবি তাঁর এই হৃদয় উদ্বেলতা প্রকাশ করেননি। আদিকবি প্রথম শ্লোকে রামকে গৌরবান্বিত করলেও তাঁর হৃদয় মন্দোদরীর শোকে দোলায়িত হওয়ায় কণ্ঠ হতে শ্লোক নিঃসৃত হয়েছিল একথা মেনে নিলে আদিকবির বিশেষ কৃপাদৃষ্টি তাঁর রচিত মহাকাব্যে মন্দোদরীর প্রতি বর্ষিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই নজির রামায়ণে নেই, বরং আদিকবির সকল পক্ষপাতিত্ব রাম ও সীতার প্রতি।

শাস্ত্র অনুসারে চতুর্বর্ণের পুরুষের উপনয়ন বিধি আছে। উপনয়নের একটি মুখ্য অনুষ্ঠান কর্ণবেধ। একদা নারীদেরও উপনয়ন হত। পুরুষের ক্ষেত্রে যখন জন্মক্রিয়ার একটি অনুষ্ঠান হিসাবে কর্ণবেধ প্রথা ছিল, তখন নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান থাকা অস্বাভাবিক নয়।

শুনেছি রাজস্থান উত্তরপ্রদেশের কোন কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, এখনও বিয়ের সময়ে মেয়েদের নাক কান ফোঁড়ার রীতি আছে। পশ্চিমবঙ্গের কান্দি অঞ্চলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এই রীতি অনুসরণ করা হয়।

তত্রাচ ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের পরামর্শমত যদি এই মন্তব্যটি “নাসাকর্ণচ্ছেদন হিন্দু সমাজে প্রাচীনকাল হতে বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি রীতি। সেই রীতি শূর্পণখার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল কেন?” বাদ দেওয়া হয় তাহলে মূল বক্তব্য কোনক্রমেই ব্যাহত হচ্ছে না। কিন্তু সর্বগুণে বিভূষিত রাম বিকৃতরূপা শূর্পণখার সঙ্গে পরিহাস করে মিথ্যা বলেছিলেন একথাও মানা যায় না। কারণ সমগ্র রামায়ণে রামের পরিহাস-প্রিয়তার কোন ইংগিত নাই। অযোধ্যায় রাজা হয়ে রামচন্দ্র যখন সীতার সঙ্গে পরিচারিকা পরিবেষ্টিত হয়ে বিহার করছিলেন (উত্তরকাণ্ড, ৫২ সর্গ) তখনও কিন্তু রামের কোন পরিহাস-প্রিয়তার উল্লেখ পাই না।

রামের মেঘদৈবতের সঙ্গে লক্ষ্মণের যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে সেক্ষেত্রে লক্ষ্মণ ঊর্মিলাকে বিবাহ করেছিল এটা মানতে হয়। কিন্তু রামের ব্যক্তি

সত্তা (যা রামায়ণের ঐতিহাসিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত) নিয়ে আলোচনা কালে লক্ষ্মণের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন লক্ষ্মণকে অবিবাহিত এবং কার্যকারণে কোন রাক্ষসীকন্যার পানিগ্রহণ হয়ত অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। প্রথম হতেই বিশ্বামিত্রর রামের প্রতি নির্দেশ ছিল তাড়কাকে নিধন করার। এক্ষেত্রে তাড়কার নাসাকর্ণ প্রথমে ছেদন করে পরে বাহু ছেদন ও পরিশেষে বক্ষঃস্থলে শরনিক্ষেপ করে হত্যার কারণ কি? নিধন যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে নাসাকর্ণ ছেদনের কি প্রয়োজন ছিল? বিষয়টি কি প্রশ্ন তোলে না?

ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের মতে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি চরিত্রগুলি অলংকার শাস্ত্রানুসারে প্রাসঙ্গিক।

একথা মেনে নিয়েও বলা যায় সরযূর দক্ষিণ তীরে বলা ও অতিবলা মন্ত্র গ্রহণকালে রাম বিশ্বামিত্রকে গুরু পর্যায়ে স্বীকার করেছিলেন। বিশ্বামিত্র রামকে বহু প্রকার অস্ত্র গ্রহণ ও সংহার বিদ্যা শিক্ষাদান করেন, এক কথায় বিশ্বামিত্র রামকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ঘটনাগুলি অবশ্যই উভয়ের ব্যক্তিসত্তা নির্দেশ করে। কিন্তু, তারপর এত সুখ দুঃখের মধ্যে রাম কোনও সময়ে বিশ্বামিত্রকে স্মরণ করলেন না অর্থাৎ আদিকবি বিশ্বামিত্রকে একান্তভাবে 'প্রাসঙ্গিক চরিত্র' হিসাবে কাব্যে উপস্থাপিত করে রাম সীতার বিবাহের পরই হিমালয়ে নির্বাসন দিলেন একথা মানতেও দ্বিধা জাগে।

অপরদিকে, বিশ্বামিত্র চরিত্রটিকে যদি নৈসর্গিক ঘটনা হিসাবে স্বীকার করা হয়, সেক্ষেত্রে সহজাতভাবে বিশ্বামিত্রকে মহাকাব্যে প্রাসঙ্গিক চরিত্র বলা যায়।

মন্থরার ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি প্রযোজ্য।

এই দুই চরিত্রের স্বরূপতা স্পষ্ট করা হলে যেহেতু মূল বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়, একারণে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে 'সিদ্ধাশ্রমের অন্তরালে' এবং 'বায়স-মন্থরা-ত্রিশংকু পরিচয়' নতুন দুইটি প্রকরণ যুক্ত করে দেওয়া হল।

বালকাণ্ডে আছে রামচন্দ্র লবকুশকে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ডেকে এনে রামায়ণ গান শুনেছিলেন। কিন্তু গান শোনানোর পর লবকুশ

পুনরায় আশ্রমে ফিরে গিয়েছিল এমন কোন ইংগিত রাখা হয় নাই। (বালকাণ্ড; ৪র্থ সর্গ।)

ক্রৌঞ্চ-বধ এবং পৌলস্ত্য-বধ শব্দদ্বয়ে 'বধ' শব্দটি ব্যবহার করে রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে। 'বধ' শব্দের প্রচলিত অর্থ নিধন বা হত্যা। কিন্তু বধঃ (পুং) শব্দের অন্য অর্থ নির্বাসনং, পরিবর্জনং ইত্যাদি। ইত্যমরঃ ॥ (শব্দকল্পদ্রুম্)। সুতরাং ক্রৌঞ্চ-বধ অর্থে গ্রীষ্মকালীন সূর্যর নির্বাসন অর্থাৎ বর্ষাঋতুর আগমন। পৌলস্ত্যবধ অর্থে অগস্ত্য নক্ষত্রর উদয়ে বর্ষা ঋতুর আগমন এই ধারণার পরিবর্জন।

'রামজন্মকথা' প্রকরণে ঋষ্য শব্দের অর্থ মৃগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঋষ্য (পুং),— ঋষ্ + য (ক্যপ্)—র্ম্ম, বাহুলকে; ১। কৃষ্ণসার মৃগবিশেষ। ঋষ্যো নীলাঙ্গকঃ।—ভাবপ্রকাশ। ২। মৃগ (বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অঙ্গনা,— (অঙ্গ + ন + আপ্) (স্ত্রী) বৃষ-কর্কট-কন্যা-বৃশ্চিক-মকর-মীন-রাশয়ঃ। ইতি জ্যোতিষতত্ত্বম্ ॥ (শব্দকল্পদ্রুম্)।

বৈদিক মন্ত্রগুলিকে আদৌ কৃষক সঙ্গীত (চাষার গান) হিসাবে আমি প্রমাণের চেষ্টা করিনি। রামায়ণ বেদ নয়, কাব্যগীতি। সুতরাং কৃষি-ভিত্তিক লোকসঙ্গীতকে পরিমার্জিত করে শাস্ত্র-সম্মত-কাব্যগীতি রচনা করতে বাধা কোথায়।

রামায়ণে বৈদিক যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে বলেই এটিকে বেদমন্ত্র নির্ভরশীল মানতে হবে কেন? জনক যে যজ্ঞ করেছিলেন তা মূলতঃ হলকর্ষণ।

ত্রিলোকে রাবণের অস্তিত্ব রামায়ণে প্রথম প্রকাশ করা হয় বিশ্বামিত্র যখন দশরথের নিকট রামের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম্ ॥১৬

(১ ২০.১৬)

অর্থাৎ, পৌলস্ত্যবংশ সম্ভূত মহাবাহু মহাবীর্যবান্ রাবণ নামক রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তিন

লোককেই উৎপীড়িত করিতেছে।

এই সময় দশরথের আচরণে স্পষ্ট যে তিনি রাবণের শক্তি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সুতরাং রাবণের রাজধানী লঙ্কা একথা তাঁর জানা ছিল নিশ্চয়ই, নতুবা প্রশ্ন রাখতেন।

মারিচকে বধ করে রাম লক্ষ্মণ আশ্রমে ফেরার পথে মৃতপ্রায় জটায়ুর মুখে সীতাহরণ কাহিনী অবগত হয়েছিলেন। জটায়ু রামকে বলল, 'আয়ুষ্মান! তুমি যাহাকে মহাবনে ঔষধির ন্যায় অন্বেষণ করিতেছ, সেই সীতাও আমার প্রাণ, এই উভয়ই রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে' (৩.৬৭.১৫)। আরণ্যকাণ্ডের সাতষট্টি ও আটষট্টি সর্গ দুইটিতে স্পষ্ট দেখা যায় জটায়ু রামকে রাবণ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করিয়েছিল। সুতরাং রাবণ যে সীতাকে হরণ করে দক্ষিণদিকে গিয়েছে রাম তা সম্যক জানতেন। অতঃপর রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে কবন্ধর সাক্ষাৎ হলে সেখানেও লক্ষ্মণ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের কথা বলেছেন (৩,৭০ সর্গ)। কবন্ধর নিকট রাম রাবণের বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে কবন্ধ রামকে ঋষ্যমুকে অবস্থানকারী সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের পরামর্শ দিল। সুগ্রীব রাবণের সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। (৪.৭.২)। অথচ অঙ্গদের নেতৃত্বে হনুমান প্রমুখকে দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণে পাঠানোর সময় তাদের নির্দেশদানকালে কিন্তু সুগ্রীব রাবণের বাসস্থানের ইংগিত দিয়েছে (৪.৪১.২৫)।

অতএব, রাবণ সীতাকে হরণ করে দক্ষিণদিকে গিয়েছে, এই রাবণ বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই এবং রাবণের বাসস্থান কোথায় এই সব তথ্য অবশ্যই হনুমানদের জানা ছিল। শুধু জানা ছিল না রাবণ সীতাকে হরণ করে কোথায় রেখেছে। এই কারণে ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের পরামর্শমত 'সম্পাতি রহস্য' প্রকরণের নিম্নোক্ত ছত্র কয়েকটি প্রত্যাহার করে নিলাম।

"হনুমানরা জানত যে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় রেখেছে, সুতরাং এ বিষয়ে সম্পাতি কাহিনীতে নূতন কোন তথ্যের অবতারণা করা হয়নি। অথচ উদ্দেশ্যহীন ভাবেও নিশ্চয়ই এই কাহিনী বিবৃত হয়নি।"

উপরি উক্ত অংশটুকু প্রত্যাহারের দরুণ 'সম্পাতি রহস্য' প্রকরণের মূল বিশ্লেষণ বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয় না।

এই প্রকরণে আরও দুইটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ অশ্বত্থ শব্দের

অর্থ। অশ্বত্থ (পুং),—ন শ্বথ (শ্বঃ স্থিত)। অশ্বিনী নক্ষত্র (অশ্বশীর্ষ সাদৃশ্যে) পাণিনি (৪.২.৫)। অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী, পাণিনি (৪.২.২২)। (৩) অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্ত কাল, সিদ্ধান্ত কৌমুদী। (৪) অশ্বত্থ ফলের সময়, সিদ্ধান্ত কৌমুদী। (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ নিশাকর শব্দের রূপকভেদ নিয়ে।

নিশা শব্দে মেষ হতে কর্কট রাশি পর্যন্ত স্থানের নির্দেশ করা হয়। এই চারটি রাশির দুইটি প্রান্ত একটি অশ্বিনী নক্ষত্রর প্রথম পাদে এবং অন্যটি অশ্লেষা নক্ষত্রর শেষ পাদে। এই দুই প্রান্তকে দুই হাতের প্রান্তদেশের ইংগিত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যেহেতু উপখ্যানে 'নিশাকর' শব্দ দ্বারা একটি মানবিক সত্তা সৃষ্টি করা হয়েছে।

জনক বংশ বিশ্লেষণ কালে এই বংশের প্রথম পুরুষ নিমিকে 'বীজ' এর প্রতিভূ প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং বীজের অংকুরোদগম স্তরটিকে 'জনক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই বংশের সকলকেই 'জনক' নামে অভিহিত করা যায়। অপরদিকে সীরধ্বজ অর্থে কৃষক, যে হলকর্ষণ করলে সীতার আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং সেও জনক। এখানে 'জনক' শব্দটি দুইটি ক্ষেত্রে দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণের মূল বক্তব্যের দ্বৈত সত্তা আছে। অন্তর্নিহিত বক্তব্য ঐতিহাসিক, কিন্তু বাহ্যিক স্বরূপ কৃষিভিত্তিক লোকসঙ্গীতের পরিমার্জিত রূপ। এই দ্বৈত সত্তার ক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে প্রতিটি চরিত্র, উপাখ্যান, স্থান, কাল ইত্যাদির দ্বৈত সত্তা নাও থাকতে পারে। যেমন সীতার বাল্মীকি আশ্রমে নির্বাসন প্রসঙ্গটির মধ্যে কৃষিভিত্তিক বক্তব্য নাই, এটি ঐতিহাসিক তথ্যের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করি। কিন্তু বাল্মীকি আশ্রমে লবকুশের জন্ম একাধারে কৃষিভিত্তিক, অপরদিকে ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ। বিশ্বামিত্র, মন্থরা, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতি চরিত্রগুলি একান্তভাবে নৈসর্গিক ঘটনা এবং/অথবা কৃষিভিত্তিক। একারণে রামায়ণে এঁদের ভূমিকা ঐ পর্যায়েই সীমিত।

সুতরাং বিরাট রামায়ণ মহাকাব্যের মোটামুটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে এই গ্রন্থে সম্ভাব্য পরম্পরা রক্ষা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে

ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬০-২৩

অন্যান্য অংশ বা উপাখ্যানগুলিকেও আলোচনায় গ্রহণ করা হবে। যেমন, বর্তমানে রাক্ষসকুল সম্পর্কে কোন প্রকরণ রাখা হয় নাই, পরবর্তী খণ্ডে আলোচনার জন্য।

রাম ও সীতা চৌদ্দ বৎসর বনবাসে ছিলেন।

নব বর্ষাণি পঞ্চ চ; সাধারণ অর্থে চৌদ্দ বৎসর।

কিন্তু বর্ষ শব্দের অর্থ বর্ষণ, বৎসর, ভাগ, খণ্ড (শব্দকল্পদ্রুম্)। বর্ষ,—√বৃষ্ + অ (অচ্)—ভা, মেঘবারিপাত, বর্ষণ, বৃষ্টি। ঋগ্বেদ (৫.৫৮.৭)। বর্ষবৎ অবিরলপাত। বর্ষ,—বৃষ্ + অ—ধি; বৎসর

সুতরাং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ শব্দের অর্থ চৌদ্দ খণ্ড বা ভাগ ধরা যায়। চান্দ্র-মাসে বৎসর হিসাবে বারোটি শুক্ল পক্ষ (বা খণ্ড) ও বারোটি কৃষ্ণ পক্ষ (বা খণ্ড)। এই অনুসারে চৌদ্দটি পক্ষ অর্থাৎ সাত মাস বলা যায়।

দক্ষিনায়ণাদির পর হতে বায়ুর গতি পরিবর্তনের দরুণ মেঘের গতির বদল হয়। শারদ-বিষুবর পর জলশূন্য মেঘ দক্ষিণগামী হয়ে বসন্ত ঋতুর শেষে পুনরায় আবির্ভূত হয়। এই সাতমাস কাল বর্ষণের প্রবলতা থাকে না। এজন্য এই সময়কালকে রামের বনবাস বলে ইংগিত করা হয়েছে।

বর্ষাশেষে হলকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। পুনরায় বর্ষার পূর্বে হলমুখে সীতার আবির্ভাব ঘটে। এই কারণে রামের সঙ্গে সীতারও বনে গমন।

কিন্তু মহাকাব্যে বর্ণিত বনবাসকালের এই একটি মাত্র অর্থ ধরলে চলবে না। সেখানে নানা ঘটনায় ব্যক্তি রামচন্দ্র ও মানবী সীতার তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে।

সুতরাং রাম সীতার বনবাসের কাল আক্ষরিক অর্থে চৌদ্দ বৎসর ধরে সেই সময়কালে অযোধ্যায় বা অন্য কোন ভূখণ্ডে অনাবৃষ্টি হেতু কৃষিকাজ ছিল না অথবা দাক্ষিণাত্যে কৃষিকাজ প্রচলন করার ইংগিত দেওয়ার জন্য রাম সীতার বনবাস এমন অর্থ সঠিক হয় না। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ফিরতি মৌসুমী বায়ুর কারণে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বারিপাতের কারণে সেই অঞ্চলে চাষের কাজ হয় এই তথ্যটুকু মাত্র বনবাস প্রসঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন রামের 'চৌদ্দ বৎসর বনবাস' বক্তব্যটি রামায়ণে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। 'বর্ষ' শব্দটি ছাড়া 'সমা' ও 'সংবৎসর' শব্দ দুইটিরও উল্লেখ আছে। কিন্তু 'বর্ষ' শব্দটির বাহুল্য বেশী।

মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর রামকে বনবাসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হতে রামের কৌসল্যার নিকট বনগমনের অনুমতি গ্রহণ করা পর্যন্ত অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ততঃ পনের বার 'বর্ষ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যথা,—

১। নব বর্ষাণি পঞ্চ চ (অযোধ্যাকাণ্ড/৯. ৩০ ; ১২. ২২ ; ১৮. ৩৫ ; ৩৯. ৩৫)

২। চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি (ঐ/৯. ২১ ; ৯. ৩১ ; ২০. ২৯ ; ২৬. ২৩)

৩। বর্ষাণি চ চতুর্দ্দশ (ঐ/৯. ২০)

৪। নব পঞ্চ চ বর্ষাণি (ঐ/১১. ২৬ ; ২৪. ১৭)

৫। সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি (ঐ/১৮. ৩৭)

৬। বর্ষাণীহ চতুর্দ্দশ (ঐ/১৯. ২৩)

৭। ষড়ষ্টৌ চ বর্ষাণি (ঐ/২০. ৩১)

৮। চতুর্দ্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বসতো মম (ঐ/৩৭. ৫)

'বর্ষ' শব্দের এই বহুল ব্যবহার মেঘদৈবত রাম ও কৃষিশ্রী সীতার চৌদ্দ পক্ষ অর্থাৎ সাত মাসের অনুপস্থিতির তথ্যকে সুনির্দিষ্টভাবে ইংগিত করছে বলে আমি মনে করি।

অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বনবাস প্রসঙ্গে যখন ঐতিহাসিক ঘটনার ইংগিত দেওয়া হয়েছে তখন 'বর্ষ' শব্দে বৎসর অর্থও গ্রহণ করতে হবে।

রাম অযোধ্যা ত্যাগ করার পরে চিত্রকূটে ভরতসহ অযোধ্যাবাসীগণকে আদিকবি উপস্থাপিত করেছেন। তারপর রাবণ বধের পর রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত অযোধ্যা প্রসঙ্গ একান্তভাবে রামায়ণে অনুল্লিখিত। সুতরাং রামের চৌদ্দবৎসর বনবাসকাল অথবা সীতাহরণ ও সীতা উদ্ধারের মধ্যবর্তীকালে অযোধ্যায় অনাবৃষ্টি বা খরার দরুণ কৃষিকাজ ব্যহত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তবে অতীতে এমন নজির পাওয়া যায়। মগধে মৌর্যবংশের রাজত্বকালে একাধিক্রমে বারো বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ চলেছিল ; যার জন্য জৈন-ধর্মীয়দের এক বিরাট অংশ বর্তমান মহীশূর অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল।

দেখা যায় রামের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হনুমান যখন ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন ভরতের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হতে বৎসরাধিক কাল অনাবৃষ্টি বা অজন্মার যুক্তি গ্রহণ করা যায়।

দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতম্ ॥ ৩০ (৬. ১২৭. ৩০)

অর্থাৎ, (হনুমান অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে সেই নন্দিগ্রামে গিয়া দেখিলেন) ভরত অতি দীনভাবে চীরকৃষ্ণাজিন পরিধানপূর্বক মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন এবং ভ্রাতৃশোকে কৃশ হইয়াছেন। তিনি তপস্বীর ন্যায় জটাধারণপূর্বক জীবনধারণ করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ মললিপ্ত হইয়াছে।

এখানে দেখা যায় ভরত রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে চীরকৃষ্ণাজিন ধারণ করায় পুরবাসীগণও সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করেছিল। বিশ্লেষণে ভরতকে শারদ-বিষুবর আগে ও পরে তিনমাস সময়কালের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। সুতরাং রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের প্রাক্‌কালে হনুমান ভরতের যে অবস্থা দেখল তার ভিত্তিতে সহজেই বলা যায় অযোধ্যায় ঘোর অনাবৃষ্টি চলছিল। ভরতসহ সকল পুরবাসী ভোগ পরিত্যাগ করেছিল অর্থে দেশে অজন্মা-পরিস্থিতি।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে রামকে অযোধ্যায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যে আয়োজন হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভরতের আদেশমত শত্রুঘ্ন বহু সহস্র ভৃত্যগণকে নির্দেশ দিলেন,—

বিষ্টীরনেকসাহস্রীশ্চোদয়ামাস ভাগশঃ।
সমীকুরুতঃনিম্নানি বিষমাণি সমানি চ ॥৬
স্থানানি চ নিরস্যন্তাং নন্দিগ্রামাদিতঃ পরম্।
সিঞ্চন্তু পৃথিবীং কৃৎস্নাং হিম শীতেন বারিণা ॥৭

(৬.১২৯.৬.৭)

অর্থাৎ, যে সকল স্থান উচ্চ এবং নিম্ন আছে, ছেদন এবং পূরণ দ্বারা সেই সকল স্থান সমতল করিয়া অযোধ্যা হইতে নন্দীগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগে তুষারের ন্যায় শীতল জল সিঞ্চন করা হউক।

এই নির্দেশের অর্থ রামের আগমনের পূর্বে হলকর্ষণ দ্বারা জমি প্রস্তুত করে জল সেচনের সাহায্যে বীজতলা তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়া।

অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রর অভিষেকের সময়ে 'সেই উৎসবের সমকালেই বসুমতী শস্যশ্যামলা, বৃক্ষসকল ফলবান এবং কুসুমসহ সৌরভশালী হইয়া উঠিল।'

অভিষেকে তদর্হস্য তদা রামস্য ধীমতঃ।
ভূমিঃ শস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ ॥৭২

(৬.১৩০.৭২)

এই শ্লোকটিতে দুইটি ইংগিত আছে। এক, ব্যক্তি রামচন্দ্রর শরৎ ঋতুতে অভিষেক ; দুই, মেঘদেবতা রামের করুণায় ধরিত্রীর জীবধাত্রী স্বরূপতা। উভয়ক্ষেত্রে শরৎঋতুর আভাষ পাই।

রামচন্দ্রর অভিষেক উৎসবের সমকালেই বসুমতীর শস্যশ্যামলা রূপে যে আনন্দর প্রকাশ তাতে মনে করা অসংগত হবে না যে বিগত বৎসরে বা কয়েক বৎসর অজন্মার পর প্রচুর ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

গ্রন্থে রামায়ণের কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে রাম এবং সীতার নৈসর্গিক তথা দৈবিক সত্তাকে উদ্ঘাটিত করতে প্রয়াসী হয়েছি। সেখানে নামগুলির অর্থান্তর করেই নিশ্চিন্ত হইনি, বিভিন্ন প্রকরণের প্রয়োজন অনুসারে ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। যেমন, সীতার পূর্বজন্ম, সীতার আবির্ভাব এবং সীতার সন্তান প্রসব একই প্রকরণে সন্নিবেশিত হয়েছে। অপরদিকে, 'বায়স-মন্থরা-ত্রিশংকু পরিচয়' প্রকরণে রামের উদ্দেশ্যে হনুমানের হাতে প্রদত্ত বন্দিনী সীতার অভিজ্ঞানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সীতার কৃষি-সত্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রকরণে শুধু এই একটি মাত্র তথ্য নাই। রামের জন্মকালে, বনবাস গমনের প্রাক্কালে এবং বনবাসের প্রথম দিকে 'চিত্রকূট' নামক স্থান ত্যাগের কালনির্ণয় পাওয়া যায় শনিগ্রহর বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে। এই সব তথ্যগুলি ব্যক্তি রামচন্দ্রর জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে জড়িত, মেঘদৈবত রাম ও কৃষি-দৈবত সীতার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন।

এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রামায়ণের রূপকভেদের বিচার বিশ্লেষণ করা হলে বাল্মীকিকে একজন কৃষক অথবা তার আশ্রম সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র বা হলধর বাল্মীকিকে অনুসন্ধানের অনুসন্ধিৎসা জাগবে না। উপাখ্যানের প্রকৃতি অনুসারে সেই উপাখ্যানে চরিত্র বিশেষের মূল ভূমিকা তথা কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে হবে।

যেমন, সীতা চরিত্রটির একমাত্র সত্তা হলরেখ নয়। সীতা কখনও পরিপূর্ণ মানবী, কখনও চন্দ্রের প্রতিভূ, কখনও ব্যক্তি রামচন্দ্রর ভাগ্যশ্রী। রামের বনবাসকালে ব্যক্তি রামচন্দ্রর সঙ্গে তাঁর ভাগ্যশ্রী যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনি তাঁর নর্মসহচরী মানবী সীতারও উপস্থিতি মেনে নেওয়া যায়। ফলে মহাকাব্যর বিভিন্ন উপাখ্যানের উপস্থাপনা অনুসারে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাসকালে কখনও সীতা রামচন্দ্রর ভাগ্যশ্রী কখনও

বা সাক্ষাৎ স্ত্রী ; অথবা নিছক কৃষিশ্রী।

সীতাহরণ কাহিনীতে কোন দুর্ধর্ষ নৃপতির মানবী সীতাকে অপহরণ যেমন সম্ভব হতে পারে, তেমনি ব্যক্তি রামচন্দ্র দশবৎসর কাল দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে যে রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, কোন নৃপতি ছলনার আশ্রয় নিয়ে রামচন্দ্রকে সেই রাজ্য হতে রাজ্যচ্যুত করেছিল এই ইংগিতও গ্রহণ করা যায়।

উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত সীতার নির্বাসন কাহিনীর সীতা মূলতঃ মানবী। কিন্তু রহস্য সৃষ্টির কারণে কৃষিশ্রী সীতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কৃষিভিত্তিক লবকুশের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। মানবী সীতার নির্বাসন কালে পুত্র প্রসবও ঐতিহাসিক তথ্যকে ইংগিত করে।

গর্ভাবস্থায় সীতা গঙ্গাতীরস্থ মুনি-আশ্রম দেখতে চেয়েছিলেন। আদিকবি নির্বাসিতা সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পাতালিক ভূখণ্ডে সীতার উদ্ভব হয়। কৃষিকাজ সমাপ্তির পর সীতা ঐ ভূখণ্ডেই আশ্রিতা থাকে। আবার যথাসময়ে সেখানেই হলমুখে সীতার আবির্ভাব ঘটে। এই কারণে বাল্মীকি আশ্রমই নির্বাসিতা সীতার উপযুক্ত আশ্রয়স্থল।

এই ঘটনা সম্পর্কে ওয়েবার সাহেবের অভিমতের সঙ্গে আমি একমত নই।

মেঘের গমনাগমনে কর্ষিত জমির যে ভূমিকা এবং এই উভয়ের সংযোগে মানবসমাজের যে সমৃদ্ধি তার স্বীকৃতি একদা উদ্গীত হয়েছিল লোকসঙ্গীতে। এই লোকসঙ্গীতের 'রামকথা' মূর্ত হয়েছিল কৃষিকাজের ফলশ্রুতির উপলব্ধি হতে। একারণে গ্রন্থের নাম 'রামায়ণের উৎস কৃষি' সঙ্গত হচ্ছে মনে করি।

ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আমি রামায়ণ বিশ্লেষণের তত্ত্বগত ও তথ্যগত বক্তব্য সুধীজনের প্রজ্ঞার নিকট সবিনয়ে নিবেদন করলাম।
